নিত্য কারাগারে

■ শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন

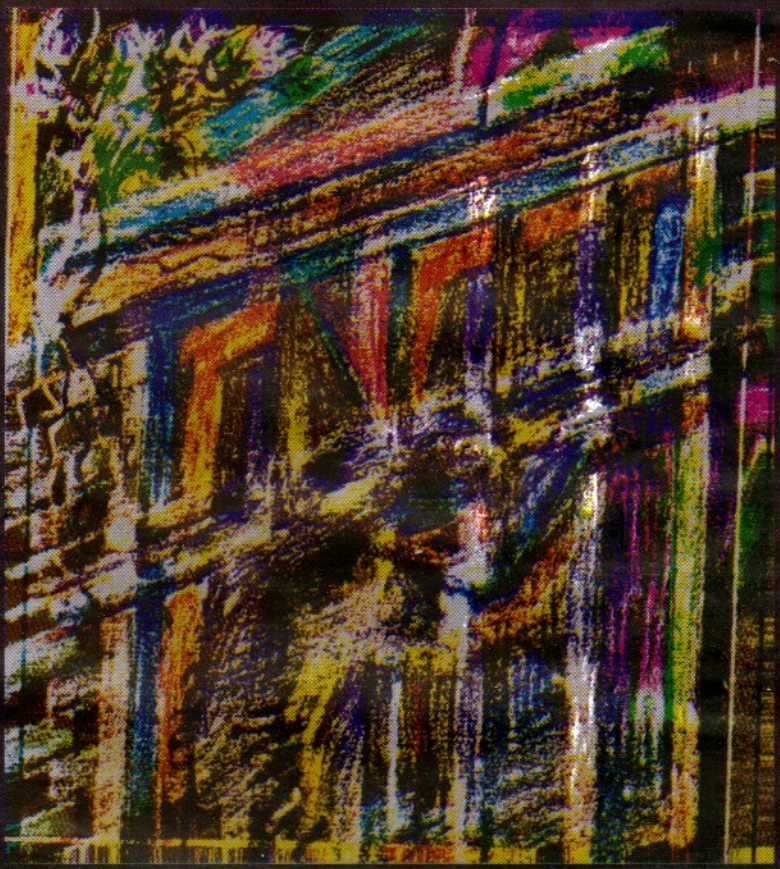

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন বাংলাদেশের একটি সুপরিচিত নাম। তিনি ১৯৩৯ সালের ১০ই জানুয়ারি বিক্রমপুরের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৪ সালে ঢাকা সেন্ট গ্রেগরী হাইস্কুল হতে কৃতিত্বের সাথে এসএসসি, ঢাকা কলেজ হতে এইচএসসি, জগন্নাথ কলেজ হতে বিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এমএ এবং এলএলবি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের কারণে নবম শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় তাঁর প্রথম কারাবরণ। দেশ ও মানুষের জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে তিনি বহুবার কারাবরণ করেন। বন্ধুরা তাঁকে 'কারাগারের পাখি' বলে ডাকেন। বাংলাদেশের জীবিত রাজনীতিকদের মধ্যে তাঁর চাইতে কেউ বেশি কারাবরণ করেননি।

১৯৫৪ সালে তিনি ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৫৯ সালে উক্ত সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত তিন তিন বার তিনি সে পদে বহাল ছিলেন। ১৯৬২ সালের শিক্ষা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মহানায়ক ছিলেন তিনি। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন এবং মুজিবনগর হতে স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম সংগঠক হিসেবে কাজ করেন। ভারতীয় পার্লামেন্টের যৌথ অধিবেশনে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে তাঁর ভাষণ আমাদের স্বাধীনতা ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।

দ্বিতীয় ফ্লাপে দেখুন

www.pathagar.com

নিত্য কারাগারে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নিত্য কারাগারে

শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন

মেলা

www.pathagar.com

মেলা
৩৮/৩, বাংলাবাজার (২য় তলা)
কমপিউটার এন্ড বুকস্ মার্কেট
পরিবেশক
ডেফোডিল পাবলিকেশন্স লিঃ
ফোন ঃ ৯৫৫৭৮০৩, ০১৭১১-৩২৭০৫৯
পুনঃ প্রকাশ
জানুয়ারী ২০০৭
প্রকাশক
এম. এস. দোহা
স্বত্ব
শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন
প্রচ্ছদ
আশরাফ পিকো
শব্দ বিন্যাস
আবদুল্লাহ্ আল ফারুক
মুদ্রণে
ওএসিস প্রিন্টার্স
৬০/বি, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৯৫৬৯৩৮৫
মূল্য
একশত পঞ্চাশ টাকা
US$ 5.00
ISBN 984-8497-05-06

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার জেল জীবনের নিয়ত সঙ্গী মেট,
পাহারা, ফালতু, কয়েদী, হাজতী এবং
জেলকর্মচারীবৃন্দ যাঁরা আমার অসহনীয়
দিনগুলোকে সহনীয় করে তুলেছিলেন –
তাঁদেরকে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উপক্রমণিকা

আমি লেখক নই, কোনদিন হয়ে উঠব তাও মনে হয় না। তবুও জেলখানার অবসর মুহূর্তে একটা কিছু দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছিলাম – আদতে কি হয়েছে বা কিছু হয়েছে কিনা জানি না।

ছেষট্টি সালে জেলে থাকার সময় এটা লেখা হয়। কাজেই এটা সাম্প্রতিকের ব্যাপার নয়। আজকের সময় এবং আঙ্গিকের সাথে এর মিল খুঁজে পাওয়া ভার। কেউ কেউ পরামর্শ দিয়েছেন কিছু কিছু রদবদল করতে – তাঁদের পরামর্শ রাখতে পারিনি। যে সময়ের লেখা সে সময়ের জন্য কথাগুলো আমার। সময়ের বিচারে না টিকলেও সেদিনের জন্যে আমার কাছে তা ছিল সত্য।

কোন মত প্রচারের জন্য নয় বা কাউকে বড় বা ছোট করার জন্য নয় – একান্তভাবে নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা কয়েকটি কথাই এতে রয়েছে। কারো ভাল লাগলে কৃতার্থ বোধ করব।

স্নেহাস্পদ আবুল বাসার মৃধা, শামসুজ্জামান খান এবং জনাব হাবীবুর রহমান সাহেবের উৎসাহ এবং সক্রিয় সহযোগিতা না পেলে 'নিত্য-কারাগারে' বই আকারে বের হ'তে পারত না। তাঁদেরকে অকৃত্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ বইটি প্রকাশ করার ব্যবস্থা করায় তাঁদের প্রতি কৃজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রাত অনেক হয়েছে। পাশের খাটিয়ার ওবায়েদ ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার চোখে ঘুম নেই। বেশ কিছুদিন ধরে ঘুম আমার সঙ্গে আড়ি দিয়েছে। প্রায়ই বিনিদ্র রজনী প্রভাত করছি ওবায়েদ আর আমাদের ফালতু ধলুর নাক ডাকার বিচিত্র শব্দ শুনে শুনে। নিদ্রাকৃচ্ছতার রুগী হওয়ার কী জ্বালা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।

গত ন'মাস ধরে যেখানটায় বাস করছি তার নাম দশ সেল। ঢাকা জেলের অসংখ্য সেলের মধ্যে সর্বাধুনিক এই দশ সেল। ১৯৬২ সালে ছাত্রাবস্থায় যখন ধরে এনেছিল তখন ছাব্বিশ সেলে ছিলাম। সে সময়ই জানলাম নতুন সেল তৈরি হচ্ছে। নাম দেওয়া হয়েছে দশ সেল। কারণ, সেখানে দশটি ঘর থাকবে। শুনেছিলাম সে সেল তৈরি হচ্ছে বিশিষ্ট অতিথিদের জন্যে। সব রকম সুযোগ-সুবিধাই নাকি থাকবে সেখানে। তখন হয়ত ইচ্ছা হয়েছিল যদি দশ সেল থাকতে পেতাম। সে সুযোগ এরই মধ্যে এসে গেল।

দশ সেলের প্রথম মেহমান ছিলেন উত্তরবঙ্গের জনৈক জাতীয় পরিষদ সদস্য। জেলে থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফীকার আলী ভুট্টো। অল্পদিন পরই তিনি মুক্তি পেয়ে যান। তারপর থেকে শুনেছি দশ সেল খালিই পড়েছিল। দীর্ঘদিন পর দশ সেল আবার ভরে উঠেছে আমাদের আগমনে। ছয় দফা দাবীর আন্দোলন করে আমরা যে সব আওয়ামী লীগের কর্মী কারাবরণ করেছি তাঁদের স্থান হয়েছে দশ সেলে। সারা জেলখানার লোকেরা বলে ভাগ্যবানদের জন্য দশ সেল। আমাদের মত কিন্তু ভিন্ন।

১৯৬২ সালের পরও বেশ কয়েকবার এদিকে আমার আসতে হয়েছে। পুরানো হাজত, নতুন হাজত, পুরানো বিশ এবং এক-দুই খাতায় পর পর থেকে গিয়েছি। জেল-জীবনের সূচনায় অবশ্য বর্তমান দশ সেলেরই সংলগ্ন চার-খাতায় আমাকে রাখা হয়েছিল। তারপর থেকে স্বল্প পরিসর এই জীবনে দশবার কারাবরণের সময় বিভিন্ন জায়গায় আমাকে রাখা হয়েছে। ঢাকা জেলের প্রায় প্রত্যেক স্থানেই কিছুদিন বাস করছি। এর প্রতিটি জায়গা আমার পরিচিতি।

www.pathagar.com

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে যখন আমাকে ২১ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হয় আরও অনেকের সঙ্গে তখন আমি স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র। বয়সের দিকে থেকে সকলের চাইতে ছোট, বলতে গেলে একেবারে সর্বকনিষ্ঠ। হাফ-ফ্যান্ট পরা আমাকে কেষ্টো-ফাইলে (কয়েদীরা কেস টেবলকে এই নামেই ডাকে) যখন হাজির করা হয় তখন আমার মত ক্ষুদে বন্দী দেখে সুবেদার আকবর খাঁ হেসেই অস্থির। স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে টিকেটে নামধাম লেখা হলে সিপাইকে হুকুম করল, লে যাও শকুন্তলা। আমি বুঝতেই পারলাম না কি বলল সুবেদার। শকুন্তলা বলতে আমরা জানি কবি কালিদাসের অমর রচনা শকুন্তলা। এ আবার কোন্ শকুন্তলা। শেষ পর্যন্ত নিয়ে এল পাগলা গারদের চারখাতায়। এটাকে মেন্টেলও বলা হয় – কেননা এখানে কিছু সংখ্যক পাগলও বাস করে। কিন্তু শকুন্তলা নামকরণের তাৎপর্য কি? শেষ পর্যন্ত জানা গেল, এখানে একটি প্রকাণ্ড বাদাম গাছ ছিল এবং তার উপর প্রায়ই অনেক শকুন এসে বসত। সে থেকেই এ জায়গার নাম হয়েছে শকুন্তলা বা শকুন্তলা।

আজকের দশ সেল সেই শকুন্তলারই আঙ্গিনায় গড়া হয়েছে। ছোট ছোট দশটি পায়রার খোপ। দশজন মানুষের থাকার জন্যে। তিনদিকে জেলখানার চিরাচরিত সাদা দেয়াল। একদিকে মোটা মোটা শিকের লোহার দরজা। দরজার পার্শ্বেই ঘর সংলগ্ন পায়খানা। সংলগ্ন পায়খানাটিও ঘরের সম্মুখভাগে পড়েছে – নাকের ডগা ঘেঁষে। গরমের দিনে এর মধ্যে টেকা যায় না। এক মুঠো বাতাস প্রবেশ করার ব্যবস্থা নেই। ঘরের বাইরের চার-পাঁচ হাত জায়গা বাদ দিয়ে উঁচু দেয়াল। আলো-বাতাস প্রাণপণে আটকে রাখার এমন খাসা ব্যবস্থা আর হয় না। শীতকালে ঘর স্যাঁতসেঁতে থাকার জন্যে শীতও অত্যন্ত বেশি অনুভূত হয়। শীতের প্রচণ্ডতা, গ্রীষ্মের প্রখরতা আর আলো-বাতাসের স্বল্পতাই দশ সেলের বৈশিষ্ট্য।

আমাদের ছাত্রলীগের কর্মী নূরে আলম সিদ্দিকীও একজন জেলের বাসিন্দা। পুরানো বিশ সেল জমিয়ে রেখেছে এই সদা চঞ্চল আবেগপ্রবণ ছেলেটি। আমি ছাত্রলীগের সভাপতি থাকাকালীনই নূরে আলম আমাদের মাঝে কাজ করতে আসে। আদর্শবাদী কর্মী এবং আবেগপ্রবণ বক্তা হিসেবে সে সুপরিচিত। ওর বক্তৃতা এবং লেখা আমার অত্যন্ত ভাল লাগে। আমি স্নেহ করি ওকে। সেদিন গ্যাসট্রিকের আক্রমণে বাধ্য হয়ে জেল-হাসপাতালে ভর্তি হলে আলমও 'অসুস্থ' হয়ে চলে এল হাসপাতালে। উদ্দেশ্য, আমার সাথে

www.pathagar.com

দেখা করা। একই জেলের বিভিন্ন স্থানের বাসিন্দাদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের এটিই আদি এবং অকৃত্রিম পন্থা। আমাকে দেখেই দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরে স্বভাবসুলভ কণ্ঠে আলম বলে উঠল, ভাই, আপনারা ত অভিজাত সেলের বাসিন্দা। আমাদের কথা কি মনে আছে?

ওর কথা শুনে হাসি পেল। আজ ও যেখানটায় আছে সেখানে একাধিকবার আমি বাস করে গিয়েছি! জানি, দুটোর কি পার্থক্য।

দশ সেলের একদিকে প্রায় শ'চারেক অল্পবয়সী হাজতীদের থাকার ঘর। জেল-ভাষায় ছোকরা-ফাইল। সারাদিন ওদের হৈ চৈ, চীৎকার, মারামারি আর উদ্ভট সব আনন্দানুষ্ঠান দু'একদিন সহ্য করা গেলেও দীর্ঘ দিনে অসহ্য হয়ে ওঠে। আমাদের সেলের বাঁ পার্শ্বে ওরা থাকে। সম্মুখভাগে হয় ওদের গোসল-প্যারেড আর ডান পার্শ্বে নিত্যকার ল্যাট্রিন-প্যারেড। আমাদের সেলের দশ হাত ব্যবধানে এই চারশ' মানব-সন্তান প্রতিদিন তাদের মলমূত্র ত্যাগ করে বসুধাকে পরিপুষ্ট করে ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের নাসিকা যন্ত্রকে করে সংকুচিত, ঘ্রাণস্পৃহাকে করে বিদূরিত। এহেন পরিবেশে আমরা সারা জেলখানার ঈর্ষার বস্তু অভিজাত বাসিন্দারা বাস করি।

সেলের দক্ষিণ ভাগে একটুকরো জমি রয়েছে। প্রায় বার মাসই কোন না কোন ফসল এর মধ্যে বোনা হচ্ছে আর প্রয়োগ হচ্ছে মানুষ এবং গরুর দরুন প্রাপ্য ফ্রী সার। যখন সার প্রয়োগ হয় এই জমিটুকুতে দুর্গন্ধে তখন নাসিকা অভ্যন্তরে কালো চুলগুলো অচিরেই পেকে ওঠে। বিশ্বাস না হয় দশ সেলের প্রত্যেকের নাসিকা অন্বেষণ করলেই পক্ব কেশের সন্ধান মিলবে।

কোন্ যাতাকলে আটকা পড়েছি বলেন ত ভাই, – বলতে বলতে ঘরে ঢুকলো ওবায়েদ। ওর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়েই দেখলাম হাতে একটি টাইপ করা লম্বা কাগজ। বুঝতে অসুবিধা হল না আবার ওর নতুন মেয়াদ এসেছে। ওর এবং মমিন সাহেবের দু'জনেরই আজ ন'মাস শেষ হওয়ার দিন। দু'জনেরই আরও তিন মাসের আটকাদেশ এসেছে।

বললাম, কি করা যাবে বল? যতদিন ওরা আমাদের আটকে রেখে পরিশ্রান্ত না হচ্ছে ততদিন আর বাইরের জগতের আলো-বাতাস আমরা পাচ্ছি না।

ও বলল, কিন্তু সব কিছুরই একটা সীমা থাকা উচিত। একি অন্যায় জুলুম। দীর্ঘ ন'মাস আটকে রেখেও ওদের তৃপ্তি হল না?

www.pathagar.com

ওর কথা শুনে হাসিও পেল দুঃখও হল। মনে পড়ল আমার জন্মভূমি বিক্রমপুরেই কফিলউদ্দীন চৌধুরী সাহেবের কথা। চৌধুরী সাহেব মন্ত্রী ছিলেন যুক্ত ফ্রন্ট এবং আওয়ামী লীগের আমলে। চৌধুরী সাহেবের বন্ধুরা বলেন, ওটা ঠোঁটকাটা। আর সত্যিই এমন কথা নেই যা তাঁর মুখে আটকায়। অনায়াসে যাকে যা খুশি বলে দিতে পারেন তিনি। এহেন চৌধুরী সাহেবকে ১৯৬২ সালে ছাত্র আন্দোলনের পর পরই গ্রেফতার করে আনা হয়। মুজিব ভাই, মানিক ভাই, আবুল মনসুর সাহেব এবং আরও অনেককে ওরা গ্রেপ্তার করে এনেছিল। ছাব্বিশ সেলে তখন আমরাও আছি। মানিক ভাই এবং চৌধুরী সাহেব এক ঘরে থাকেন। যেদিন তার দু'মাসের প্রথম মেয়াদ শেষ হয়ে দ্বিতীয় মেয়াদের আদেশ এল সেদিন তিনি ক্ষেপে উঠলেন। কাগজটা হাতে নিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, এটা অসভ্যতা। ধরে এনেছ, দু'মাস খেটে দিয়েছি। আর কেন? এটা স্রেফ অসভ্যতা।

আমরা সবাই তার কথাগুলো শুনে হেসে উঠেছিলাম।

আজও কারো এক্সটেনশনের অর্ডার এলে সে চেহারা আমার মনে পড়ে যায় আর একা একাই হেসে ফেলি।

কারাগারের মধ্যে নিত্যন্ত বাস্তববাদী কাটখোট্টা মানুষও অনেক সময় ভাবুক হয়ে যায়। একটা সূক্ষ্ম চিন্তার স্রোত অবিরাম মনের মধ্যে বয়ে চলে। একে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। মনও প্রায়ই খারাপ থাকে। একটা নিরবচ্ছিন্ন বিষাদ সারা অন্তর জুড়ে সর্বদাই বিরাজ করে। অন্তরের অস্তিত্বটি কেবলই গুমরে উঠে – ওরা আমায় আটকে রেখেছে। আমার কোন স্বাধীনতা নেই। চার দেয়ালের মধ্যে অসহায় বন্দী আমি।

মুক্ত পৃথিবীর আলো-বাতাস আর স্বাধীন মানুষের মুক্ত প্রাণের স্পন্দন এখানে থেমে গিয়েছে। পায়ে পায়ে এখানে নিষেধের বেড়ি। মন কেবলই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ভেঙ্গে ফেলতে চায় ঐ সব শত নিষেধের বন্ধনকে, ছুটে বের হয়ে যেতে ইচ্ছা হয় মুক্ত জীবনের অঙ্গনে। মুক্তির অন্বেষার বার বার অন্তরাত্মা কেঁদে ওঠে। বাইরে যেখানে খুশির বন্যা, সদাচঞ্চল আনন্দময় স্রোতের উদ্দাম গতি, কারাগারের বন্দীরা সেখানে অন্তরে অসহনীয় যন্ত্রণা

www.pathagar.com

নিয়ে তিল তিলে দগ্ধ হতে থাকে।

জেলের মধ্যে যারা কয়েদী তাদের মানসিকতা আমাদের চাইতে একটু ভিন্ন। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মেয়াদে এদের আগমন। দোষী হোক, নির্দোষী হোক বিচারের শেষে যখন তাদের এখানে পাঠান হয় অল্পদিনের মধ্যেই তারা সে অবস্থান্তর সহ্য করে নেয়। আস্তে আস্তে কারাগারের শৃঙ্খলিত জীবনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু যারা বিনা বিচারে আটক থাকে তাদের মন কখনোই এখানে স্থিতিলাভ করতে পারে না। তাদের অবস্থা করুণ, জীবন তাদের ক্রমেই দুর্বিষহ হয়ে উঠে। তারা জানে না কবে কখন তারা মুক্তির আস্বাদ পাবে। তারা বুঝে উঠতে পারে না কখন তাদের সংসার গুটাতে হবে।

পাকিস্তান দেশরক্ষা আইন বলে এবার আমাদের গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছে। এর পূর্বেও বহুবার এসেছি। কিন্তু এবারের মত নিবিড় দুঃখ অন্য কোন বার উপলব্ধি করিনি। দেশরক্ষা আইনে আটক করা হয়েছে আমাদের – যাদের আর অন্য গুন নাই বা থাকুক দেশপ্রেম কারো চাইতে কম নয়। দেশপ্রেমের কষ্টিপাথরে বিচার করলে অতি অর্বাচীনও আমাদোর প্রথম কাতারে না ফেলে পারবে না।

যারা সত্যিকারের প্রয়োজনের মুহূর্তে নিজেদের শরীরের প্রতিটি রক্ত-কণিকা হাসিমুখে বিসর্জন দিতে পারে দেশকে রক্ষা করার জন্য, তাদেরই সোনালী জীবনের উজ্জ্বলতম অধ্যায়ের প্রদীপ্ত দিনগুলো হারিয়ে যাচ্ছে অন্ধ কারার বন্ধ আবেষ্টনীয় মাঝে। একদিন যারা দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করার সংগ্রামে সিংহভাগ অবদান রেখেছিলেন, আজ তারাই সেই স্বাধীন দেশের কারাগারে দিন মাস আর বছরের পর বছর ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর প্রহর গুণছেন। তাদের জীবন যৌবন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন তাদের বিধ্বস্ত হওয়ার পথে, জীবিকার সংস্থান অনিশ্চয়তার গহ্বরে।

এদের অপরাধ? বিশেষ মহল থেকে যাই বলা হোক না কেন, দেশের মানুষ জানে দেশ মাতৃকাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসা ছাড়া এদের অন্য কোন অপরাধ নেই। দেশ আর আর দেশের আপামর মানুষকে ভালবেসেই তারা ভোগের পথে না গিয়ে ত্যাগের পথ বেছে নিয়েছেন। প্রতিদানে পাচ্ছেন জেল-জুলুম

www.pathagar.com

আর শত অত্যাচার-নিপীড়ন। এরা জানেন, এদের স্বার্থ ত্যাগ এদের জীবনে ফলপ্রসূ না হলেও আগামী দিনের নাগরিকদের জীবনে হয়ত সুখ, সমৃদ্ধি আর স্বাধীনতার বার্তা বয়ে আনবে। নিজেদের জীবনের দুঃখ কষ্ট আর ব্যর্থতার মাঝে আগত দিনের অনাগত বংশধরদের রবিকরোদ্ভাসিত জীবনের ছবি এদের চোখে ভেসে ওঠে। তাই এরা হাসিমুখে সহ্য করেন শত অপমান, অত্যাচার আর নিপীড়ন।

দেশরক্ষা আইনে প্রেপ্তার করে বৎসর কাল ধরে আটকে রেখে আমাদের দেহ-মনের উপর যত না অত্যাচার করা হয়েছে তার চাইতে বেশি করা হয়েছে অপমান। ধরে আমাদের আনতই। ওদের অনুসৃত নীতি আর অন্যায় কার্যাবলীর প্রতিবাদ করেছি আমরা, দাবী করেছি প্রতিবিধান। প্রেপ্তার না করে তাই উপায় ছিল না। কিন্তু এ অপমান কেন? আর কোন নিবর্তন-মূলক আইন কি ওদের দফতরে ছিল না। ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু ওরা সেই সনাতন পন্থাই অবলম্বন করেছে, যদি মারতেই হয় বদনাম দিয়ে মারাই ভাল।

সতের দিন ধরে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ চলল, জাতিসংঘের হস্তক্ষেপে যুদ্ধবিরতিও হ'ল। বড় খা সাহেব তাসখন্দ গিয়ে শাস্ত্রীজীর সঙ্গে সন্ধিও করে এলেন। একদিন পাকিস্তান থেকে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদেরকেও ছেড়ে দেওয়া হল। ঘন ঘন ঘোষণা করা হল প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা। বলা হল, যুদ্ধ নয়, শান্তি পাকিস্তানের কাম্য। কিন্তু যুদ্ধকালীন ঘোষণাকৃত জরুরি অবস্থানটির অবসান করার প্রয়োজনীয়তা কেউ উপলব্ধি করলেন না।

যুদ্ধবন্দীরা সব মুক্তি পেয়ে গেল। আরও মুক্তি পেল গুপ্তচর, কালো-বাজারী, মুনাফাখোর ও সীমান্তের ওপারে মাল পাচারকারী চোরাকারবারী। কিন্তু পেল না দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সেদিনের যোদ্ধারা, মুক্তি পেল না দেশমাতৃকার সেবায় উৎসর্গীকৃত কতিপয় প্রাণ, যারা দেশের জন্য অকাতরে মৃত্যুকে বরণ করতে দ্বিধা করবে না।

সেলের মধ্যে বসে বসে এমনি সব দুঃখের কথা ভাবছিলাম। হঠাৎ বাইরে চিৎকার, দৌড়াদৌড়ি। বাঁশির আওয়াজ শুনতে পেলাম। ধলু দৌড়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, চাচাজী, পাগলী। বুঝলাম পাগলা ঘন্টা পড়েছে। নিশ্চয়ই কোথাও কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে বা কয়েদী পালিয়েছে। তা না হলে মাসের মধ্যভাগে পাগলা ঘন্টা পড়ল কেন? প্রতিমাসে যে রুটিন মাফিক পাগলা ঘন্টা পড়ে সে ত মাসকাবারী ব্যাপার। হঠাৎ এখন আবার কি হল?

www.pathagar.com

পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে সমস্ত জেলখানায় মিয়াসাবদের বাঁশির আওয়াজ, বুটের শব্দ, সেন্ট্রাল টাওয়ারের একটানা ঘণ্টাধ্বনি আর বিউগলের আওয়াজ ছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। পাগলী জেলখানায় সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ঘণ্টাধ্বনির সাথে সাথে সমস্ত বন্দীরা দৌড়ে যার যার ফাইলে চলে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে লকআপ। শুরু হবে গুনতি। জেল ব্যারাক থেকে রিজার্ভ ফোর্স ঢুকবে ভিতরে, যে যে অবস্থায় থাকবে তাকে ঠিক সেই অবস্থায়ই চলে আসতে হবে। যা সম্মুখে পাবে তা হাতে নিয়ে দৌড়ে এসে জেলের মধ্যে ঢুকবে। তারপর আরম্ভ হবে তাণ্ডব নৃত্য। সে সময় কায়েদীদের লকআপের বাইরে পেলে আর রক্ষা নাই, শুরু হবে অমানুষিক প্রহার। পাগলীর নামে তাই কায়েদীরা সব চাইতে সন্ত্রস্ত।

রিজার্ভ ফোর্স জেল অফিসারদের নিয়ে অকুস্থলে যাবে। অফিসাররা সেখানে রিপোর্ট নেবে, করণীয় কর্তব্য সমাপন করবে, কেষ্টো-ফাইলে এসে গুনতি গ্রহণ করবে এবং সব ঠিকঠাক মিলে গেলে অল ক্লিয়ার বিউগলে বাজাবার আদেশ দেবে। সে আওয়াজ শোনার পর কায়েদীদের লকআপ খোলা হবে। আবার জেলের চাকা ক্ষণবিরতির পর পূর্ণোদ্যমে ঘুরতে থাকবে।

এ সময়ে আমাদেরও লকআপে থাকতে হয়। ঘরে বসেই ব্যাপারটা জানার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারে না। জমাদার মিয়াসাবদের জিজ্ঞাসা করে এক একজনের কাছে এক এক জবাব পাই। বুঝতে পারি আমাদের মত ওরাও এখনো অন্ধকারে। বিরাট জেলখানায় কোন প্রান্তে কোন অপরাধী কোন অভিনব কাণ্ড করে বসে আছে বলা যায় না। হাজার রকমের অপরাধে অপরাধীদের বাসস্থান এই জেলখানা। একে না দেখলে অনেকটাই বাকী রয়ে যায়। বাইরের জগতে আমরা ভাল মন্দ মিলানো মানুষ দেখতে পাই। কিন্তু এখানে দেখতে পাই চিহ্নিত নাম করা অপরাধীদের। যাদের নাম শুনে শৈশবে ভয়ে শিহরে উঠতাম তাদেরকে দেখি এখানে – অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে। সৎ এবং নির্দোষ লোকও যে নেই এমন নয়। সেই সব হতভাগ্যের কথা বলছি না যারা ঘটনাচক্রে বা অদৃষ্টের পরিহাসে নির্দোষ হয়েও আইনের চোখে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে এবং দীর্ঘমেয়াদী সাজা খাটছে। বলছি তাদের কথা যারা সত্যিকারের অপরাধী এবং অপরাধ বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারার এক একজন দিকপাল।

কি অদ্ভুত এবং বিস্তৃত এদের অপরাধ প্রবণতা আর কি অভিনব সব পন্থা।

www.pathagar.com

এমন সব বিপরীত চমকপ্রদ চিন্তাধারা এদের মাথায় সহজেই খেলে যায় যা অন্য দশজন মানুষের মস্তিষ্কে ঢুকবে না। বলিহারি এদের বুদ্ধি ও সাহসকে। আশ্চর্য হয়ে যাই এদের চিন্তাধারা আর কাজের প্রণালী দেখে। ভাবি, যদি সহজ সরল সমাজ-স্বীকৃত পথে এরা চলত কত অবদানই না রেখে যেতে পারত সমাজ এবং মানুষের জন্য।

দীর্ঘদিনের জেল জীবনে অনেক রকম অপরাধে অপরাধী কয়েদীদের সাথে সহজভাবে মিশেছি। এদের ধ্যান-ধারণা, জীবন ও কাজকে জানতে চেষ্টা করেছি। কিছু কিছু বুঝতেও পেরেছি। বুঝেছি, কেবল এরাই দায়ী নয়। দায়ী সমাজ-ব্যবস্থা, দায়ী আমরা সকলে। তাই এদের জন্য গভীর মমতা অনুভব করি। এদের বুদ্ধি, চাতুর্য, কর্মশক্তি আর সাহসের প্রশংসা করি।

যতবারই জেলখানায়া পাগলাঘণ্টির মধ্যে পড়েছি আমার সারা মন আশংকায় কষ্টকিত হয়ে উঠেছে। কি জানি, কোথায় কোন কয়েদী কোন বিচিত্র চিন্তাধারার বশবর্তী হয়ে কোন অভিনব অপরাধ করে বসল; কি জানি কোথায় কোন নতুন আবিষ্কৃত পন্থায় জেল পালাবার দুঃসাহসিক কাজ করে বসল।

হেলিকপ্টার জমাদার সাহেব শেষ পর্যন্ত ঠিক খবর এনে দিল। খুব তাড়াতাড়ি চলাফেরা করে বলে ওকে সকলে হেলিকপ্টার জমাদার বলে ডাকে। শুনলাম, আট সেলের লাইফার কসিমউদ্দিন লোহাকাটার করাত দিয়ে সেলের শিক কাটছিল। সিপাই দেখে ফেলে বাঁশী বাজিয়ে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পাগলাঘণ্টা।

কসিমউদ্দিনকে চিনি। সেবার যখন পুরানো বিশ সেলে ছিলাম কসিমউদ্দিন আমার পাশের ব্লকেই ছিল। সুন্দর স্বাস্থ্যবান সুগঠিত দেহের অধিকারী কসিমউদ্দীন। দেখলে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়। মুখভর্তি কাঁচা চাপদাড়ী। ফর্সা বলিষ্ঠ চেহারায় কালো চাপদাড়ীতে মানিয়েছে সুন্দর। ওকে সব সময় সেল বন্দী করে রাখা হয়। কোন কাজ ওকে করতে হয় না। যতদিন বিশ সেলে ছিলাম প্রতিদিন ঘুম ভাঙ্গত কসিমউদ্দিনের সুরেলা কণ্ঠের কোরান পাঠ শুনে। রাতেও কসিমউদ্দিনের কোরান পাঠ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তাম। কি মিষ্টি ওর আওয়াজ। শুয়ে শুয়ে কান পেতে শুনতাম আর ভাবতাম কসিমউদ্দিন কি দুনিয়ার সাধারণ কাজ কর্মের উর্ধ্বে চলে গেছে? সে কি অন্য জগতের লোক? কসিমউদ্দিনকে বিস্তারিত জানার আগ্রহ হল। আমার সে

www.pathagar.com

সময়ের ফালতু হাসেম ডাকাতকে জিজ্ঞাসা করলাম। হাসেম অল্প বয়সেই বেশ ডাংগর ডাকাত হয়ে গিয়েছিল বলে তাকে সবাই হাসেম ডাকাত বলে সম্বোধন করত। হাসেমও বেশ গর্বের সঙ্গে জবাব দিত, হ্যাঁ আমি ডাকাত। তোদের মত চোর ছ্যাঁচোড় নই।

হাসেমকে কসিমউদ্দিন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতেই বলে উঠল, স্যার, ঐ বদমাশটার কথা জিজ্ঞাসা করবেন না। ও সারাদিন কোরান শরিফ পড়লে কি হবে ওর জন্য হাবিয়া দোজখের আগুন লকলক করে জ্বলছে।

বুঝতে পারলাম না হাসেম কসিমউদ্দিনের উপর এত চটা কেন? আর ওর কথা জিজ্ঞাসা করার সাথে সাথেই একেবারে পাক্কা মওলানার মত হাবিয়া দোজখের লকলকে আগুনের ব্যবস্থা করল কেন। তখন আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করে যা জানতে পারলাম তা কেবল চমকপ্রদই নয় অভাবনীয়ও বটে।

কসিমউদ্দিন ঢাকা জেলের আদি বাসিন্দা নয়। ওকে রাজশাহী সেন্ট্রাল জেল থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বদলি না করে উপায় ছিল না কর্তৃপক্ষের। কসিমউদ্দিন রাজশাহী জেলে ঢোকে পাঁচ বৎসরের কারাদণ্ড নিয়ে। জেলখানার ভিতর বাগানে কাজ দেওয়া হয় তাকে। খায় দায় বাগানের কাজ করে আর অন্য সব কয়েদীদের মত হৈ চৈ করে দিন কাটিয়ে দেয়।

একদিন কোদাল দিয়ে বাগানের জমি কোপাচ্ছিল কসিমউদ্দিন। পার্শ্বেই আর একটি কয়েদী বসে বসে কোপান মাটির ঢেলাগুলো ভেংগে দিচ্ছিল। হঠাৎ কসিমউদ্দিন তার সর্বশক্তি দিয়ে লোকটির ঘাড়ে কোদালের এক কোপ বসিয়ে দিল। জেলখানার বহু ব্যবহৃত ধারাল কোদালের এক কোপে হতভাগ্য কয়েদীটির মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

পাঁচ বৎসরের সাজা নিয়ে জেলখানায় ঢুকে জেলের অভ্যন্তরেই খুন করে বসল কসিমউদ্দিন। জেলের ঘটনাপঞ্জিতেও এমন ঘটনা সচরাচর দেখা যায় না। জেলের মধ্যেই আবার নতুন করে খুনের বিচার হল। কসিমউদ্দিন যাবজ্জীবন সাজা পেল। জেল কোডের নিয়মানুসারে কসিমউদ্দিনকে ভূষিত করা হলো একটি কালো টুপী দিয়ে। এর অর্থ কসিমউদ্দিন কোন মাফমার্কা পাবে না। তাকে পূর্ণ সাজাই খাটতে হবে।

জেল-অভ্যন্তরে খুনের মামলার বিচারের সময় বের হয়ে পড়ল খুনের প্রকৃত

www.pathagar.com

কারণ। ছোকরা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কারাগারের মধ্যে যে সমস্ত অপকর্ম সংঘটিত হয় তার মধ্যে জঘন্যতম অপরাধ হচ্ছে ছোকরা-বাজী। দীর্ঘদিন নারী-সঙ্গ-বর্জিত কয়েদীদের মধ্যে স্বভাবতই প্রচণ্ড যৌন ক্ষুধা জেগে ওঠে। কিন্তু সহজ স্বাভাবিক নিবৃত্তির অভাবে অনেকের মধ্যে এর বিকৃত নিবৃত্তির রূপ দেখা যায়। এই বিকৃত যৌনক্ষুধা মেটাবার জন্য কয়েদীদের মধ্যে সমকামিতার প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয়। এ নিয়েই মাঝে মাঝে সংঘর্ষ বেধে যায়, পরস্পরের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। তার থেকেই অনেক সময় এমনি ঘটনা সংঘটিত হয় যা সেদিন কসিমউদ্দিন করে বসেছিল।

জেলখানায় এ পাপকে বন্ধ করার জন্য প্রথম থেকেই কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট এবং তাদের সাধ্যের মধ্যে যতটুকু সম্ভব একে দমন করার চেষ্টা তারা করেন। এরই জন্য সৃষ্টি হয়েছে কম বয়েসী ছেলেদের নিয়ে 'ছোকরা' ফাইল। সেখানে কেবল অল্প বয়স্ক কয়েদী বা হাজতীরাই থাকবে। সে ফাইলের মেট-পাহারাও নির্বাচিত হবে অতিবৃদ্ধ কয়েদীদের মধ্য থেকে। অন্য কয়েদীরা এ ফাইলে থাকতে পারবে না, কোন যোগাযোগও তাদের থাকবে না এ ফাইলের সঙ্গে; কিন্তু তবুও এ অপরাধকে আটকে রাখা যায় না। দুধ যদি না জোটে, ষোল খেয়েই তখন তৃপ্তি পেতে হয়। ঠিক তেমনি ভাবে ওদের ভাষায় কচি জিনিস না পেলে বুড়া হাড় চিবোতেও ওদের আপত্তি নেই।

নিহত কয়েদীটির সঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরেই কসিমউদ্দিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল একটি নবীন কয়েদীর কায়েমী স্বত্ব নিয়ে। উভয়েই নবীন কয়েদীটির সঙ্গাভিলাসী। নাটকের নায়িকারূপী নায়কও 'যে-মোরে পার-জিনিবারে' ভাব নিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় নায়িকার মতই ঊর্ধ্বমুখে বসেছিল। আকুল প্রেমিক কসিমউদ্দিনকে শেষ পর্যন্ত পথের কাঁটা উপড়িয়ে ফেলতে ধারাল কোদালের সাহায্য নিতে হল। না হয় একটি মানুষকে খুন করতেই হল। তাতে কী আসে যায়। প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রক্তই যদি না ঝরল, দুটি একটি প্রাণ বিসর্জনই যদি না হল তা হলে প্রেমের আর বৈচিত্র্য রইল কোথায়।

কসিমউদ্দিনকে ঢাকা নিয়ে আসার কিছুদিন পরই ওর সাক্ষাৎ পাই। ওর কাহিনী শুনে স্তম্ভিত হয়ে যাই।

www.pathagar.com

কসিমউদ্দিন তখন রাতদিন কোরান পাঠ করে চলেছে। ভাবলাম, এই কি সেই কসিমউদ্দিন? আমার যেন বিশ্বাস হতে চাইল না। কিন্তু আস্তে আস্তে দেখতে পেলাম কসিমউদ্দিনের বাইরেটা যেমন সুন্দর ভেতরটা হয়তবা তেমনি অন্ধকার। কয়েকদিন পরই দেখি কোরান তুলে রেখে দিয়েছে। অত সুন্দর চাপদাড়ি তাও ফেলে দিয়েছে। শুরু করে দিয়েছে অকথ্য গালাগালি আর অযাচিত ঝগড়া। কখনো মিয়া সাবদের সঙ্গে কখনো জমাদারের সঙ্গে আবার কখনো অন্য কয়েদীদের সঙ্গে গায়ে-পড়ে ঝগড়া আর অবিরাম নালিশ। ওর জ্বালায় কর্তৃপক্ষ অস্থির হয়ে উঠল। সারাদিন ধরে কসিমউদ্দিন শুধু ফন্দি এটে বেড়ায় কিভাবে কার ক্ষতি করা যায়, কিভাবে কার নামে অভিযোগ এনে তাকে শায়েস্তা করা যায়। কসিমউদ্দিনের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দুষ্টামির আঁচে গলতে শুরু করল। সিপাই, মেট, পাহারা, জমাদারদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলল কসিমউদ্দিন। এ এক অদ্ভুত মানসিকতা। মানুষকে কষ্ট দিয়ে তার অপকার করে বা তাকে বিপদে ফেলে কসিমউদ্দিন অপার্থিব আনন্দ পেত।

বাধ্য হয়ে কর্তৃপক্ষ কসিমউদ্দিনকে নতুন বিশ সেলের দোতলার ব্লকে স্থানান্তরিত করল। দু'একদিন যায়। হঠাৎ এক রাতে বাঁশি বেজে উঠল। মিয়াসাব জমাদারদের দৌড়াদৌড়িতে রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে সারা জেল জেগে উঠল। রাত্রিতেই পাগলা ঘণ্টা বেজে উঠলো। হন্তদন্ত হয়ে জেলর সাহেব অকুস্থলে গিয়ে শুনলেন কসিমউদ্দিন নিজের গামছার সাহায্যে দরজার উপরের শিকের সাথে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করার ব্যবস্থা করেছিল। মাথাটি মাত্র ফাঁসের মধ্যে ঢুকিয়েছে আর তক্ষুণি ডিউটি সিপাই দেখে ফেলে ভয়ে চিৎকার করে উঠেই প্রাণপণে বাঁশি বাজাতে শুরু করে দিয়েছে। সকলে দৌড়াদৌড়ি করে এসে ওর গামছা খুলে নেয়। জেলার সাহেবের জেরার উত্তরে কসিমউদ্দিন দাঁত বের করে হেসে বলে, দেখলাম আমি আত্মহত্যা করতে চাইলে আপনারা কী করেন।

কসিমউদ্দিনকে তখন পাঠান হল জেলখানার সব চাইতে নিভৃত এলাকা আট সেলে। এর পাশেই জেলখানার ফাঁসিকাষ্ঠ। যাদের ফাঁসি হয় তাদেরও রাখা হয় এই সেলে। তাই একে ফাঁসির সেলও বলা হয়ে থাকে। অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির কয়েদীদের সব রকম শাস্তির ব্যবস্থা নিঃশেষ হয়ে গেলে এই সেলে এনে রাখা হয়। অচিরেই দুষ্টু গরু শিষ্ট হয়ে আপন গোয়ালে ফিরে যায়। কিন্তু কসিমউদ্দিন চীজই আলাদা।

www.pathagar.com

সেদিন ডি. আই. জি'র ফাইল। সাহেব আট সেলেও যাবেন। কসিমউদ্দিনই জানে কি করে সে একটি লোহাকাটা করাত জোগাড় করে রেখেছিল। সাহেব আসার সময় হতেই সে প্রকাশ্য দিবালোকে লোহার দরজার শিক কাটতে শুরু করেছিল। অদূরে দণ্ডায়মান সিপাই দেখতে পেয়েই দিল বাঁশিতে ফুঁ। বেজে উঠল পাগলা ঘণ্টা, উত্তাল হয়ে উঠল সারা জেলখানা।

সাহেব ভিতরে ঢুকে গিয়েছিলেন। সোজা আট সেলে গিয়ে নিজ চোখেই সব দেখতে পেলেন। কসিমউদ্দিনকে জিজ্ঞেসা করলেন, করাত কোথায় পেলে?

জবাব এল, আপনার মত লোক যে জেলের সুপারিনটেনডেন্ট সে জেলে করাত জোগাড় করা ডাল-ভাত।

সমস্ত নিম্নস্থ কর্মচারীদের সম্মুখে এ রকম উত্তরে ডি. আই. জি. সাহেব এক মিনিটের মধ্যেই আত্মস্থ হয়ে শান্ত কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করলেন, কেন এই করাত জোগাড় করেছ?

উত্তর এল, এ জেলে থাকব না। আপনার মত সাহেবের জেলে আমি থাকতে চাই না।

একটু পরেই আবার বলল, আজ করাত এনেছি। এর পরের দিন রিভলবার আনব। আপনাকে গুলি করে মারব। তারপর এখান থেকে চলে যাব চিরদিনের মত। আপনার মত অযোগ্য অফিসার রাখব না।

অভিজ্ঞ ডি. আই. জি. সাহেব আর কথা বাড়ালেন না। করাত কেড়ে নেওয়া হল। আর একবার তল্লাশি হল কসিমউদ্দিনের দেহ। ওখানে দাঁড়িয়েই ডি. আই. জি. সাহেব চারজনকে সাসপেণ্ড করলেন। ডিউটি জমাদার, মিয়াসাব, সি. আই. ডি. জমাদার এবং সুবেদার এর মধ্যে পড়ল।

দৈন্য, দুর্ভিক্ষ আর দুর্মূল্যের বাজারে চাকুরী থেকে সাময়িক বরখাস্ত হয়ে এই চারজন কর্মচারী তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে যে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে পড়ল তার পশ্চাতে রইল অঘটন-ঘটন-বিলাসী কসিমউদ্দিনের বিকৃত মনের উদ্ভট পরিকল্পনা। কসিমউদ্দিনের তুলনা কসিমউদ্দিনই।

দ্বিপ্রহরের খাওয়া মাত্র শেষ করেছি। একটি সিগারেট জ্বালিয়ে বিছানায় অর্ধশোয়া হয়ে আমেজ করে ধূমপান করছি। হাঁড়ির মত গোল মুখটি গম্ভীর

www.pathagar.com

করে ঘরে ঢুকলেন শামসুল হক সাহেব। হক সাহেবকে সুলতান নারদ মুনি বলে ডাকে। মুনি ঠাকুরের কিছু কিছু গুণ তার মধ্যেও নাকি আছে। একজনের পিছনে লেগে তার জীবন ঝালাপালা করে দেওয়ার জন্য হক সাহেব একাই যথেষ্ট। দশ সেলের প্রতিটি আনন্দানুষ্ঠানের প্রযোজক, পরিচালক, অভিনেতা এবং সঙ্গীত পরিচালক তিনি। তাকে বাদ দিয়ে আমাদের কোন অনুষ্ঠানই সম্ভব নয়। দশ সেলের সবগুলি সাব কমিটির স্বনির্বাচিত চেয়ারম্যান তিনি। কেউ চ্যালেঞ্জ করলে গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর করেন, আমি পাকিস্তানী স্টাইলে নির্বাচিত। আমাদের দৈনন্দিন সব প্রয়োজন এবং অভাব-অভিযোগের সুরাহার বিরক্তিকর কর্তব্যটি তিনি স্বেচ্ছায় হাসিমুখে নিজ হাতে তুলে নিয়েছেন। জেলখানায় হক সাহেব একজন প্রয়োজনীয় এবং আনন্দদায়ক সঙ্গী। ১৯৫২ সালে আমার প্রথম কারাবরণের সময়ও তিনি সাথে ছিলেন। সে সময় তিনি একজন ছাত্রনেতা। পরবর্তীকালে তিনি সলিমুল্লাহ হলের সহসভাপতি নির্বাচিত হন। ছাত্রলীগেরও তিনি অন্যতম সহসভাপতি ছিলেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে হক সাহেব প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার শেষ পর্যায়ে প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খানের পলিটিক্যাল সেক্রেটারি নিযুক্ত হয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। বাইরে স্বল্পভাষী, গম্ভীর প্রকৃতির একজন সিরিয়াস কর্মী, ভিতরে হাসিখুশি, সর্বকর্মে পটু, দুষ্টামির শিরোমণি।

হক সাহেবের গম্ভীর মুখের পেছনে কোন হাসির ঝর্ণা লুকিয়ে আছে দেখার জন্য তার দিকে ভাল করে চাইতেই আমার আচ্ছন্নতা কেটে গেল। একটা সুগম্ভীর বেদনার ছায়া তারা সারা মুখটাকে ম্লান করে রেখেছে। তাড়াতাড়ি উঠে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে ভাই?

হক সাহেব নত মস্তকে আস্তে আস্তে জবাব দিলেন, এই মাত্র খবর এসেছে সুলতানের বাবা আজ সকালে মারা গেছেন। বাইরে থেকে সুলতানের আত্মীয়স্বজনেরা প্যারলের দরখাস্ত করেছিল দু'ঘণ্টার জন্য। ওকে প্যারলও দিয়েছে, সিপাই এসেছে নিতে। কিন্তু ও এখনো কিছুই জানে না – ঘরে ঘুমিয়ে আছে। কি করি বলুন তো? এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বলে তিনি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

আকস্মিক আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। কিন্তু আঘাত যত বড়ই হোক – কর্তব্য তার চেয়েও বড়, তাকে অবহেলা করলে চলবে না। এক্ষুণি

www.pathagar.com

সুলতানকে পাঠাতে হবে – ওর জন্য মৃতের শেষ কৃত্য এখনো বাকী রয়েছে। দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে মমিন সাহেবের ঘরে গেলাম। অন্য সবাইকেও ডেকে আনলাম। পরামর্শ করে দেখলাম সুলতানকে এখন কিছু বলা ঠিক হবে না। বলব ওর মায়ের অসুখের জন্য ওকে দু'ঘণ্টার জন্য প্যারল দিয়েছে, তাই বলে ওকে পাঠিয়ে দেব। বাইরে আত্মীয়-স্বজনের মাঝে গিয়ে এ মর্মান্তিক খবর সুলতান শুনুক। আমরা বন্ধু হয়ে একথা ওকে জানাতে পারব না।

সুলতানকে ঘুম থেকে তুললাম সকলে। আস্তে আস্তে বুঝিয়ে বললাম ওর প্যারলের কথা। বললাম, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে চলে যাওয়ার জন্য। প্যারলের কথা শুনেই সদাহাসিমাখা সুলতানের ফর্সা মুখটি কাগজের মত সাদা হয়ে গেল। একটি কথাও বলল না সে। বুদ্ধিমান ছেলে সুলতান কি বুঝলো সেই জানে। আস্তে আস্তে উঠে জামাকাপড় পরে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় আমাদের দিকে তাকিয়ে বললো, যাই, হয়তো মাকে গিয়ে দেখতে পাব না। দু'ফোঁটা তপ্ত অশ্রু ঝরে পড়ল ওর বিষাদ-করুণ চোখ দুটি হতে।

কিছুদিন থেকে শুনেছিলাম সুলতানের মায়ের অসুখ। এমনি করে যে ওর বাবা মারা যাবেন তা আমরা ভাবতেও পারিনি। সুলতান ওর মায়ের কথাই বলে গেল। মৃত্যু এমনই জিনিস যা মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে – কখন কার দিকে তার হিম শীতল হস্ত প্রসারিত করবে তা কেউ জানে না। কেউ জানে না সংসারের সুবৃহৎ কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত মানবের সুপ্তিমগ্ন দ্বারে কখন মৃত্যু দেবতা হানা দেবে। পৃথিবীর দেনা-পাওনা শোধ করে মানুষ সেদিন যাত্রা করবে অনন্তের পথে। স্ত্রী-পুত্র-পরিজন আর দুনিয়ার সহস্র লোভ, মোহ, স্নেহ-মমতা ছেড়ে সে চলে যাবে চির অনির্দিষ্টের পথে। স্বয়ং বিধাতাই জানেন এ যাত্রার শেষ কোথায়, কোথায় এর চরম পরিণতি।

সুলতানের বাবার আকস্মিক মৃত্যু আমাদেরও বিহ্বল করে ফেলে। মন ছুটে যায় হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনদের অনেক স্মৃতির ভিড়ে। বাবা, মা, দু'জনকেই হারিয়েছি। আজ বার বার শুধু তাদের স্মৃতিই মানসপটে ভেসে উঠে। সারা মন ব্যথায় ছেয়ে যায়। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা ধরা যায় না সত্যিই। প্রিয়জনদের মৃত্যুশিয়রে উপস্থিত থেকে বিদায়ের আগে অন্তিম মুহূর্তে তাকে শেষ দেখার

www.pathagar.com

ইচ্ছাও তাই জেগে ওঠা স্বাভাবিক। বেচারা সুলতানের ভাগ্যে তা ঘটল না। মৃত্যুর আগে জন্মদাতাকে ও দেখতে পেল না। অন্তিম-শয়নে হতভাগ্য পিতা পেল না তার জ্যেষ্ঠ সন্তানের হাতের পানিটুকু।

আমরা ভেবেছিলাম বাইরে যাওয়ার পর সুলতানের প্যারলের সময় কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই বাড়িয়ে দেবে। শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের মাঝ থেকে সদ্য পিতৃহারা বাড়ির জ্যেষ্ঠ সন্তানকে সঙ্গে সঙ্গে জেলখানায় পূরবে না। আশা করেছিলাম দিন দু'য়েকের সময় অন্তত সুলতান পাবে ওর শোকাভিভূত পরিবারের মধ্যে বাস করতে। শোকের অসহনীয় যন্ত্রণার সামান্য উপশম হলে সকলকে সান্ত্বনা দিয়ে প্রবোধ বাণী শুনিয়ে আসতে পারবে। এ রকম ঘটনার নজিরও আছে। সেবার ১৯৬৪ সালে এই জেলেরই এক দুই খাতায় থাকাকালীন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল আলম খানের পিতৃ বিয়োগ হয়েছিল। ওর জন্যও প্যারল হয়েছিল। ওকে মৃত্যু সংবাদ না জানিয়ে প্যারলে নোয়াখালী পাঠিয়ে দেওয়া হল। সেখানে পৌছে পিতার মৃতদেহও সিরাজ দেখতে পায়নি। ওর পৌছার পূর্বেই তাকে তার চির শয্যায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল। দু'দিনের প্যারলে পাঠালেও পরে সরকার ওর প্যারলের সময় আরও দু'দিন বাড়িয়ে দিয়েছিল।

সুলতানের ব্যাপারেও এতটুকু সহৃদয়তা আমরা আশা করেছিলাম। কিন্তু দেখতে পেলাম ওদের কাণ্ডজ্ঞানটুকু পর্যন্ত নেই। পিতার দেহ কবরে শুইয়ে দিতে না দিতেই ওকে আবার জেলখানায় ফিরিয়ে নিয়ে এসে ওরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

সেদিন আমরা আমাদের দৈনন্দিন ব্যায়াম খেলা বা আলোচনা সভা করলাম না। মরহুমের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশে আমরা একত্রিত হয়ে প্রার্থনা করলাম। একটু পরেই সুলতান কাঁদতে কাঁদতে আমাদের মাঝে এসে দাঁড়াল। ছুটে গিয়ে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। বুক দিয়ে ওর বুকের সীমাহীন বেদনাকে অনুভব করতে চাইলাম। কাঁদতে কাঁদতে সুলতান দুর্বল হয়ে পড়েছে। চোখমুখ ওর ফুলে উঠেছে। মূর্তিমান শোক ওর দেহে রূপলাভ করেছে। সকলেই ওকে সান্ত্বনা দিলেন। মহাত্মা গান্ধীর ভাবশিষ্য, নোয়াখালী গান্ধী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা নিরাপত্তা বন্দী চারু চন্দ্র চৌধুরী এলেন, আরও এলেন ছাব্বিশ সেল থেকে সত্যেন দা, অজয়বাবু এবং ননীবাবু। সকলেই ওকে সান্ত্বনার বাণী শোনালেন। চারুবাবু বললেন, সহজে এই আঘাত কাটিয়ে ওঠার মধ্যেই একজন রাজনৈতিক কর্মীর মানসিক দৃঢ়তার পরিচয়।

www.pathagar.com

আমাদের ঢাকা শহর শাখার অফিস সেক্রেটারি সুলতান দীর্ঘদিন ধরেই আওয়ামী লীগের একজন বিশিষ্ট কর্মী। ওর নিরলস কর্মতৎপরতা ও নির্ভরযোগ্যতার জন্য সকলেই ওকে পছন্দ করে। জেলখানার মধ্যে বসেও হাসি-খুশির মধ্যেই দিন কাটিয়ে দেয়। সুলতান বিবাহিত যুবক। সুন্দরী স্ত্রীর জন্য টানটা স্বভাবতঃই একটু বেশি। এ নিয়ে হক সাহেব সুলতানকে সর্বক্ষণ উত্যক্ত করে মারে। খেলাধুলার মধ্যে একমাত্র ব্রে খেলে সুলতান। অন্য খেলা জানেও না খেলেও না। লোক পেলে ব্রে খেলতে চায় আর দিনের মধ্যে কমপক্ষে দু'চারবার ব্রে হওয়ার কৃতিত্বও রাখে। দশ সেলে এ জন্য ওর নাম মোহাম্মদ সুলতান ব্রে।

বাবা মারা যাওয়ার আঘাত সুলতান আস্তে আস্তে কাটিয়ে উঠতে লাগল। বিষাদলিপ্ত চেহারা নিয়ে সুলতান নীরবে বসে থাকে। ওর এই ছন্নছাড়া মূর্তি আমাদের পীড়া দেয়।

গল্পে কথায় ওকে আস্তে আস্তে ওর দুঃসহ শোক ভুলিয়ে দিতে চেষ্টা করি। কিন্তু সব চাইতে বড় সহায় সময়। সময় কাটার সাথে সাথে শোকের তীব্রতাও কমে আসে। একদিন যা দুঃসহ মনে হয়, যা চিন্তা করে বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যেতে চায় সময়ের স্রোতে সে ব্যাথাই লঘুতর হয়ে ওঠে। না হলে বোধ হয় মানুষ সংসার ধর্ম পালন করতে পারত না।

দিন কয়েক পরেই একটি কয়েদীর মা'র মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া দেখলাম। কয়েদীটি চুরি মামলার আসামী এবং একজন পাক্কা ঘাঘু 'বি' ক্লাশ। চারু বাবুর ছাপাইয়ের কাজ করে টেনু, কিন্তু ওর সব উদ্ভট কার্যকলাপের জন্য ওকে আমরা পাগলা বলে ডাকি। পাগলা বললেই যেন ও বেশি খুশি। সুন্দর স্বাস্থ্য পাগলার – মাঝে মাঝে আমাদের সাথে ভলিবল খেলে। একটা কাজ করতে বললে কৃতার্থ হয়ে যায়। আমাদের সংস্পর্শে পাগলা রীতিমত শান্ত সুবোধ ছেলে। কিন্তু আর কয়েদীদের সাথে ওর একদণ্ড বনিবনাও নেই। নাইট গার্ড, মেট পাহারাদারদের সাথে প্রায়ই ঝগড়া হচ্ছে। দু'চার ঘা দিচ্ছে, খাচ্ছেই বেশি। সেদিন ছোকরা ফাইলের কয়েকটি ছেলের যৌথ আক্রমণে ওর সামনের দু'টি দাঁত পড়ে গেল। দিন দুয়েক লজ্জায় আমাদের থেকে দূরে সরে রইল। তৃতীয় দিনেই হাসি-খুশি পাগলা এসে দাঁড়াল। দুটো দাঁত নেই। অনর্থক মারামারি করার জন্য ওকে খুব বকলাম – হাসিমুখে পাগলা চুপ করে রইল। পরদিন আমরা ভলিবল খেলার উদ্যোগ করেছি – বিষণ্ন বদনে পাগলা এসে দাঁড়াল। মনে হল একটু আগে কেঁদেছে। বললাম, আয় পাগলা

www.pathagar.com

খেলবি।

ও বলল, মিয়া ভাই আজ খেলব না। দেখা এসেছিল, ভাই বলে গেলেন মা মারা গেছে। বলতে বলতে পাগলার চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। আমি ভাষা হারিয়ে ফেললাম – কি বলে ওকে সান্ত্বনা দেব। শৈশবে মাতৃহীন হয়ে আমি ত জানি মা কি সম্পদ। সারা পৃথিবীর বিনিময়েও গর্ভধারিণী মাকে হারাবার ক্ষতিপূরণ করা যায় না। পাগলা আজ থেকে সত্যিই হতভাগ্য। যেখানে যে অবস্থায়ই ও ছিল না কেন এতদিন একটি মায়ের অন্তর মথিত শুভাশীষ সবসময় ওকে ঘিরে রাখত – আজও সে জিনিস থেকে বঞ্চিত হল। বললাম, দুঃখ করিস না ভাই, মা-বাবা কারো চিরদিন থাকে না। এতদিন যাই করে থাকিস, এবার থেকে সৎ পথে চলতে চেষ্টা কর। তোকে সৎ পথে জীবনযাপন করতে দেখলে পরলোকে তোর মায়ের আত্মা শান্তি পাবে। সেখান থেকেই তোর প্রতি তার আশীর্বাদ ঝরে পড়বে। পাগলা কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে মাটির দিকে চেয়ে রইল। একটু পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে চলে গেল। ভাবলাম কয়েকদিন অন্তত পাগলা মৃতা জননীকে স্মরণ করে শান্ত থাকবে – নতুন কোন উৎপাত করব না। কেন জানি না এই ছন্নছাড়া ছেলেটার জন্য আমার অন্তর কাঁদত – কিছুটা মায়া পড়ে গিয়েছিল।

পরদিন চার খাতায় ভীষণ হৈ চৈ শুনে এগিয়ে গেলাম। যেয়ে দেখি দশ-বারটা ছেলের সাথে বীর বিক্রমে পাগলা একাই যুদ্ধ করে চলেছে। ছেলেরা সমানে পাগলাকে কিল-ঘুষি-চড় মারছে। দু'একজন ইট-থালা-ঘটি-বাটি নিয়েই পাগলাকে মারছে। পাগলাও খালি হাতে সমানে যুদ্ধ চালাচ্ছে। শত হলেও পাগলা একা। মারের চোটে ওর মুখ দিয়ে রক্ত বের হয়ে এসেছে। পাজামা-শার্ট ছিঁড়ে গেছে। শরীরের বিভিন্ন জায়গা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। তবুও পাগলা দমছে না। নিজে এ যুদ্ধরত নেপোলিয়ানদের মধ্যে ঢুকতে সাহস পেলাম না। ডিউটি মিয়া সাহেবের সাহায্যে অতি কষ্টে যুদ্ধমান দুই পক্ষকে দুইদিকে সরিয়ে দিয়ে পাগলার কান ধরে টেনে সরিয়ে আনলাম। দেখলাম ওর আরো দুটি দাঁত পড়ে গেছে। বললাম, পাজী হতভাগা, কাল তোর মা মারা গেছে আর আজ তুই এমনি করে মারামারি করছিস? তোর এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই?

পাগলা বলল, মিয়া ভাই, আমার কোন কসুর নাই, ওদের পাহারার সাথে আমার ঝগড়া হয়েছিল, তাকে আমি আস্তে একটা ধাক্কা দিয়েছি। সেই জন্যই ওরা সবাই মিলে আমাকে মারল। বলেন, আমার দোষ?

www.pathagar.com

তখনকার মতো ধমক দিয়ে ওকে মুখ-হাত ধোয়ার জন্য পাঠিয়ে দিলাম। চারু বাবু সব সময় কিছু ঔষধ মজুদ রাখেন ঘরে। তিনিই তা লাগিয়ে দেবেন।

অনুসন্ধানের ফলে আজকের দন্তক্ষয়ী সংঘর্ষের কারণ জানা গেল। ছোকরা ফাইলের একজন বৃদ্ধ পাহারা আছে, ছেলেদের মারধর করে না, হাসিমুখে ওদের অনেক অত্যাচার সহ্য করে। লোকটি নিরীহ প্রকৃতির ভাল মানুষ। ছেলেদের স্নেহ করে। আমরাও ওকে চিনি। দেখতে অনেকটা নোয়াখালীর আবদুল জব্বার খদ্দর সাহেবের মত। তাই আমরা নিজেদের মধ্যে ওকে খদ্দর ভাই বলে ডাকি। ছেলেরা আদর করে ডাকে 'গোপশেঠ'। এ নামকরণের তাৎপর্য জানি না। ছেলেদের, বিশেষ করে এই সব ধুরন্ধর ছেলেদের, মনের অলিগলির খবর আমরা ত কোন্ ছার স্বয়ং বিধাতা-পুরুষও হয়তো জানেন না। জামিনে খালাস হওয়ার সময় দেখেছি ছেলেরা ওদের গোপশেঠের পায়ে হাত দিয়ে কদমবুচি করে যাচ্ছে। ওদের এই প্রিয় পাহারাদারটিকে সেদিন পাগলা তর্ক করতে করতে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে। ছেলেরা দেখতে পেয়েই আক্রমণ করেছে পাগলাকে। ওরা সংখ্যায় বেশি। পাগলা গোপশেঠের উপর হাত তুলে ওদের সুযোগ দিয়ে দিয়েছে গোপশেঠের প্রতি ওদের ভালবাসা দেখাবার। পাগলাকে মলিদা বানিয়ে তাই ওরা যার পর নাই আনন্দিত।

চার চারটি দাঁত হারিয়ে এ দিকে পাগলার সুন্দর চেহারাটিই দৃষ্টিকটু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু হতভাগার সেদিকে লক্ষ্য নেই। ছ্যাঁচড়া চুরির অপরাধে মাত্র তিন মাসের সাজা নিয়ে পাগলা এসেছে এবার। মাফ মার্কার বালাই নেই, তাই রিপোর্ট হওয়ারও ভয় নেই – বেপরোয়া পাগলা তাই আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

দিন কয়েক পরে এক জোড়া রং-বেরং-এর জুতা হাতে করে হাসিমুখে পাগলা আমার কাছে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইতেই বললে, জুতা জোড়া কিনলাম মিয়া ভাই। আপনার এখানে রেখে যাব। খালাসের দিন নিয়ে যাব। রাখি?

অনুমতি দিলাম। জিজ্ঞাস করলাম, কবে তোর খালাস?

এক গাল হেসে বলল, আর নয়দিন আছে।

www.pathagar.com

বললাম, বাইরে গিয়ে চুরি করবি না ত?

চট করে পাগলা আমার পা ছুঁয়ে বলে উঠল, এই কসম খাচ্ছি মিয়া ভাই, আর কোন দিন চুরি করব না। এবার বাইরে গিয়ে রিকসা চালাব।

তারপর একটু হেসে বলল, আমার রিকসায় রোজ আপনাকে কোর্টে নিয়ে আসব মিয়াভাই।

সুরটা আবদারের, ভাল লাগল, বললাম, তাই করিস।

খালাসের দিন সকলের সাথে দেখা করে আমার কাছে এসে বিদায় চাইল। পায়ে হাত দিয়ে ছালাম করে কেঁদে ফেলল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, মিয়া ভাই যাই, আমার সব অপরাধ ক্ষমা করবেন।

ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললাম, আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিস মনে থাকবে ত?

ঘাড় নেড়ে জবাব দিলম, থাকবে।

ওকে ছেড়ে দিলাম। আস্তে আস্তে বেরিয়ে পাহারার সাথে গেটের দিকে চলে গেল।

মানিক ভাই ক্ষেপে উঠেছেন। তিন দিন তিন রাত ঘুমাতে পারেননি। জেলখানার পাশেই উর্দু রোডের উপর গত তিন দিন ধরে মাইক্রোফোনে উর্দু হিন্দি গানের রেকর্ড বাজান হচ্ছে। কবি বলেছেন, গান যে পছন্দ করে না সে মানুষ খুন করতে পারে। কবি নিশ্চয়ই আমাদের অবস্থায় কোনদিন পড়েননি। দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা মাইক্রোফোনের কান ফাটানো স্বরে বোম্বাই আর লাহোর মার্কা লারেলাপ্পা গান যদি কবিবরের কর্ণকুহরে অবিরাম বর্ষণ করে কানের পর্দা দুটি ফাটিয়ে দেওয়া যেত – তা হলে কবি নিশ্চয়ই তার মত বদলাতে বাধ্য হতেন। হয়তো এসব অসহ্য গান পরিবেশনকারীদেরই খুন করার জন্য রাম দা নিয়ে ছুটতেন।

ব্লাডপ্রেসার আর ডায়াবেটিসের রোগী বয়োবৃদ্ধ মানিক ভাই তিন দিনের নিদ্রাহীনতার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়েছেন। অফিসকে মিজান ভাই এত্তেলা

www.pathagar.com

পাঠিয়েছেন, ঢাকার এসপি'কে এই প্রাণান্তকর সঙ্গীতের আসর বন্ধ করার আবেদন জানানোর জন্য। প্রায়ই এখানে এমনি অসুরে গান-বাজনার আসর বসানো হয়। কি জঘন্য ওদের রুচিবোধ আর কি ঘৃণ্য ওদের আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন। শত শত মানুষকে দিন-রাত অসহনীয় যন্ত্রণায় উত্যক্ত করে ওরা অপার্থিব আনন্দ লাভ করে। পয়সা ব্যয় করে মানুষ কি করে এমনি ভয়াবহ আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারে আমরা ভেবে পাই না। সরকারের উচিত আইন করে এসব নুইসেন্স বন্ধ করে দেওয়া। গুটি কয়েক টাকাওয়ালা লোকের বিকৃত রুচির জন্য শত শত শান্তিপ্রিয় নির্বিরোধ নাগরিকদের এ হেন নরক যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করা তাদের একান্ত কর্তব্য।

মানিক ভাইকে নিয়ে আমরা সব সময়ই উৎকণ্ঠায় থাকি। এ সময় তার পক্ষে কারাগারের জীবন এমনিই কষ্টকর। তদুপরি ইদানীং তিনি প্রায়ই পীড়িত হয়ে পড়ছেন। জেল কর্তৃপক্ষ, ডাক্তার, সিভিল সার্জন সব সময় তাকে নিয়ে সন্ত্রস্ত থাকে।

মানিক ভাই যখন সুস্থ থাকেন তখন তার সঙ্গ আমাদের সব চাইতে বেশি কাম্য। মানিক ভাইয়ের প্রতিটি কথা আমদের শিক্ষনীয়। তিনি যখন আমাদের ডেকে নিয়ে বসেন এবং এক একদিন এক একটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনি। উৎসাহী শ্রোতা পেয়ে তিনিও আনন্দ পান। ব্যাপক পড়াশোনা রয়েছে মানিক ভাইয়ের। দুনিয়ার প্রায় প্রতিটি দেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের ইতিহাস তার নখদর্পণে। ইতিহাস, সাহিত্য এবং দর্শনে মানিক ভাইয়ের জ্ঞান অপরিসীম। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তার অবদান শুধু পাক-ভারত উপমহাদেশেই নয় – আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও স্বীকৃতি লাভ করেছে। পূর্ব পাকিস্তানের সাত কোটি নির্যাতিত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বার্তাবাহী সংবাদপত্র দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক ভাই আন্তর্জাতিক সংবাদপত্র সংস্থার পাকিস্তান শাখার সভাপতি। দেশের অভ্যন্তরেও অনেক প্রতিষ্ঠানের সাথে তিনি জড়িত। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের অন্তরে মানিক ভাইয়ের আসন শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতায় স্থায়িত্ব লাভ করেছে। এদেশের ভাগ্য-বিড়ম্বিত মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি আর মুক্তিই তার কাম্য।

স্বাধীনতা-পূর্বকাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এদেশের প্রতিটি প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক সংগ্রামের চিন্তার খোরাক জুগিয়েছেন মানিক ভাই তার বিশ্রুত লেখনীর মাধ্যমে। তার প্রতিটি কলমের আঁচড়ে থাকে অন্যায়-অবিচারের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে তীব্র কষাঘাত। তার তীক্ষ্ণ লেখনীর আঘাতে ঝিমিয়ে পড়া মানুষের মধ্যে সঞ্জিবনী সৃষ্টি হয় – মানুষ সংগ্রামের শপথ নেয়। স্বৈরাচারী শক্তির কম্পন সৃষ্টি হয় মানিক ভাইয়ের লেখনীর দুর্বার শক্তি দেখে। তাই ওরা তাকে সহ্য করতে পারে না। তাই বার বার ওরা মানিক ভাইয়ের উপর তীব্র আঘাত হানে – ওরা স্তব্ধ করে দিতে চায় তার সংগ্রামী লেখনীকে। ওদের প্রতিটি আঘাত ব্যর্থ করে ফিরিয়ে দেন অদম্য কর্মী পুরুষ মানিক ভাই। পুরুষকারের বলেই নিজেকে আজকের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি। কোন চোরাগলির আশ্রয় তিনি নেননি তাঁর জীবনে।

নির্ভীক সংগ্রামী মানিক ভাইকে শত আঘাতেও এতটুকু আদর্শচ্যুত করা যায়নি। আঘাতে আঘাতে তিনি আরও কঠিন হয়েছেন, আরও তেজোদীপ্ত হয়েছে তার লেখনী। মানিক ভাইয়ের জীবন এক সুদীর্ঘ সংগ্রামেরই জীবন। কত বাধা-বিঘ্ন পার হয়ে, কত প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে তিনি তার স্বপ্ন ও সাধনাকে বাস্তবায়িত করেছেন 'ইত্তেফাক' প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। সেদিনের চারাগাছটি আজ বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়েছে।

ইত্তেফাক সাপ্তাহিক আকারে জন্মের পর থেকেই এদেশের গণতন্ত্রমনা প্রগতিশীল মানুষের কাছে বিপুল আস্থা লাভ করে। দেশের ছাত্র-যুবক সংগ্রামী কর্মীরা ইত্তেফাককে আপন করে নেয়। এদেশের মানুষের জীবনে ইত্তেফাকের ভূমিকা কেবল সংবাদপত্রের ভূমিকাই নয় – ইত্তেফাক এদেশের সাত কোটি ভাগ্যহত মানুষের একমাত্র মুখপত্রও বটে। ইত্তেফাক তাদের ধ্যান-ধারণা আর স্বপ্নের বার্তাবাহী। ইত্তেফাক তাদের চিন্তাধারার ধারক-বাহক।

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তাই ইত্তেফাককে সহ্য করতে পারে না। সহ্য করতে পারে না ইত্তেফাকের সম্পাদক এবং মালিক মানিক ভাইকে। বার বার বুর্জোয়া শাসকদের কোপানল পড়েছে ইত্তেফাকের উপর। কতবার যে ওরা ইত্তেফাকের উপর বিধি-নিষেধের আদেশ জারি করেছে, কতবার যে ওরা সেন্সরশীপ বসিয়েছে, জামানত তলব করেছে, মামলা দায়ের করেছে তার হিসাব নেই। কতবার যে ওরা মানিক ভাই এবং তার সহকর্মীদের কারাগারে নিক্ষেপ করেছে তার সঠিক হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তবুও মানিক ভাই বা ইত্তেফাককে ওরা দমাতে পারেনি, এদেশের লক্ষ কোটি নিপীড়িত মানুষের মর্ম বেদনায় ইত্তেফাকের প্রতিটি পাতা ভরে উঠেছে। সামরিক আইনের ভ্রুকুটিকে অবহেলা করে ইত্তেফাক সেদিনও তার আদর্শের ধ্বজা উর্ধ্বে তুলে

www.pathagar.com

রেখেছিল।

সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও ইত্তেফাকের ভূমিকা প্রশংসার দাবী রাখে। দুর্নীতি, ঘুষ, কালোবাজারী দূর করার জন্য ইত্তেফাক বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়েছে। দেশের দরিদ্র মানুষের জন্য স্কুল, কলেজ, রাস্তাঘাট, হাসপাতাল তৈরির আবেদন – ইত্তেফাকের পৃষ্ঠায় দৈনন্দিন ব্যাপার। দেশ থেকে চোর, ডাকাত, পকেটমার, ছেলেধরা, ঘাটু দল সমূলে উৎপাটনের উদ্দেশে ইত্তেফাক আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছে।

জনতার হৃদয়ে যার আসন, স্বৈরাচারী তাকে সহ্য করে না। ইত্তেফাকের ক্ষেত্রেও তাই হল। ছয় দফা আন্দোলনের সমর্থনে সেদিন সাতই জুন ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও তেজগাঁয়ে ধূলি-ধূসরিত রাজপথ যখন সংগ্রামী জনতার রক্তে লাল হয়ে উঠল তখন সরকারও মরিয়া হয়ে উঠল ইত্তেফাককে চিরতরে বিনষ্ট করে দেওয়ার জন্য। অচিরেই ওরা দেশরক্ষা আইন প্রয়োগ করে গ্রেপ্তার করল মানিক ভাইকে আর সঙ্গে সঙ্গে ওদের শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করল ইত্তেফাককে বাজেয়াপ্ত করে।

মানিক ভাই জানতেন এবং তৈরিও ছিলেন যে কোন আঘাত হাসিমুখে বরণ করে নেওয়ার জন্য। রাত্রির অন্ধকারে ওরা মানিক ভাইকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এল। দশ সেলে ঢুকেই শান্ত সমাহিত মানিক ভাই বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। দু'ঘণ্টা পরে রাত প্রায় তিনটার দিকে তাঁর সেলের দরজা আবার খুলে গেল। ঘুম থেকে জাগিয়ে মানিক ভাইয়ের হাতে দেওয়া হল তার সারা জীবনের স্বপ্ন ও সাধনার ফল ইত্তেফাকের বাজেয়াপ্তকরণের সরকারি আদেশ। এবারও মানিক ভাইয়ের মুখে এতটুকু চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হল না। হাসিমুখে কাগজে সই করে বাতি নিভিয়ে আবার শুয়ে পড়লেন। যারা চাকুরীর দায়ে বাধ্য হয়ে রাত্রির শেষ প্রহরে কাগজ সই করানোর দুঃখজনক কাজটি করতে এসেছিলেন তারা অবাক হয়ে গেলেন। কলমের এক খাঁচায় যার সারা জীবনের পরিশ্রম ও সাধনার ফল লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পদ ইত্তেফাক প্রতিষ্ঠান বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল তার এতটুকু ভাবান্তর নেই। তারা অবাক হয়ে মানিক ভাইয়ের অন্ধকার ঘরটির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

এমনি মানুষ মানিক ভাই। এতবড় কাণ্ড হয়ে গেল সকালে উঠেও আমরা কেউ জানতে পারলাম না। অনেক পরে প্রায় কথা প্রসংগেই মানিক ভাই আমাদেরকে এই দুঃখের খবর দিলেন। পরক্ষণে নিজেই হেসে বললেন,

www.pathagar.com

আমি জানতাম এমনি একটা কিছু ওরা করবে। আমি হীরু, মঞ্জু এবং ওদের মাকে বলে এসেছি আমার সব চলে গেলেও আমি অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করব না। একদিন আমার কিছুই ছিল না। যে দিন পৃথিবী থেকে চলে যাব সেদিনও কিছুই সঙ্গে যাবে না। মাঝের এ কয়টা দিনের জন্য আপোষ করে নিজেকে অমর্যাদার মধ্যে টেনে নামাব না।

মানিক ভাইয়ের কথা শুনে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা নত হয়ে গেল।

কারাজীবনে অভ্যস্ত মানিক ভাই শারীরিক অসুস্থ না হলে অত্যন্ত প্রাণবন্ত থাকেন। সকালে সম্মুখের রাস্তায় কিছুক্ষণ দ্রুতপায়ে হেঁটে বেড়ান ছাড়া বিশেষ ঘোরাঘুরি করেন না। অধিকাংশ সময়ই দেশ-বিদেশের খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন পাঠ করেন। মাঝে মাঝে ইংরেজি সাহিত্যের উপর কিছু পড়াশুনাও করেন। বিকালে আমাদের নিয়ে নানা আলোচনায় মেতে উঠেন। অখণ্ডনীয় যুক্তি ও সরল বিশ্লেষণে এক একটি দুর্বোধ্য বিষয়কে মানিক ভাই আমাদের সামনে তুলে ধরেন। তার জ্ঞানের পরিধি দেখে আমরা অবাক হয়ে যাই। খবরের কাগজ হাতে এলেই মানিক ভাই সম্পূর্ণ অন্য মানুষ, তন্ময় হয়ে যান কাগজের বিষয়বস্তুতে। সঙ্গে সঙ্গে অন্যদের ডেকে নিজের মতামত ব্যক্ত না করে থাকতে পারেন না। মাঝে মাঝে পড়তে পড়তেই চটে ওঠেন – রুদ্ধ আক্রোশে পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় ফুসতে থাকেন। তার সে মূর্তি না দেখলে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। রেগে গেলে 'বরিশাইল্যা খামারও' মানিক ভাই মাঝে মাঝে ছেড়ে থাকেন। আমরা তখন একটু দূরে দূরেই থাকি। পরক্ষণেই শিশুর সারল্য নিয়ে মানিক ভাই আমাদের মাঝে জাঁকিয়ে বসেন।

মানিক ভাই নিজে তাস খেলেন না। কিন্তু মাঝে মাঝে ব্রীজের আসরে দর্শকের গ্যালারিতে আসন গ্রহণ করেন। কেউ একচেটিয়া ভাল তাস পেলে মানিক ভাই ফোড়ন কাটেন, গরুর মত তাস পাচ্ছে। খেলার সময় আসন্ন শর্ট এড়াবার চিন্তায় কেউ দেরী করলে মানিক ভাই পরামর্শ দেন, তাস নিয়ে দৌড় দিন। সারা আসর অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে। এ রকম সব অদ্ভুত সুন্দর কথার একজন দক্ষ শিল্পী মানিক ভাই।

সেবার টাঙ্গাইল ছাত্রলীগ একটি অভিভাবক সম্মেলন আহ্বান করেছে। মরহুম বিচারপতি ইব্রাহিম সাহেব, কবি বেগম সুফিয়া কামাল, মানিক ভাই এবং আমাকে ওরা সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছে। অসুস্থতার

www.pathagar.com

জন্য বিচারপতি সম্মেলনে যোগ দিতে পারলেন না। মানিক ভাই, বেগম সুফিয়া কামাল ও আমি রওয়ানা হয়েছি টাঙ্গাইলের উদ্দেশে মানিক ভাইয়ের ছেলে মঞ্জুর গাড়িতে। মঞ্জুই চালক, রাস্তায় হঠাৎ এক জায়গায় মঞ্জু গাড়ি ব্রেক করল। ঝাঁকুনি খেয়ে সামনে তাকিয়ে দেখি একটা বেশ বড় গরু রাস্তার মাঝখানে শুয়ে একমনে জাবর কাটছে। মঞ্জু ঘন ঘন হর্ন বাজাচ্ছে ওকে হটিয়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু কিছুতেই সে উঠছে না। এক মিনিট দেখে মানিক ভাই মন্তব্য করলেন, ওটা একে জন্তু তার উপর গরু, সহজে রাস্তা দেবে না মঞ্জু। আরো জোরে হর্ন বাজাও।

আমরা হেসে উঠলাম। বেগম সাহেবা বলে উঠলেন, মানিক ভাই, গরুটা না এলে এত সুন্দর কথাটা শুনতে পেতাম না।

হর্নের আওয়াজে উত্যক্ত হয়ে নিতান্ত অনিচ্ছায় বিরক্তির সাথেই শেষ পর্যন্ত গরুদেব সেদিন আমাদেরকে রাস্তা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

মানিক ভাইয়ের রুমমেট হয়েছেন রফিক ভাই। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পীরজাদা আবদুল খয়ের রফিকুল হোসেন। প্রাক্তন এম. পি. এ. রফিক ভাই তার স্বভাবসুলভ হুল ফুটানো বক্তৃতার জন্য সুপরিচিত। বিদ্রুপাত্মক বক্তৃতার মাঝে ছোট ছোট গল্পের রসে রফিক ভাই সহজেই সভার শ্রোতাদের মাতিয়ে তুলতে পারেন। গ্রামের শ্রোতারা তার বক্তৃতা বেশি পছন্দ করে। ব্যক্তিগতভাবেও রফিক ভাই অত্যন্ত আমুদে হাসি-খুশি আর চঞ্চল প্রকৃতির মানুষ। নিজের বয়সের সীমারেখাকে ডিংগিয়ে সহজেই সকলের সাথে মিশবার অপরিসীম দক্ষতা রাখেন তিনি। তাকে ছাড়া আমাদের গল্প গানের আসর জমতেই পারে না। কত যে বিচিত্র গল্প জমা হয়ে রয়েছে রফিক ভাইয়ের ভাণ্ডারে তা তিনিই জানেন। প্রায় প্রতিদিন নতুন গল্প বা হাসির কথা শুনাচ্ছেন। গল্প বলতে বলতে নিজেই হেসে ওঠেন। হাসিটাও তার সংক্রামক। রফিক ভাইকে হাসতে দেখলে আমরাও না হেসে পারি না। ছোট ছেলেদের মত এখনো রফিক ভাই ভেংচি কাটেন, দেখে আমরা অট্টহাস্যে ফেটে পড়ি। নিজে দক্ষ বক্তা হয়েও রফিক ভাইকে মানিক ভাইয়ের সামনে শ্রোতার ভূমিকাই নিতে হয়। দিনমান তবুও আমরা রয়েছি, রাতের জন্য রফিক ভাই একমাত্র ভাগ্যবান শ্রোতা। ডাক্তারদের মত খারাপ রোগী বা

www.pathagar.com

উকিলের মত অনাকাঙ্ক্ষিত মক্কেল যেমন হয় না তেমনি বক্তারাও প্রায়ই ধৈর্যশীল শ্রোতা হতে পারেন না। আমাদের ধারণা দু'এক সময় রফিক ভাইয়ের এমনি অনুভূতি এসে থাকে।

মজলিসী মানুষ রফিক ভাইকেও সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথে নিজেদের ছোট খুপরির মধ্যে গিয়ে ঢুকতে হয়। জেলজীবনে অনভ্যস্ত রফিক ভাই সহজে ওর মধ্যে ঢুকতে চান না। একথা সেকথা বলে, মিয়সাব জমাদারদের সাথে বাত-চিৎ করে যতটুকু সময় বেশি আদায় করতে পারেন ততক্ষণই বাইরে থাকতে চান।

জেলখানার সবচাইতে কষ্টকর অধ্যায় হল সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথে লকআপে ঢোকা। বাইরে যখন চাঁদের স্নিগ্ধ আলোতে চারিদিক উদ্ভাসিত হয়ে যায়, মৃদু মন্দ সমীরণে জেলখানার পরিবেশও যখন মনোরম হয়ে ওঠে তখনই ঠিক আমাদেরকে ঢুকতে হয় বদ্ধ ঘরের গুমোট আবহাওয়ায়। মানিক ভাইর এজন্য হাহুতাশ নেই। লকআপ জমাদারের উপস্থিতির সাথে সাথে তিনি ঘরে ঢুকে পড়বেন। বিলম্বে জমাদার মিয়াসাবরা কষ্ট পাবে এটা তিনি আদৌ পছন্দ করেন না। নিজে তাড়াতাড়ি লকআপে ঢুকে পড়েন। আমাদেরকেও ঢোকার জন্য তাগিদ দেন। দূরে এসে মানিক ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে আমরা গজ গজ করি, বিলম্ব করার চেষ্টা করি। এ ব্যাপারে রফিক ভাই বেশি ফন্দিফিকির বার করার মতলবে থাকেন। এত করেও বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে পারেন না। মানিক ভাইয়ের সঙ্গে একই কক্ষে তাকে থাকতে হয়। এক নম্বর রুম বলে তাদেরটাই প্রথম লকআপ হয়। বেশি দেরি দেখলে আমরাও অনুরোধ করি, রফিক ভাই এবার যান।

সেদিন এ অনুরোধ করতেই রফিক ভাই বলে উঠলেন, রোজই ফুলি যা, ফুলি যা, আইজ যাইব বড় জেঠী।

আমরা গল্পের গন্ধ পেয়ে রফিক ভাইকে ছেঁকে ধরলাম। বললাম, তাড়াতাড়ি গল্পটি শুনিয়ে দিয়ে লক্ষ্মী ছেলের মত লকআপে চলে যান। রফিক ভাই গল্পটি বললেন, একটি অল্প বয়স্ক গ্রাম্য বালিকার মাত্র বিয়ে হয়েছে। নাম তার ফুলি। বালিকার যৌবন জোয়ার তখনও দেহে এসে আঘাত করেনি, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, তাদের মিলন এসব ব্যাপার তখনও তার বোধগম্য নয়। এখনো স্বামীর প্রশস্ত বক্ষের চাইতে মায়ের উষ্ণ বক্ষে গুটি মেরে শুয়ে থাকতেই সে বেশি ভালবাসে। কিন্তু স্বামীটি তার নব যৌবনের অধিকারী।

www.pathagar.com

সদ্য বিবাহিত যুবকের স্বপ্নমেদুর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে এসেছে। কিন্তু সন্ধ্যা হলেই বালিকা বধূ পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। স্বামীর কাছে ফুলি যেতে চায় না – রোজ একটি অপরিচিত পুরুষের বাহুপাশে বন্দী হয়ে বিনিদ্র রজনী প্রভাত করতে ফুলির ভাল লাগে না। এর কোন অর্থ ফুলি খুঁজে পায় না। স্বামী সন্নিধানে পাঠাতে তাই ফুলিকে রোজই সাধ্য-সাধনা করতে হয়।

সেদিন ফুলিকে অনুরোধ করতেই সে চিৎকার করে বলে উঠল, রোজই ফুলি যা, ফুলি যা, আইজ যাইব বড় জেঠী।

রফিক ভাইর গল্প বলা এবং হাত-মুখ নেড়ে রসিয়ে পরিবেশন করার মধ্যে একটা আর্ট আছে। আমরা সবাই হেসে উঠলাম। রফিক ভাই ফুলির কথার প্রতিধ্বনি করে বলে উঠলেন, রোজই রফিক ভাই যান, রফিক ভাই যান, আইজ যাইব জালাল মোল্লা।

আমরা সবাই জানি মোল্লা সাহেব আর রফিক ভাইয়ের পেয়ার যত বেশি রেষারেষিও তত বেশি।

রোজই ব্রীজ খেলার আসর বসে মিজান ভাইয়ের ঘরে। চাঁদপুর থেকে নির্বাচিত মিজানুর রহমান চৌধুরী আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক। নিজ এলাকায় জনপ্রিয়তার উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত তিনি। মৌলিক গণতন্ত্রের সময়ও মিজান ভাই পর পর দু'বার বিপুল সংখ্যাধিক্যে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

মিজান ভাই স্বীয় যোগ্যতায় পাকিস্তানের রাজনৈতিক মঞ্চে একটি বিশিষ্ট আসন দখল করেছেন। একজন দক্ষ পার্লামেন্টারীয়ান হিসেবে পরিষদের বাইরে এবং ভেতরে তিনি সুপরিচিত। প্রশ্ন-উত্তরের ঘণ্টায় তীক্ষ্ণধী মিজান ভাইয়ের প্রশ্নবানে জর্জরিত মন্ত্রী ও পার্লামেন্টারি সেক্রেটারিদের কাছে তিনি একটি বিভীষিকা। তার বক্তৃতায় ফ্যাক্টস এবং স্ট্যাটিসটিকসকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। জনসভায় মিজান ভাই একজন সুদক্ষ বক্তা। তার একটি নিজস্ব স্টাইল আছে। ধীরে ধীরে ঘটনাপঞ্জি ও সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে হাস্যরসের মাধ্যমে সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলীকে তিনি সহজেই আয়ত্ত করে ফেলেন।

www.pathagar.com

তার বক্তৃতাকালীন গল্প ও উপমাগুলো শ্রোতাদেরকে আনন্দে অভিভূত করে ফেলে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি বক্তৃতা করে যাবেন। না ক্লান্ত হবেন তিনি নিজে, না ক্লান্তি আসবে তার মুগ্ধ শ্রোতাদের।

ব্যক্তিগতভাবে মিজান ভাইয়ের সাথে আমার অত্যন্ত হৃদ্যতার সম্পর্ক। তিনি আমায় ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করেন। আওয়ামী লীগের কাজে যখন বিভিন্ন জেলায় ট্যুরে বেড়িয়েছি মুজিব ভাইয়ের সঙ্গী হয়ে, প্রায়ই মিজান ভাইকেও সাথে পেয়েছি। এক সাথে থেকেছি, খেয়েছি, এক বিছানায় অনেক রাত কাটিয়েছি। অন্যরা আমাদের বলতেন মানিক-জোড়। আত্মীয়-পরিজনবিহীন কারান্তরালে আমাদের সে সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়েছে।

গল্প রসিকতায় মিজান ভাইয়ের তুলনা নেই। তাকে গল্পের ঝুড়ি বললেও অত্যুক্তি হয় না। মিজান ভাইয়ের আর একটা বড় গুণ, অনায়াসে তিনি যে কোন স্থানের আঞ্চলিক ভাষা হুবহু আয়ত্ত্ব করতে পারেন। যে কোন লোকের ভাষা এবং কণ্ঠ নকল করার ক্ষমতা তার রয়েছে। আমাদের আসরে প্রায়ই তিনি নোয়াখালী, সিলেট এবং চট্টগ্রামের চলতি ভাষায় বক্তৃতা করে হাসির ফোয়ারা তোলেন।

খরচপত্র বড্ড বেশি করেন মিজান ভাই। জেলখানার মধ্যেও আমিরী চাল পূর্ণমাত্রায় চালিয়ে যাচ্ছেন। জমাদার, মিয়াসাব, ডেপুটি, ডাক্তার থেকে শুরু করে কয়েদী মেট পাহারা, নাইট গার্ড যে কেউ আসুক না কেন তাকে কিছু না খাওয়ালে তার স্বস্তি নেই। অন্যদের যেমন খাওয়ান তেমনি নিজেও প্রচুর খান। সেদিন কাগজে দেখলাম চাঁদপুরে এক ভোজন বিলাসীর আবির্ভাব হয়েছে – সে দিনে আঠার বার পূর্ণ আহার করে। সবাই খবরটি পড়ে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। আমি সবাইকে আশ্বস্ত করে বললাম, ব্যাপারটি যে সম্ভব তা কি আপনারা চাঁদপুরের প্রতিনিধি মিজান ভাইকে দেখেও হৃদয়ঙ্গম করতে পারছেন না? সবাই তখন এক বাক্যে স্বীকার করলেন, এটা সম্ভব এবং চাঁদপুরেই সম্ভব।

সেবার আমরা সিলেট গিয়েছি জনসভায় বক্তৃতা করতে। মুজিব ভাই, মিজান ভাই, আবদুল মোন্তাকিম চৌধুরী এবং আমি রয়েছি সেই দলে। অপরাহ্নে সিলেট কোর্ট প্রাঙ্গণে জনসভায় তিল ধারণের স্থান নেই। যে গল্পটি বলে মিজান ভাই সেদিন শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করে দিয়েছিলেন সেটি এক রাজা ও গোয়ালাকে কেন্দ্র করে।

www.pathagar.com

রাজা প্রতিদিন দুধ খেতেন। তার নিত্যকার দুধের জোগান দিত এক গোয়ালা। একদিন দুধ খেতে বসে রাজা দেখলেন দুধ খাঁটি নয়, জল মিশানো হয়েছে দুধে। রাজ-রক্ত গরম হয়ে উঠল। তক্ষুণি মন্ত্রীকে তলব করলেন। মন্ত্রী, আমার দুধে জল কেন?

কম্পিতবক্ষ মন্ত্রীপ্রবর নিবেদন করলেন, হুজুর, আমি ত দিন-রাত্রি হুজুরের পদপ্রান্তে বসে হুজুরেরই আদেশে রাজকার্য পরিচালনা করি। আমি কি করে বলব দুধে জল আসে কি করে।

রাজা দেখলেন মন্ত্রী ঠিকই বলেছেন। মন্ত্রীকে আদেশ করলেন দুধে জল মিশানো বন্ধ করার উপায় উদ্ভাবন করতে। ভেবে-চিন্তে মন্ত্রী বললেন, দুধে জল পরীক্ষার জন্য একজন ইনস্‌পেকটার নিযুক্ত করা হোক। রাজা বললেন, তথাস্ত।

ইনস্‌পেক্‌টর নিয়োগ করা হল। নতুন চাকুরীপ্রাপ্ত ইনস্‌পেকটর যোগ্যতা দেখানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। গোয়ালাকে চেপে ধরল, ঘোষের পো দুধে জল দাও কেন? তোমাকে শুলে চড়াব।

গোয়ালা বিনয়াবনত কণ্ঠে বলল, হুজুর আমি কি করবো। রাজার বাড়ির দুধ থেকে গোপনে মন্ত্রীকে দু'সের দিতে হয়। জল না মিশালে আমার চলবে কি করে।

নূতন কর্তব্যজ্ঞানে টনটনিয়ে ওঠা ইনস্‌পেক্টর বলল, ওসব চলবে না। তুমি মন্ত্রীকে দুধও দিতে পারবে না, রাজার দুধেও জল মিশাতে পারবে না। তখন ধূর্ত গোয়ালা বলল, হুজুর মন্ত্রীকে যদি দুধ না দিই, আর রাজার দুধেও যদি জল না মিশাই তা হলে আপনারও প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে – চাকুরীটি নট্ হয়ে যাবে।

ইনস্‌পেকটর সাহেব চুপসে গেলেন। ভেবে দেখলেন, গোয়ালা ঠিকই বলেছে। কিছুক্ষণ ভেবে তখন বললেন, বেশ, তাহলে আমাকেও দু'সের দিও। মুচকি হেসে ঘাড় নেড়ে গোয়ালা চলে গেল।

পরদিন দুধ খেতে বসে রাজা অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। আজও দুধে জল - পরিমাণেও বেশি। রাজা হুঙ্কার ছাড়লেন, মন্ত্রী।

মন্ত্রী দৌড়ে এসে হাত জোড় করে বললেন, হুজুর।

www.pathagar.com

আজ দুধে জল কেন?

হুজুর আমি তা কি করে বলব? একটু অপেক্ষা করুন হুজুর, আমি ইনস্‌পেকটরকে খবর পাঠাচ্ছি।

খবর পেয়ে ইনস্‌পেকটর হন্ত দন্ত হয়ে ছুটে এল।

দুধে জল কেন?

ইনস্‌পেক্‌টর বলল, হুজুর আমি ত রাজবাড়ির দেউড়িতে বসে পাহারা দেই। গোয়ালা যদি রাস্তায় জল মিশায় তা হলে আমি কি করে ঠেকাবো?

রাজা দেখলেন, ঠিক বলেছেন ইনস্‌পেক্‌টর। মন্ত্রীকে বললেন, মন্ত্রী উপায় বের কর।

মন্ত্রী আর ইনস্‌পেক্‌টর পরামর্শ করে রাজাকে বললেন, হুজুর একজন রোড ইনস্‌পেক্‌টর নিয়োগ করা হোক।

রাজা সম্মতি দিলেন।

রোড ইনস্‌পেক্‌টর গিয়ে গোয়ালাকে চেপে ধরল, ঘোষের পো দুধে জল মিশালে শূলে দেব।

ইনস্‌পেক্‌টরকে ঘোষের পো যেভাবে পথে এনেছিল রোড ইনস্‌পেক্‌টরও সেইভাবে পথে নিয়ে এল। রোড ইনস্‌পেক্‌টরও নিজের জন্য দু'সের দুধের বন্দোবস্ত করে হৃষ্টচিত্তে ফিরে এল।

পরদিন রাজার দুধে আরও বেশি জল পাওয়া গেল। রাজা ডাকলেন মন্ত্রীকে। মন্ত্রী ডাকলেন ইনস্‌পেক্‌টরকে, ইনস্‌পেক্‌টর তলব করলেন রোড ইনস্‌পেক্‌টরকে। কাঁপতে কাঁপতে রোড ইনস্‌পেক্‌টর রাজার সামনে এসে দাঁড়ালেন, – সবিনয়ে নিবেদন করলেন, হুজুর আমি রাস্তায় রাস্তায় পাহারা দেই যাতে গোয়ালা দুধে জল না মিশাতে পারে, কিন্তু গোয়ালা যদি গোয়ালঘরে বসে জল দেয় তা হলে আমি দেখব কি করে? হুজুর, একজন গোয়ালঘর ইনস্‌পেক্‌টর নিযুক্ত করা হোক।

গোয়ালঘর ইনস্‌পেক্‌টর নিযুক্ত হয়ে গেল। সেও তার পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজের জন্য দু'সের দুধের ব্যবস্থা করে নিল। পরদিন দুধ খাওয়ার সময় রাজা দেখলেন, তার দুধের গ্লাসে একটা চিংড়ি মাছ। দুধ জাল দেওয়ার ফলে মাছটি লাল হয়ে বেঁকে রয়েছে। রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। আজ আর মন্ত্রী, ইনস্‌পেক্‌টর, রোড ইনস্‌পেক্‌টর বা গোয়ালঘর

www.pathagar.com

ইনস্‌পেক্‌টরকে ডাকলেন না। নিজেই হুকুম করলেন গোয়ালাকে ধরে আনার জন্য।

গোয়ালাকে ধরে আনা হল। দুচোখে অগ্নিবর্ষণ করে রাজা গোয়ালাকে জিজ্ঞেস করলেন, বল্ বেটা আমার দুধে চিংড়ি মাছ এল কি করে? সদুত্তর দিতে না পারলে এই মুহূর্তে তোকে শূলে দেব।

গোয়ালা দেখল আজ মৃত্যু সুনিশ্চিত। হাত জোড় করে বলল, হুজুর আপনি যেই হারে কর্মচারী নিয়োগ করে চলেছেন তাতে চিংড়ি মাছ ত ভাল কথা কয়েকদিন পর দুধের মধ্যে রুই-কাতলাও পাবেন। পূর্বে দুধে অল্প জল মিশাতাম। এখন আমাকে বালতি বালতি জল মিশাতে হচ্ছে। দু'একটা চিংড়ি মাছ ত থাকবেই হুজুর।

রাজার চক্ষুস্থির। তখন গোয়ালা ভয়ে ভয়ে দুধে জল আসার আদ্যোপান্ত কাহিনী রাজাকে বলে তার গর্দানটি বাঁচাতে সক্ষম হল।

গল্প শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মাঠ হাসির গমকে উত্তাল হয়ে উঠল। অদূরদর্শী সরকারের সামনে যতই নূতন বিভাগ খোলা হচ্ছে, ততই নূতন কর্মকর্তা নিযুক্ত হচ্ছে – দেশের মধ্যে দুর্নীতি আর ঘুষ ততই বেড়ে যাচ্ছে – এ কথাটি গল্পের মাধ্যমে প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দিয়ে শ্রোতৃমণ্ডলীর সপ্রশংস উল্লাসধ্বনির মধ্যে মিজান ভাই সেদিন আসন গ্রহণ করেছিলেন।

তাস খেলার কথা বলতে গিয়েই মিজান ভাই সামনে এসে দাঁড়ালেন। দিনের অধিকাংশ সময়ই মিজান ভাই তাস নিয়ে মেতে আছেন। তার ঘরে ব্রীজ খেলার আসর জমে। ওবায়েদ, হাকিম সাহেব, মোল্লা জালাল, রফিক ভাই, বজলুর রহমান, মহিউদ্দীন, মমিন সাহেব – এরা সব ব্রীজ কমিটির মেম্বার। আমরা কয়েকজন সে রসে বঞ্চিত। আমাদের আছে ব্রে কমিটি। যার সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট এবং ট্রেজারার হল সুলতান। আমি, হক সাহেব, আমাদের কমন নানা হাফেজ মুসা, সিরাজ, রাসেদ এবং শাহাবুদ্দীন চৌধুরী এই আসরের সদস্য।

আমাদের ব্রে খেলার আসরটি নানাকে কেন্দ্র করে জমে উঠেছে। ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি হাফেজ মুসাকে কোন স্মরণীয় মুহূর্তে মুজিব ভাই নানা বলে ডেকেছিলেন – সেই দিন থেকেই তিনি সকলের নানা। পঁয়ষট্টি

www.pathagar.com

বৎসরের বৃদ্ধ ঢাকার আদিবাসী একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আমাদের নানা। বৃদ্ধ বয়সেও রসে টৈটম্বুর। অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা সদা-হাস্যময় এ মানুষটিকে নিয়ে আমরা সব সময় মেতে থাকি। সবাই সুযোগ পেলেই নানাকে উত্যক্ত করবে। নানাও সবসময় সচেষ্ট থাকেন কাকে কিভাবে জব্দ করা যায়। খেলতে বসলেই নানা ব্রে হয়ে যাচ্ছেন আর চটে আগুন। নানা বসলেই বাকী তিনজনের মধ্যে চোখের আকার ইঙ্গিতে একটা নীরব প্যাক্ট হয়ে যায়। নানাকে ঘায়েল করতে হবে। যৌথ আক্রমণে বিধ্বস্ত নানা ক্ষেপে ওঠেন, তার স্ত্রীর সাথে আমাদের ভ্রাতৃ সম্পর্ক আবিষ্কার করে গাল দিয়ে ওঠেন। নানা ব্রে হওয়ার সাথে সাথে আমরা থালা-বাটি নিয়ে বাজাতে থাকি, তাকে ঘিরে হৈ চৈ করে নৃত্য শুরু করে দিই। বেচারী নানা কিছুক্ষণ গালাগালি করেই আবার চ্যালেঞ্জ করেন, এসো এবার তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। আমাদের আসরের হৈ চৈ শুনলেই সবাই বুঝতে পারে নানাকে ব্রে বানানো হয়েছে। সবাই একে একে এসে নানাকে কুশল প্রশ্ন করে – নানা তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন। কোন দিন নানা হ্যাটট্রিক করে ফেলেন। সেদিন নানাকে জোর করে উঠিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে সমগ্র দশ সেল ঘোরা হয় এবং বিভিন্ন রুমে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়, এর সাথে পরিচিত হোন, ইনি আলহাজ্ব হাফেজ মোহাম্মদ মুসা, অদ্য একাদিক্রমে তিন বার ব্রে হয়ে একবিংশতম হ্যাটট্রিকের গৌরব অর্জন করেছেন। নানাও কম যান না। মাথাটি নুইয়ে ডান হাত দিয়ে সকলকে লক্ষ্ণৌয়ী কায়দায় অভিবাদন জানান।

জেলের মধ্যে মোস্তফা সরওয়ার একজন আনন্দদায়ক সঙ্গী। কবিতা আবৃত্তি করে শোনাবেন, স্বরচিত প্রবন্ধ, ছোট গল্প পরিবেশন করবেন সাহিত্য আসরে। আমাদের ফ্রি-স্টাইল বিচিত্রানুষ্ঠানে তাঁর একাধিক নৃত্য থাকবেই।

মোস্তফা সরওয়ার শুধু যে সাহিত্য চর্চা করেন তাই নয় – তিনি একজন ভাল নৃত্যশিল্পীও। এক সময় তিনি ছাত্রলীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক ছিলেন। তাঁর বাবা আলহাজ ওসমান গনি সাহেব বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ নিয়েছেন – অত্যাচার-নিপীড়ন সহ্য করেছেন। তাকে কারাগারেও নিক্ষেপ করা হয়েছিল লীগ সরকারের আমলে। মোস্তফা সরওয়ারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শামসুজ্জোহা সাহেবও সংগ্রামী কর্মী। তাঁকেও কয়েক দফা কারাবাস করতে হয়েছে। মোস্তফা সরওয়ার ছাত্রজীবন থেকেই সংগ্রামের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ওঠেন।

www.pathagar.com

তরুণ যুবক মোস্তফা সরওয়ার প্রচুর ঐশ্বর্যের মালিক হয়েও সংগ্রামের পথ থেকে বিচ্যুত হননি। আজও নিপীড়িত মানুষের মুক্তির সংগ্রামে তিনি প্রথম কাতারে এসে দাঁড়ান। তাই সরকার তাঁকে নিক্ষেপ করে কারাগারে। ধ্বংস করে দিতে চায় তাঁর অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা।

এমনিতে সরওয়ার ভাই ভালই থাকেন, কিন্তু তার মন ভারাক্রান্ত হয়ে যায় যখন উর্দু রোডের একটি ত্রিতল বাড়ির ছাদে উঠে তাঁর মিসেস ছলছল চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন। মিসেসও কম নন। ঐ বাড়ির লোকদের সাথে পরিচয় করে স্বামীকে প্রায়ই দেখে যাচ্ছেন। মাঝে মাঝে দূর থেকে সরওয়ার ভাইকে ভেঙচি কাটেন, কিল দেখান। স্বামীকে চাঙা রাখার জন্যই যে ভাবী এসব করেন আমরা তা বিলক্ষণ বুঝতে পারি। মাঝে মাঝে ভাবীকে আমরাও হাত ইশারায় ডাকি, আপনিও আসুন। ভাবীও দুহাতে আপত্তি দেখিয়ে বুঝিয়ে দেন, না, না, আপনারাই থাকুন। ভাবীও বাড়ির ছাদে আসলেই আমরা খুশি হয়ে উঠি। নিশ্চয়ই আমাদের জন্য গেটে কবাব-পরোটা জমা দিয়ে এসেছেন। আমাদের জন্য এটা ভাবীর প্রতিবারের বরাদ্দ।

সেদিন ভাবী আসায় মোস্তফা ভাইয়ের মন খারাপ হয়ে গেল। দূর থেকে প্রিয়াকে দেখে আর ভাল লাগছে না। তাকে নিবিড় করে পাওয়ার জন্য বুঝি প্রাণ কেঁদে উঠেছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন সামনের দরজাটি আঁকড়ে ধরে।

এগিয়ে এলেন নানা, এক মিনিট ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেন। তারপরই ভাবীকে দেখিয়ে শুরু করলেন নৃত্য। পঁয়ষট্টি বৎসরের বৃদ্ধ উদ্দাম হয়ে উঠলেন নৃত্যের মাঝে। থালা-বাটির যন্ত্র-সঙ্গীতও আমরা তখন শুরু করে দিয়েছি। শামসুল হক সাহেব সরওয়ার ভাইকে টেনে নামালেন আসরে। নানা চ্যালেঞ্জ করলেন, এসো দেখি নাচে কে কাকে হারাতে পারে। শুরু হল দু'জনের টুইস্ট নাচ। চেয়ে দেখি ভাবি মুখে আঁচল গুঁজে দিয়েছেন। যন্ত্র সঙ্গীত আর আমাদের চীৎকারে নরক গুলজার। কিছুক্ষণ নেচে সরওয়ার ভাই হাল ছেড়ে দিলেন। নানা তখনও বিজয়ীর মত নেচে চলেছেন। সরওয়ার ভাই হেরে গেলেন।

নানা থামতেই আমরা জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলাম, নানা সাহেব জিন্দাবাদ।

এক ফাঁকে আমি আওয়াজ তুলতাম, দিদিমণি! আর সকলে সমস্বরে চিৎকার করে উঠল, জিন্দাবাদ। নানা আমাকে তেড়ে মারতে এলেন।

www.pathagar.com

সদ্য দেওয়া বিসদৃশ এই নামটি নানা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেন না। আমি দৌড়ে আত্মরক্ষা করলাম।

ছোট ছেলেদের মত দুলে দুলে সবুজ সাথীর কবিতা মুখস্ত করছে ধলু। ফালতুরা কিছুদিন থেকে আমাদের সাথেই থাকে। লেখাপড়া কিছুই জানত না ধলু। তাই ওকে বই, স্লেট, পেন্সিল কিনে দিয়েছি। চেষ্টা করছি আমাদের সাহচর্যে থেকে যদি কিছু শিখে নিতে পারে। অবসর মত ওকে নিয়ে মাস্টারির একস্‌পেরিমেন্ট করছি। কিছু কিছু এরই মধ্যে শিখে ফেলেছে ধলু।

ছিপছিপে একহারা গড়নের মধ্যে একটা মিষ্টি চাপ রয়েছে ধলুর চেহারায়। কালোর মধ্যেও মানুষ সুদর্শন হয় তার প্রকৃষ্ট নজির ধলু। বিনয়ী ও শান্ত প্রকৃতির ছেলেটিকে দেখলে বুঝাই যাবে না ও একজন খুনী। নিজের পিতৃব্যকে ও দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে। সেই সঙ্গে আরও চারটি হাফ্ মার্ডার। আশ্চর্য হয়ে ভাবি ওর মত নিরীহ সুবোধ ছেলে কি করে এমনি বীভৎস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করলো। এমন এক একটি মুহূর্ত মানুষের জীবনে আসে যখন সে অচিন্ত্যনীয় কল্পনাতীত কাজ করে ফেলতে পারে।

ধলু যে হত্যা করেছে তাকে একদিক দিয়ে বিচার করলে অনেকটা রাজনৈতিক হত্যাকান্ড বলা যায়। নিহত ব্যক্তি ওর আপন পিতৃব্য। বেশ কয়েক বছর ধরেই আকবর খা ইউনিয়ন কাউন্সিলের একজন মেম্বার। লোকটা অসাধু এবং দুষ্ট প্রকৃতির। গাঁয়ের মধ্যে লোকে তাকে যত না ভক্তি করে তার চাইতে বেশি করে ভয়। এবার যখন নতুন নির্বাচন ঘনিয়ে এল গ্রামের লোকেরা ধলুর বড় ভাই ম্যাট্রিক পাস আবদুল মজিদকে গিয়ে পাকড়াও করল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য। মজিদ ওদের বংশের একমাত্র শিক্ষিত ছেলে। স্বভাব-চরিত্র ভাল। গাঁয়ের মধ্যে সুনাম আছে। আশা করা যায় নির্বাচনে সে জয়লাভ করবে।

মজিদ সোজা পিতৃব্য আকবর খাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, চাচাজান অনেকদিন আপনি মেম্বরি করেছেন। এবার আমি দাঁড়াই। আমি আপনার ছেলের মত। আমাকে ছেড়ে দিলে লোকে আপনাকে প্রশংসাই করবে আর মেম্বরিও আমাদের বাড়িতেই থাকবে।

প্রস্তাব শুনে আকবর তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ করল না। গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিল, দাঁড়াতে চাও দাঁড়াও – আমি বাধা দেব না, তবে আমাকে দাঁড়াতেই হবে।

www.pathagar.com

মজিদ বুঝিয়ে বলল, চাচাজান এবার আপনার না দাঁড়ানোই উচিত। দাঁড়িয়ে অসম্মান হওয়া আপনার পক্ষে ঠিক হবে না।

আকবর খাঁ চটে উঠল, বলল, আমাকে উপদেশ দেওয়ার ধৃষ্টতা নাইবা দেখালে – যদি পার ত আমাকে হারাবার চেষ্টা করগে।

মজিদ বেরিয়ে এল অপমানিত হয়ে। চাচার চ্যালেঞ্জ সে দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করল। নির্বাচনে উভয়েই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামল। ধলুরা পিঠাপিঠি পাঁচ ভাই। তুমুল উৎসাহ নিয়ে গাঁয়ের তরুণদের সংঘবদ্ধ করে ওরা ভোট যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সমগ্র দেশে তখন মাদারে মিল্লাতের দোহাই চলছে। প্রতিটি প্রার্থী ভোটারদের কাছে প্রতিজ্ঞা করছে, জয়লাভ করলে প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে ফাতেমা জিন্নাহকে ভোট দেবে। দেশের মধ্যে গণজাগরণ এসেছে। তার ঢেউ ধলুদের নিভৃত পল্লীতেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। গ্রামের সমস্ত ভোটাররা এক সভায় একত্রিত হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নিকট জানতে চাইল তারা জয়লাভ করলে কাকে ভোট দেবে। মজিদ তরুণ সমাজকর্মী, গণতন্ত্রের সমর্থক। জোর কণ্ঠে সে বলল, আমি জয়লাভ করি বা পরাজিত হই মাদারে মিল্লাতকেই আমি সমর্থন করব। মেম্বার হলে আমার ভোট মাদারে মিল্লাতই পাবেন – এ কথা আমি কোরান ছুঁয়ে বলতে পারি। জনতা উল্লসিত হয়ে উঠল। তারা মজিদকে বিশ্বাস করে।

আকবর খাঁ দেখল স্রোত মজিদের দিকে। তাড়াতাড়ি একখণ্ড কোরান এনে তার উপর হাত রেখে আকবর খাও প্রতিজ্ঞা করল, নির্বাচনে জিতলে সে মাদারে মিল্লাতকেই ভোট দেবে। দুজন প্রার্থীর কাছ থেকে একই শপথ আদায় করে জনতা হৃষ্টচিত্তে বাড়ি ফিরে গেল।

অনেকেই ভেবেছিল মজিদই জিতবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল তারা আকবর খাঁকে চেনেনি। সে যে কোথা থেকে কি করল, ব্যালটই চুরি করল, না জাল ভোটই তৈরি করল সেই জানে। গণনায় দেখা গেল সে সাত ভোট বেশি পেয়েছে। বিজয়গর্বী আকবর খাঁর সমর্থকরা মজিদকে সেখানেই আক্রমণ করতে উদ্যত হলে ভোটারদের মধ্যস্থতায় সেদিনের মত শান্তি রক্ষা হল। ধলু এবং ওর ভাইরা পরাজয়ের গ্লানি বহন করে ম্লানমুখে বাড়ি ফিরে এল।

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচন ঘনিয়ে এল। মজিদের নেতৃত্বে তরুণেরা আকবর খাঁকে তার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দিতে গেল।

সেদিনের আকবর খাঁ আর আজকের আকবর খাঁর মধ্যে কত তফাৎ। নির্লজ্জ আকবর তার প্রতিজ্ঞা ভুলে বলে বসল, আমি টাকা খরচ করে মেম্বার হয়েছি, যে আমাকে টাকা দেবে তাকেই আমি ভোট দেব। তোমাদের মাদারে মিল্লাত পারবে আমাকে টাকা দিতে? মজিদের দল স্তম্ভিত হয়ে গেল। ওদের তরুণ রক্ত উত্তেজিত হয়ে উঠল। মজিদ বলল, আপনি মাদারে মিল্লাতকে ভোট দিতে বাধ্য, তাঁর দোহাই দিয়ে জয়লাভ করেছেন। এখন যদি বেঈমানী করেন তবে আমরা বরদাস্ত করব না।

আকবর খাঁ তেড়ে উঠল, বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে। যা পারিস করিস – ভোট আমি আইয়ুব খানকে দেব।

মজিদরাও শাসিয়ে বলল, প্রয়োজন হলে তোমাকে আমরা খুন করব, তবুও বেঈমানী করতে দেব না।

আকবর খাঁ গোপনে দল ঠিক করল, মজিদকে চিরতরে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে। সেদিন পার্শ্ববর্তী গাঁয়ের হাট থেকে ফেরার পথে মজিদকে আক্রমণ করার জন্য আকবরের দল ওঁৎ পেতে রইল। মজিদ বেঁচে গেল আকবরেরই একটি স্কুলে পড়া ছেলের জন্য। সে বাবার সব পরিকল্পনা জানতে পেরে অন্য রাস্তা দিয়ে দৌড়ে গিয়ে মজিদকে সাবধান করে দিল। মজিদ আকবরের ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে ভিন্ন পথে বাড়ি এসে ঢুকল।

রাতে সব ভাইরা পরামর্শ করে আকবর খাঁর বাড়িতে গেল। আকবরকে ডেকে বলল, চাচা, খুন যখন করতেই চাও, লুকিয়ে অতর্কিতে তা না করে এসো কাল সকাল দশটায় সামনের মাঠে নেমে পড়ি। দেখি কে কাকে খুন করতে পারে।

ঘরের ভেতর থেকে আকবর খাঁও চেঁচিয়ে জবাব দিল, তাই হবে। কাল দশটায় মাঠে যাব।

পরদিন বেলা দশটায় উভয় পক্ষই ঢাল, সড়কী, জুতী, টেঁটা, লাঠি, রামদা ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সদলবলে ময়দানে অবতীর্ণ হল। ধলুদের দিকে লোক কম; কিন্তু দুজন দক্ষ গুলাইল ছাড়ার যুবক ছিল। গুলাইলের আক্রমণে আকবর খাঁর অধিকাংশ লোক ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

www.pathagar.com

একরোখা আকবর খাঁ তখন মরিয়া হয়ে একটা প্রকাণ্ড দা দিয়ে নিজেই মজিদকে আক্রমণ করে বসল। হাতে একটা রামদা নিয়ে এতক্ষণ ধলু চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ ওর প্রাণপ্রিয় বড় ভাইয়ের উপর দা উঠতেই ও দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে দৌড়ে গেল। এক ধাক্কায় মজিদকে দূরে ঠেলে দিয়ে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে রামদায়ের এক কোপ বসিয়ে দিল আকবরের পেটে। পেট দুফাঁক হয়ে নাড়িভুড়ি বেরিয়ে এল, ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। আকবর কাটা ছাগলের মত মাটিতে পড়ে গড়াতে লাগল। ধলুর মাথায় তখন খুন চেপ গেছে। পর পর আরও কয়েকটি কোপ দিয়ে আকবরকে অনন্তের পথে যাত্রা করিয়ে দিল ধলু। যারা এগিয়ে এসেছিল তাদের মধ্যেও চারজন মারাত্মকভাবে আহত হল। তার পর ধলু জ্ঞান হারিয়ে মাঠেই গড়িয়ে পড়ল। এতক্ষণ ওর ভাইরা ভয়ে ওর কাছে ঘেঁষতে পারেনি – এবার দৌড়ে এসে ওর অজ্ঞান দেহ বুকে তুলে নিয়ে বাড়ি চলে এল।

ঘটনাস্থলেই আকবর নিহত হল। পরদিন সারা দেশে প্রেসিডেন্টের নির্বাচন। অর্থলোভী আকবর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার সুযোগ পেল না, তার পূর্বেই তাকে ইহলীলা সাঙ্গ করে এ পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিতে হল। একজনকে হত্যা এবং আরও চারজনকে হত্যা করার ইচ্ছা নিয়ে মারাত্মক আঘাত করার দায়ে গ্রেফতার করা হল ধলু, মজিদ ও আরও দশজনকে। মাত্র চার মাস আগে ধলু বিয়ে করেছে। নববিবাহিতা তরুণী পত্নীর সাথে প্রেম কেবল ঘনিভূত হয়ে উঠেছে। জীবনের পরম আনন্দের দ্বার মাত্র ওর চোখে উদ্ভাসিত হয়েছে। সুধায় ভরা জীবনপাত্র কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। সেই মুহূর্তে ঘটে গেল এই হত্যাকাণ্ড। দিশেহারা হয়ে পড়ল ধলু। ওর স্ত্রী ঘন ঘন মূর্ছা যেতে লাগল। মাত্র কয়েক ঘন্টা বাড়িতে ছিল। পালায়নি, শান্তভাবেই পুলিশের হাতকড়া গ্রহণ করেছিল ধলু।

থানায় রওনা হওয়ার পূর্বে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য ধলু ওর স্ত্রীকে কাছে পেয়েছিল, স্ত্রীর অশ্রুমাখা মুখটি বক্ষে চেপে ধরে বলেছিল, রানী, আমার যদি ফাঁসি হয় বা দ্বীপান্তর হয় তবে তুমি আবার বিয়ে করো, আমার জন্য তোমার সোনার জীবন নষ্ট করে দিও না।

ওর স্ত্রী কিছুই বলতে পারেনি। আকুল কান্নায় ওর বুকের ওপর আছড়ে পড়ে কুসুম পেলব হাতটি দিয়ে স্বামীর মুখ চেপে আর্তনাদ করে উঠেছিল, ওগো ওকথা বলো না। তুমি আমার কাছে আবার ফিরে আসবে – আল্লাহ তোমাকে ফিরিয়ে দেবেন। আর কথা বলতে পারেনি ধলু। জোর করে বউকে

www.pathagar.com

বুক থেকে সরিয়ে রেখে এক দৌড়ে ঘর থেকে বের হয়ে এসেছিল। এসেই কোনদিকে না চেয়ে বলে উঠেছিল, চলুন দারোগা সাহেব, আমার হয়ে গেছে।

সেই যে বের হয়ে এসেছিল আর বাড়ি যেতে পারেনি ধলু। অনেক অর্থ ব্যয়, তদ্বির আর হয়ত বা ওর রানীর ঐকান্তিক প্রার্থনার জোরেই মাত্র চার বছরের সাজা হয়েছে ধলুর। আর সবাই খালাস পেয়েছে। মজিদ একদিন ধলুর বউকে নিয়ে এসেছিল জেলখানায় দেখা করাতে। দু'জনের একজনও প্রায় একটা কথাও বলতে পারেনি। ও শুধু চেয়েছিল ওর রানীর কান্নাভেজা হাসিভরা সুন্দর মুখটির দিকে।

রানী চোখের জল মুছতে মুছতে শুধু বলতে পেরেছিল, বলেছিলাম না আল্লাহ তোমাকে ফিরিয়ে দেবেন। ভেব না দেখতে দেখতে চারটা বৎসর কেটে যাবে।

ধলু এখন অস্থির হয়ে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করে, চাচাজী, কবে চিঠি লিখতে পারব? মমিন সাহেবের ফালতু রহমানের কাছে ও বলেছে ওর রানীকে চিঠি লিখতে পারবে বলেই তাড়াতাড়ি লেখাপড়া শেখার চেষ্টা করছে।

ওর দুর্বলতা টের পেয়ে মিথ্যা করেই বলি, আরও অনেক দিন লাগবে, তাড়াতাড়ি পড়তে থাক। চোখ-মুখ সাময়িক ম্লান হয়ে উঠলেও নতুন উৎসাহে বইস্লেট নিয়ে বসে পড়ে ধলু।

জেল-পঞ্চায়েতের নির্বাচন হয়ে গেল। কয়েকদিন ধরে সমস্ত জেলখানা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। জোর প্রচারণা চালাচ্ছিল বিভিন্ন প্রার্থী ও তাদের সমর্থকরা। কিং স্টর্ক সিগারেটের চাহিদা বেড়ে গিয়েছিল জেলের মধ্যে। জেলাভিত্তিক বিভিন্ন দল-উপদলের সৃষ্টি হয়েছিল। ময়মনসিংহ এবং বরিশাল জেলাবাসীদের সংখ্যাধিক্যের ফলে তাদের মধ্য থেকেই বেশির ভাগ প্রার্থী নির্বাচিত হল।

রফিক ভাইয়ের ফালতু নারী হরণ মামলার আসামী লতিফ নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের ফালতুরা লতিফকে জয়ী করবার জন্য কদিন ধরে জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছে। ওরা বলে লতিফ ফেল করলে দশ সেলেরই

www.pathagar.com

বদনাম। ওদের সাহেবদেরই মুখ ছোট হয়ে যাবে। তাই ওরা লতিফের পক্ষে মেতে উঠেছিল। নির্বাচন শেষ হতেই ওরা দৌড়ে এসে সুখবর দিল লতিফ সর্বাধিক ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছে। ওদের আনন্দে আমরাও আনন্দিত হয়ে উঠলাম।

পঞ্চায়েতের নির্বাচন তিন বছর পর পর অনুষ্ঠিত হয়। জেলের অভ্যন্তরের শাসনযন্ত্রকে মূলত: কয়েদীরাই চালু রাখে। কয়েদীদের অভাব-অভিযোগ, শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং থাকা-খাওয়ার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করার জন্যই এই পঞ্চায়েত সৃষ্টি করা হয়েছে। জেলখানার বিভিন্ন স্থানে পঞ্চায়েত সদস্যদেরকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে নিযুক্ত করা হয়। হাসপাতাল, বাগান, সেল ব্লক, চৌকা এবং গেটে এইসব মেম্বারদের কাম পাস হয়। এদেরই মধ্যে কয়েকজন জেলগেটে কয়েদীদের জন্য কনট্রাক্টরদের সরবরাহকৃত খাদ্যাদি পরীক্ষা করে গ্রহণ করে। রসুইখানার মেম্বারদের প্রতাপই বেশি। এক টুকরা পেঁয়াজ, একটা কাঁচামরিচ আর এতটুকু বাড়তি মাছ-মাংসের জন্য অনেকেই এদের কাছে ধর্না দেয়।

১৯৬২ সালে ঢাকা কলেজ প্রাঙ্গণে শিক্ষা সপ্তাহ উদ্বোধন করতে গিয়ে লাট সাহেব অপমানিত হলেন। ছাত্রলীগ কর্মী রাজুর পাদুকাঘাত পড়ল তার গণ্ডদেশে। তুমুল ছাত্র বিক্ষোভের মধ্যে পরিসমাপ্ত হলো সেদিনের অনুষ্ঠান। ফলে সে রাত্রেই আরও কয়েকজন ছাত্রসহ আমাকে গ্রেফতার করা হল সুনির্দিষ্ট অভিযোগে। রাশেদ খান মেননও ছিল আমাদের মধ্যে। নতুন বিশ সেলের নীচে আমাদের থাকতে দেওয়া হল। সাধারণ হাজতীদের জন্য বরাদ্দ খাবার আমাদের দেওয়া হল।

ছাত্রদের নিয়ে আমি একটু অসুবিধায় পড়লাম – ওরা এসব খাবারে অভ্যস্ত নয়। কপাল ভাল। হঠাৎ দেশের একজন পরিচিত লোক পেয়ে গেলাম। ভদ্রলোক আমাদের ওখানকার একজন হঠাৎ ধনী, সরকারি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে তখন জেল খাটছেন। সে সময় প্রচুর ঐশ্বর্যের মালিক হয়েও তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী। অগত্যা জেল পঞ্চায়েতের মেম্বার নির্বাচিত হয়ে কায়িক পরিশ্রম থেকে আত্মরক্ষা করেছেন।

আমার গ্রেফতারের কথা শুনেই তিনি দেখা করতে এলেন। তখন আমরা মাত্র খেতে বসার আয়োজন করছি। মেম্বার সাহেব আমাদের খাবার দেখে এক মিনিট চিন্তা করলেন। পরক্ষণেই আমাকে বললেন, আপনারা একটু

www.pathagar.com

অপেক্ষা করুন, আমি আসছি। দশ মিনিটের মধ্যে তিনি এক এক প্লেট গরম আলু ভাজি নিয়ে এসে আমাদের দিলেন। সেই ভাজি দিয়ে পরিতৃপ্তি সহকারে আমরা খাওয়া সমাধা করলাম।

তারপর থেকে প্রতি বেলায়ই ভদ্রলোক আমাদের জন্য একটা কিছু বিশেষ তরকারির বন্দোবস্ত করে দিতেন। তাঁর ক্ষমতা দেখে আমরা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি এক গাল হেসে জবাব দিলেন, আমি এখন বড় চৌকার মেম্বার।

ফাইল, ডাইল আর গাইল – এ তিনটিই হল জেলখানার বিশেষত্ব। অবশ্য কয়েদী এবং হাজতীদের ক্ষেত্রেই এগুলো প্রযোজ্য। আমরা ত জেলখানার ভাগ্যবান বাসিন্দা, সরকারের ঘরজমাই। কয়েদীদের সমস্ত কাজই ফাইলে করা হয় এবং এবং প্রত্যেকটাই একটা প্যারেড। ওদের প্রতিটি দিন কতকগুলো প্যারেডের মধ্যে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এর ব্যতিক্রম হওয়ার উপায় নেই। দল বেঁধে মেট পাহারার তত্ত্বাবধানে ফাইল করে ওদের চলতে হয়। দৈনন্দিন জীবনকে ওরা ঘড়ির কাটার শৃঙ্খলায় আয়ত্ত করে নিয়েছে।

ডাইল আর গাইল জেলখানায় পর্যাপ্ত। এ দুটো জিনিসের কোনদিন অভাব হয় না। দ্বিপ্রহরে এবং অপরাহ্নে ডাল ছাড়াও একটা ঘ্যাট জাতীয় তরকারি বা মাছ-মাংস ওরা পায়। সকালে শুধু ডাল-ভাত। ইদানীং কয়েদীদের খাদ্যবস্তু অনেকটা সহনীয় হয়েছে। কিছুদিন আগেও সকালে ওদের 'লব্‌ছি' পরিবেশন করা হত। পচা ভাতের জাউয়ের মধ্যে তেঁতুল দিয়ে তৈরি সে অপূর্ব পদার্থ আমার ভাগ্যেও কয়েকদিনের জন্য জুটেছিল। ক্ষুধার তাড়নায় সে অমৃত মুখে দেওয়ার সময় চোখের জলে তা লবণাক্ত হয়ে উঠত কিনা হলফ করে আজ সে কথা বলতে পারছি না।

কয়েদীদের সাথে দুর্ব্যবহার, সামান্য কারণে মারধোর, গালাগালি এবং কেস্টো ফাইলে হাজির করে মার্কা কেটে নেওয়ার মধ্যে কিছু কিছু জেল কর্মচারী আনন্দলাভ করেন। কেউ কেউ কয়েদীদের লুক্কায়িত অর্থের লোভেও অবাঞ্ছিত শাস্তির আয়োজন করেন। কিছু কিছু বি-ক্লাস কয়েদী আছে যাদের কাছে প্রচুর টাকা-পয়সা রয়েছে। যারা আরও এক ধাপ ঊর্ধ্বে, তাদের গলায়

www.pathagar.com

ফোকেই টাকা-পয়সা এবং স্বর্ণালঙ্কার রক্ষিত আছে। সুবেদার, জমাদারদের মধ্যে অনেকেরই এগুলোর সন্ধান জানা থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত বোধগম্য কারণেই ওরা ধরা পড়ছে না, বছরের পর বছর এমনি করে চালিয়ে যাচ্ছে।

কয়েদী এবং সুবেদার জমাদারদের মধ্যে ঘুষ দেওয়া নেওয়ারও একটি সম্পূর্ণ অভিনব টেকনিক রয়েছে। কোন কয়েদীর কোন একটি অন্যায় কাজ হয়ত ধরা পড়ল সুবেদার বা জমাদারের হাতে। তিনি তর্জন গর্জন শুরু করে দিলেন যেন এক্ষুণি বর্ষণ শুরু হয়ে যাবে। কয়েদী দেখল বেগতিক, কিছু না খসালে আর রেহাই পাওয়ার উপায় নেই। সে তখন সুবেদারকে হাত কপালে ঠেকিয়ে স্যালুট করল।

সুবেদারের নজর ওর স্যালুট করা হাতের আঙ্গুলগুলোর দিকে। কয়েদী স্যালুটের মধ্যে একটি আঙ্গুল দেখিয়েছে, অর্থাৎ হুজুর, এবার আমায় ক্ষমা করুন। আপনার চরণ মোবারকের সেবার জন্য এ দাসানুদাস একটি টাকার ব্যবস্থা রেখেছে।

হয়ত অপরাধ গুরুতর, মাত্র এক টাকায় তার প্রতিকার হতে পারে না। সুবেদার আরও জোরে হুঙ্কার দিতে থাকবেন, তোমকো কেষ্টো ফাইল মে হাজির করে গা।

বেচারী কয়েদী তখন আবার দু আঙ্গুল উঁচিয়ে স্যালুট করল – দু টাকার প্রতিশ্রুতি দিল।

তাতেও তুষ্ট না হলে, তিন, চার এবং পাঁচ আঙ্গুল পর্যন্ত উঠিয়ে স্যালুট চলতে থাকল। পাঁচ টাকার প্রতিশ্রুতিতে সুবেদার সাহেবের দাড়িগোফের অভ্যন্তর থেকে তখন একটা খুশির আভা বেরিয়ে এল, মুখে হাসি ফুটে উঠল। গরম সহিষ্ণুতার পারাকাষ্ঠা দেখিয়ে তিনি তখন ঘোষণা করলেন, যাও। ইস্‌দফে তোম্‌কো মাফ দিয়া, আয়েন্দা কাভি ... ইত্যাদি, ইত্যাদি।

রাশেদ মোশাররফ আমাদের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ। ওকে আমরা ম্যানেজার নির্বাচিত করেছি। সকলেই ওকে স্নেহ করেন। ওর বড় ভাই খালেদ মোশাররফ আমার কলেজ জীবনের বন্ধু। ছাত্র আন্দোলনের কাজে রাশেদের হাতেখড়ি আমার কাছে। ও আমার অত্যন্ত স্নেহের পাত্র। রাশেদ করিৎকর্মা

www.pathagar.com

ছেলে, এরই মধ্যে ও নিজ এলাকা ধানমণ্ডিতে বি. ডি. মেম্বার নির্বাচিত হয়েছে। ঢাকা শহর আওয়ামী লীগেরও সহ-সম্পাদক। সাহসী এবং কর্মী ছেলে হিসেবে ওর পরিচিতি আছে।

সেদিন ইন্টারভিউতে গিয়ে বাবার সাথে ঝগড়া করে এল রাশেদ। অত্যন্ত ভাবপ্রবণ ছেলে ও। পিতার স্বাভাবিক অভিভাবকত্বের অভিমানে ওকে হয়ত তিনি দু কথা বলে থাকবেন রাজনীতিতে অতিরিক্ত উৎসাহ নেওয়ার জন্য। তাই রাগারাগি করে ইন্টারভিউর সময় উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই চলে এল সেলে। শুনে ওকে তিরষ্কার করলাম পিতার মনে দুঃখ দেওয়ার জন্য।

বেচারার মনেও সুখ নেই। ১০ই জুন ওর বিয়ের তারিখ স্থির হয়েছিল। ১ লা জুনে রাতে যখন ও ভাবী বধূর মধুর চিন্তায় বিভোর হয়ে ঘুমাচ্ছিল তখনই পুলিশ ওকে ঘুম থেকে জাগিয়ে ধরে নিয়ে এসেছে। বিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে গেছে। ওর কেবল চিন্তা, পছন্দ করা পাত্রীটির যদি অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায়।

সকলেই ওর বড় ভাইয়ের মত। কারো কাছেই হৃদয়ের দুয়ারটি ও খুলে ধরতে পারে না। এমনিতেই সকলের সহানুভূতি আর সমবেদনার চাপে বেচারা লজ্জায় মাটির সাথে মিশে যায়।

শাহাবুদ্দীন চৌধুরী ওর রুমমেট। মিটমিটে চৌধুরী ওকে পরামর্শ দিল, ভাবী স্ত্রীর কাছে প্রেমপত্র পাঠাতে। দু একদিন আপত্তি করে শেষ পর্যন্ত চৌধুরীকেই গুরু ধরল রাশেদ। কয়েকদিন ধরে পত্রের মুসাবিদা চলল। পরিশেষে উত্তম হস্তাক্ষরে প্রচুর যত্নের সাথে চিঠি লিখে পাঠিয়ে দেওয়া হল। চিঠির বিষয়বস্তু জানি না, তবে মুখে মুখে চৌধুরীর কাছে থেকে যা জেনেছিলাম তাতে বুঝলাম চার পৃষ্ঠার ঠাসবুনানীতে শুধু একটি করুণ আবেদনই ফুটে উঠেছে যার মূল সুর হলো, 'তোমাকে ছাড়া বাঁচব না, তোমাকে চাই-ই চাই।' চিঠির সে কাতর প্রার্থনায় মানুষের হৃদয় চাট্টিখানি কথা, পাথরও গলাতে বাধ্য।

অচিরেই চিঠির জবাব এল। সহানুভূতি আর আশ্বাসে ভরা সে চিঠি। রাশেদকে আর পায় কে। আনন্দের আতিশয্যে সেদিন আমাদেরকে রীতিমত 'ফিস্টি' দিয়ে দিল।

তিন মাস কারাবাসের পরই রাশেদ মুক্তি পেয়ে যায়। মুক্তির অল্প পরেই

www.pathagar.com

ধুমধামের মধ্যে মানস প্রতিমাকে ঘরে নিয়ে এসে সুখের নীড় বেঁধেছে রাশেদ। উর্দু রোডের মসজিদের মিনারে উঠে সে বার্ত্তাও আমাদের জানিয়ে যেতে ভোলেনি। ওর সুখে আমাদের হৃদয়ও আনন্দে ভরে ওঠে।

মোহাম্মদ উল্লাহ সাহেব আমাদের মধ্যে সবচাইতে স্বল্পভাষী। নীরব কর্মী হিসাবে তিনি আওয়ামী লীগের মধ্যে পরিচিত। দীর্ঘদিন ধরে মোহাম্মদ উল্লাহ সাহেব প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক। জেলের ভেতরে এবং বাইরে সর্বত্রই তার এক রূপ। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেন আর নিজের পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। একজন ভাল দাবা খেলোয়াড় মোহাম্মদ উল্লাহ সাহেব। ঢাকা বারের ক্লাবে দেখেছি সময় পেলেই রাজা-উজির নিয়ে বসে গেছেন। এখানে তার প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। মাঝে মাঝে তার সাথে খেলতে বসে তিন চালে মাত্ হয়ে যাই।

আমাদের প্রতিদিনকার রাজনৈতিক আলোচনা সভায় অংশ নিতে তিনি ভোলেন না। মাঝে মাঝে অত্যন্ত ধীরকণ্ঠে দৃঢ়তার সাথে নিজ বক্তব্য তুলে ধরেন – তখনই তাঁর অন্তরের বলিষ্ঠ চিন্তাধারার রূপটি সম্যক ফুটে ওঠে।

হঠাৎ সেদিন জমাদার স্লিপ নিয়ে উপস্থিত। মোহাম্মদ উল্লাহ সাহেবকে অন্যত্র সরিয়ে নেবার আদেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। আমরা অনেকেই কারণ জানতে না পেরে জিজ্ঞাসু হয়ে উঠলাম। মোহাম্মদ উল্লাহ সাহেবই আমাদের জানালেন, তিনি রোগাক্রান্ত। তারই অনুরোধে কর্তৃপক্ষ তাকে আলাদা করে নিয়ে যাচ্ছেন। নির্বিকারচিত্ত মোহাম্মদ উল্লাহ সাহেবের দিকে চেয়ে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়েও কোন্ যাদুবলে তিনি এমনি আত্মসমাহিত থাকতে পারেন, আমরা ভেবে পেলাম না। এতটুকু চাঞ্চল্য না দেখিয়ে সকলের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে মোহাম্মদ উল্লাহ সাহেব চলে গেলেন পুরনো বিশ সেলে রোগজীর্ণ দেহ মানসিক একাকিত্বের মাঝে। অল্প কয়েকদিন পরই সরকার তাকে ছেড়ে দেয়। ভেবে আশ্বস্ত হই, জেলখানার রুদ্ধ পরিবেশের বাইরে মুক্ত পৃথিবীর মুক্ত অঙ্গন হয়ত তাকে রোগমুক্তির পথে এগিয়ে দেবে।

শাহাবুদ্দীন চৌধুরীর জ্বালায় সবাই অস্থির। ভদ্রলোকের তিনটে চোখ।

www.pathagar.com

আমরা যে ক'জন অবিবাহিত যুবক আছি, আমাদের কারো নামে কোন মেয়েলী হস্তাক্ষরে ঠিকানা লেখা চিঠি আসলে আর কথা নেই। চৌধুরী মিটমিট করে তাকিয়ে এমনি করে হাসতে থাকবে যা দেখে গাত্রদাহ না এসে যায় না। মন্তব্য করবে, 'কি বাছাধন, ডুবে ডুবে পানি খাচ্ছ? ভেবেছ, অমাবশ্যার বাবাও টের পাবে না?'

চিঠিটা হয়ত মা লিখেছেন, নয়ত বা বোন। কিন্তু চৌধুরীকে সে কথা বুঝাতে যাওয়ায় অনেক বিড়ম্বনা। তার চাইতে বলুক যা খুশি। চৌধুরীর সাথে আমার পূর্ব পরিচয় ছিল না। এখন আমরা পরস্পর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এটা চৌধুরীরই একক কৃতিত্ব। অল্প সময়ের মধ্যে মানুষকে আপন করে নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে তার।

তেজগাঁ শিল্প এলাকায় চৌধুরীর যথেষ্ট প্রভাব। 'চৌধুরী কেমিক্যালে'র মালিক শাহাবুদ্দীন চৌধুরী। নিজে শিল্পপতি হয়েও সর্বহারা মানুষের বাঁচার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করেন নাই। মেহনতি মানুষ তাই চৌধুরীকে তাদের আপনজনের মর্যাদা দিয়েছে। মালিক-শ্রমিক একাকার হয়ে গিয়েছে চৌধুরীর দরদী মনের ছোঁয়ায়।

হৈ চৈ পার্টির একজন বড় পাণ্ডা চৌধুরী। সময়ে অসময়ে হাততালি দিতে দিতে বিপুল দেহভার নিয়ে নৃত্যের মহড়া দেয় চৌধুরী। আমরা তাই তার নামকরণ করেছি মাদাম আজুরি। আমাদের বিচিত্রার আসরে মাদাম আজুরির নৃত্যানুষ্ঠান অবশ্য কর্মসূচী।

চৌধুরীকে দশ সেলের এনকোয়ারী কমিশনও বলা যেতে পারে। মমিন সাহেব কেন এখনও অকৃতদার আছেন, রফিক ভাই কেন ইন্টাভিউর খবর পেলে দাড়ি কামাতে অস্থির হয়ে পড়েন, জালাল সাহেব কেন অর্ধপক্ব কেশরাজীকে কলপ সহযোগে কৃষ্ণবর্ণে রূপান্তরিত করছেন, মহিউদ্দীনের স্যুটকেসে কেন লেডিজ স্যান্ডেল পাওয়া গেল, সারওয়ার ভাইয়ের ঘরে বেবী ফিডার এল কি করে – এমনি সব দুরূহ এবং বিচিত্র বিষয়সমূহ সর্বক্ষণ চৌধুরীর মস্তিষ্কে আনা গোনা করছে। অচিরেই প্রত্যেকটি ঘটনার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দিয়ে তাদের প্রকৃত কার্যকারণ সকলের সম্মুখে উন্মোচিত করে দিচ্ছে চৌধুরী। চৌধুরীর অত্যাচারে সকলেই জর্জরিত।

www.pathagar.com

বিচিত্রার আসর বসেছে মিজান ভাইয়ের ঘরে। কবিগানে অংশগ্রহণ করলেন ওস্তাদ শামসুল হক ঠ্যাংগেরবান্দ এবং বয়াতি মোল্লা জালাল উদ্দীন ফরিদপুরী। আমি, ওয়াবেদ, মমিন সাহেব থালা, বিস্কুটের টিন ও বাটি নিয়ে দোহারী করলাম।

ঠ্যাংগেরবান্দের ওস্তাদজী সহজেই ফরিদপুরী বয়াতীকে কোণঠাসা করে ফেললেন। হক সাহেব যখন কানের কাছে হাত নিয়ে মিয়াকি তোড়ি গাওয়ার ভঙ্গিতে গেয়ে উঠলেন, 'বিন্দে সখী লো, যাবার বেলায় প্রাণনাথ কি বইলা গেছে' তখন সমস্ত আসর তোফা, তোফা, আলহামদুলিল্লাহ্ করে উঠল। ওস্তাদজী সবিনয়ে সকলকে নত মস্তকে হাত তুলে অভিবাদন করলেন।

রফিক ভাই সুকণ্ঠ গায়ক। তিনি শোনালের একখানা উৎকৃষ্ট কীর্তন আর দশ সেলের জারী। তার স্বরচিত জারী আসরে প্রচুর হাসির খোরাক জোগাল। মিজান ভাই মেয়েলী সুরে প্রেমের গান গাইলেন। আমি ওবায়েদ আর সিরাজ বিদ্রোহী কবির 'কারার ঐ লৌহ কপাট' গলার জোরেই ভেঙ্গে ফেলবার চেষ্টা করলুম। বজলুর রহমান সাহেবের ভুড়িনৃত্য-সহযোগে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে শ্রোতারা হেসে গড়িয়ে পড়ল। মোস্তফা সরওয়ার একক নৃত্য পরিবেশন করলেন। 'মাদাম আজুরী' আর রাশেদ টুইস্ট নাচের পাকিস্তানী সংস্করণ নেচে দেখালেন।

সর্বশেষ অনুষ্ঠান পরিবেশন করলেন বিচিত্রার পরিচালক হাকিম সাহেব স্বয়ং। তিনি হালকা করলেন ফকিরী কায়দায়। তার কলফের মধ্যে থেকে বের হয়ে আসা এল্হু, এলহু শুনে আমরা বুঝতেই পারলাম না সত্যিই কোন খাজা বাবার দরগার খাদেমের হাল্কা শুনছি, না যিনি আমাদের সামনে বসে বাহ্যজ্ঞান বিস্মৃত হয়ে হাল্কা করে চলেছেন, তিনি একজন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং টঙ্গীর একজন বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা।

অনুষ্ঠান শেষে মিজান ভাই পরিবেশন করলেন শ্বশুরবাড়ি থেকে প্রেরিত তার প্রিয় খাবার ভুনা খিচুড়ী এবং খাসির মাংস। খাওয়ার পরই হাত তুলে মোনাজাত করলাম : হে দীন দুনিয়ার মালিক। হে আসমান জমিনের শাসনকর্তা! যে আমাদের পেট ঠাণ্ডা করল তুমি তার হাত-পা ঠাণ্ডা কর।'

অন্যরাও হাত তুলে আমিন আমিন বললেন। কেবল মিজান ভাইই মোনাজাতে শরিক হয়ে ছওয়াব হাছেল করতে রাজী হলেন না।

www.pathagar.com

সেদিন নিত্যকার আলোচনার আসরে তর্কের ঝড় বইতে শুরু করেছে। রফিক ভাই বলছিলেন, এককভাবে সংগ্রাম করে বা অপরাপর গণতান্ত্রিক শিবিরগুলের সাথে হাত না মিলিয়ে দেশের বুক থেকে অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারকে পরাজিত করা যাবে না। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গণ-অভ্যুত্থানের ইতিহাস ব্যাখ্যা করে জোর দিয়ে বলে উঠলেন, ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ছাড়া জনতা কখনই জয়লাভ করতে পারে না।

রফিক ভাইয়ের পাল্টা কথা জালাল সাহেব বলবেনই। তিনি ফোড়ন কেটে উঠলেন, ঐক্যের নামে সংগ্রামী প্রগতিশীল কর্মীদের সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীলদের অনুচরেরা ঢুকে পড়ে আন্দোলনকে ভেতর থেকে দুর্বল করে দেয়। অনেকের সংমিশ্রণে যে তথাকথিত ঐক্য গড়ে ওঠে তা অচিরেই বুর্জোয়া শক্তির প্রভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট জালাল সাহেব আরও বললেন, ধনবাদী সম্প্রদায় কোনদিন গণমুক্তির আন্দোলনকে জয়যুক্ত হতে দিতে চায় না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থের আনুকুল্যে তারা কিছু ক্রীড়নক সৃষ্টি করে রাখে – প্রয়োজনের মুহূর্তে গণসংগ্রামকে ব্যর্থ করার জন্য এই সব ধনবাদীদের ক্রীড়নকেরা সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং সুচ হয়ে আন্দোলনের মধ্যে ঢুকে পরে ফাল হয়ে বেরিয়ে আসে। অচিরেই আন্দোলনের গায়ে বড় আঘাত হানে।

সরওয়ার সাহেব উত্তেজিত হয়ে মোল্লা সাহেবের কথার প্রতিবাদ করলেন। তিনি বললেন, যারা ঐক্য চায় না তারা জনতার বন্ধু নয়। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের নামে যারা ভয় পায় তারাও বুর্জোয়া মনোভাবের ঊর্ধ্বে নয়। জনগণের কোন বড় সংগ্রাম ঐক্য ছাড়া সফলতা লাভ করতে পারেনি। একটা দেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এক নায়কত্বের বিরুদ্ধে টোটাল ফাইট ছাড়া কোন দল বিশেষের বা জনতার এক অংশের একক আন্দোলন, তা যত বড়ই হোক না, কোনদিন সার্থকতায় পর্যবসিত হতে পারে না। স্বৈরতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্র দূর করতে হলে দলমত নির্বিশেষে প্রতিটি গণতন্ত্রমনা মানুষের দুর্বার ঐক্যই প্রথম পদক্ষেপ।

জালাল সাহেব বললেন, আপনি বলতে চান সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়ে নূতন করে একটা ঐক্যের প্রহসন করলেই দেশ থেকে অগণতান্ত্রিক সরকারের উচ্ছেদ করা যাবে?

www.pathagar.com

সরওয়ার সাহেব জোর দিয়ে বললেন, ঐক্যের প্রহসন নয়, সত্যিকারের কার্যকরী ঐক্যের মাধ্যমে নিম্নতম একটা কর্মসূচী নিয়ে যদি দলমত নির্বিশেষে প্রতিটি রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান কার্যক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে তবেই সফলতার কিছুটা আশা আমরা করতে পারি। অন্যথায় কিছুতেই নয়।

মিজান ভাই এতক্ষণ চুপচাপ তর্কের গতিধারা লক্ষ্য করছিলেন, তিনি ধীরে ধীরে বললেন, গণতন্ত্রের পুনপ্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন হোক, একথা নীতিগতভাবে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু আমাদের অতীত ইতিহাস এ ব্যাপারে আমাদেরকে নিরুৎসাহ করে। অতীতেও কয়েকবার আমরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের রূপ দেখেছি। তাকে কোন প্রকারেই গতিশীল আন্দোলন বলা চলে না। 'ভাগের না গঙ্গা পায় না' প্রবাদকে সার্থক করে সে সব আন্দোলন অচিরেই নিষ্ক্রিয়তার স্রোতে বিলীন হয়ে যায়।

বজলুর রহমান বলে উঠলেন, সেটা একতার ত্রুটি নয়। ত্রুটি নেতৃত্বের আর এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির, যারা রাজনীতির ডামাডোলে নিজেদেরকে অর্থ ও ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পায়। গণতান্ত্রিক আদর্শে অনুপ্রাণিত প্রতিটি রাজনৈতিক দল ও কর্মীর মধ্যে যদি সত্যিকারের ঐক্য গড়ে ওঠে এবং তারা যদি ত্যাগ ও তিতিক্ষার পথে দীক্ষা নিয়ে সংগ্রাম করে যান তা হলেই স্বৈরাচারী শক্তির পতন হতে পারে।

মমিন সাহেব বিতর্কে অংশগ্রহণ করে বললেন, আপনারা যে ধরনের ঐক্যের কথা চিন্তা করছেন তা যদি বাস্তবায়িত হয় তাহলে তার চাইতে সুখের বিষয় আর কিছুই হতে পারে না। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সেটা কতটুকু কার্যকরী হবে তা ভবিতব্যই বলতে পারে। এ ব্যাপারে আমি খুব আশাবাদী নই। কেননা, এ দেশের মানুষের যে চারিত্রিক পরিচয় নিজেদের মধ্যেই আমরা দেখতে পাই, তাতে ত্যাগ ও তিতিক্ষার রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে খুব অল্প লোককেই শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাবে। রবিবাসরীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে অনেককেই পাওয়া যাবে না। তাই বাধ্য হয়ে একক আন্দোলন গড়ে তুলতে হয়। কিন্তু অন্য সবাই যদি সত্যিই সংগ্রামের পথে আসে, তাদের সাথে একত্রিত হয়ে আন্দোলন করতে আমরা নিশ্চয়ই প্রস্তুত আছি। নিষ্ক্রিয় বিবৃতি সর্বস্ব রাজনীতির ঊর্ধ্বে যদি সবাই এগিয়ে আসতে পারে আন্দোলনের ক্ষেত্রে অবশ্যই অগ্রগতি আসবে।

www.pathagar.com

নীরব শ্রোতা হারুন আবেদন জানাল, এ বিষয়ে মানিক ভাইয়ের বক্তব্য শুনতে চাই।

মানিক ভাই সাধারণত এতক্ষণ শ্রোতার ভূমিকা পালন করেন না। মূলত তিনি বক্তা আমরাই শ্রোতা, হয়ত সেদিন অন্যদের চিন্তাস্রোত হৃদয়ঙ্গম করার প্রয়াস পাচ্ছিলেন, তাই একটার পর একটা সিগারেট টেনে চুপ করেই বসেছিলেন।

মানিক ভাই বললেন, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বিপরীতমুখী পথ ও মতের বিভিন্ন দলগুলোর ঐক্য দুর্বলতার ঊর্ধ্বে নয়। তবুও একটা নির্দিষ্ট কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে যদি কার্যকরী একতা গড়ে তোলা যায় তা নিশ্চয়ই ফলপ্রসূ হতে বাধ্য। যেখানে গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা অনুপস্থিত, ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা নেই ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যেখানে অনুপস্থিত, মানুষের সামান্যতম ভোটের অধিকার যেখানে নেই – সেখানে ভিন্ন ভিন্ন দল করে নিজেদের মত আর পথকে প্রচার করে কি ফল লাভ হতে পারে। যেখানে রাজনীতি করার অধিকার সীমিত সেখানে অজস্র রাজনৈতিক দল গঠনেরই বা কি যৌক্তিকতা। কিন্তু যেটা ফ্যাক্ট সেটাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। যে কোন কারণেই হোক প্রতিকূল পরিবেশেও যখন একাধিক রাজনৈতিক দল বিরাজমান এবং সকলেই যখন একনায়কত্বের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্রের স্বপক্ষে নীতি নির্ধারণ করেছে তখন সবাইকে এক হয়ে মূল অধিকার আদায় করতেই হবে। বিভিন্ন দল যদি পৃথকভাবে চলতে থাকে এবং পরস্পরের মধ্যে কাদা ছুঁড়তে থাকে তা হলে তারা জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই করবে। তাদের ঘৃণ্য ভূমিকার ফলে স্বৈরাচারের শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভই করবে।

একটু থেমে সিগারেটে শেষ টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মানিক ভাই বললেন, গণতান্ত্রিক শিবিরের ঐক্য অতীব প্রয়োজন এবং এ ব্যাপারে তাদেরকেই অগ্রণী হতে হবে যারা আজও নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া প্রতিষ্ঠানকে কেবল একলা চলার জন্য দোষারোপ করেই নিজেদের কর্তব্য শেষ করছেন। যারা আন্দোলনে অগ্রসর হয়ে গেছে তাদের দোষারোপ করার বদ-অভ্যাস পরিত্যাগ করে তাদের সমপর্যায়ে এগিয়ে আসার মধ্যেই এই সব প্রতিষ্ঠানের আন্দোলনমুখী প্রগতিশীলতার পরিচয় পাওয়া যাবে। যারা শর্ট কাট রাস্তায় গদি দখলের মোক্ষ লাভ করতে চান তাদের এ কন্টকের পথে পা না বাড়ানই উচিত হবে। প্রভূত ক্ষমতাশালী আজকের

www.pathagar.com

মিলিটারি ডিক্টেটরশিপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জয়লাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করলে দলমত নির্বিশেষে প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক শক্তিকে দৃঢ় ঐক্যের ভিত্তির উপর দাঁড়াতে হবে – তা না হলে গণশক্তির জয় সুদূর পরাহত।

আস্তে আস্তে কথাগুলো উচ্চারণ করে মানিক ভাই একটা নূতন সিগারেট ধরিয়ে নিজেকে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে ঊর্ধ্বমুখে নীল আকাশের দিকে চেয়ে চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লেন। আমরা আর তাকে বিরক্ত করা যুক্তিযুক্ত মনে করলাম না। একে একে নীরবে উঠে এলাম।

মোস্তফা সরওয়ার আর নানার মুক্তির নির্দেশ এসে গেল। অনির্দিষ্ট কারাবাসে আকস্মিক মুক্তির ছাড়পত্র পেয়ে উভয়েই বাকহারা হয়ে গেলেন। আমরা আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম। সরওয়ার ভাই আর নানাকে নিয়ে কোলাকুলি শুরু করে দিলাম। যাদের নিয়ে এত হৈ চৈ তারা কিন্তু ম্রিয়মাণ হয়ে গিয়েছেন। মুক্তির আনন্দ তাদের অনস্বীকার্য, কিন্তু যাদের সাহচর্যে দীর্ঘ কারাবাসের নিরানন্দ দিনগুলো আনন্দে ভরে উঠেছিল, যাদের হাসি আনন্দের কলকাকলিতে মুখর হয়ে উঠত প্রতিটি মুহূর্ত, তাদের পশ্চাতে ফেলে চলে যাওয়ার সময় সারা মন অস্বস্তিতে ভরে ওঠে। নিজেকে অপরাধী মনে হয়। সরওয়ার ভাই এবং নানারও মন ভরে উঠেছিল এই বিষাদময় অনুভূতিতে।

আমার জীবনেও বহুবার এমনি অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এসেছে। গ্রেফতার হয়ে জেলখানায় পদার্পণ করেই কতকগুলো হাসিমাখা মুখের সাক্ষাৎ পেয়েছি, জেরখানার তারা পুরনো বাসিন্দা, দীর্ঘদিন ধরে বিনাবিচারে আটক আছেন। দৌড়ে এসে বুকে জড়িয়ে ধরে সাদরে তারা বরণ করে নিয়েছেন। কিছুদিন পরে যখন মুক্তির আদেশ পেয়ে তাদের ছেড়ে বাইরের জগতে পা দিতে উদ্যত হয়েছি, তখনও তারা হাসিমুখে আলিঙ্গন করে হাতে দুটো রক্ত গোলাপ গুঁজে দিয়ে বিদায় দিয়েছেন।

নিজেকে তখন অপরাধী মনে হতো। মনে হত এদের কি মুক্তি পাওয়ার অধিকার নেই? সারা জীবনই কি এরা কারাগারের অন্ধকারে ধুঁকবে? বাইরের পৃথিবীর মুক্ত আলো-বাতাসে কি এরা নিঃশ্বাস নিতে পারবে না? বিদায় মুহূর্তে ফেলে আসা বন্ধুদের ছলছল চোখের দিকে তাকিয়ে ভেবেছি এদের

www.pathagar.com

মুক্তির জন্যই আজ থেকে আন্দোলনের প্রস্তুতি নেব। সর্বকাজের আগে দেশ মাতৃকার সেবায় নিবেদিতপ্রাণ এই সব বন্ধুদেরকে কারাগার থেকে মুক্ত করার কাজে নামব।

কিন্তু বাইরে গিয়ে কতটুকুই বা করতে পেরেছি। কদিনই না লেগেছে এদের ভুলে যেতে। এই বুঝি জগতের নিয়ম!

আমাদের সকলের তরফ থেকে মানিক ভাই নানা এবং সরওয়ার সাহেবকে দুটি ফুলের গুচ্ছ উপহার দিলেন, দল বেঁধে দুজনকে শকুন্তলার গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিলাম। সরওয়ার ভাই আমাদের জড়িয়ে ধরে ছোট ছেলের মত কেঁদে ফেললেন – জমাদার ওদের দু'জনকে গেটের বাইরে নিয়ে গেল, ওরা চোখ মুছতে মুছতে বার বার পেছন ফিরে আমাদের উদ্দেশে হাত নাড়তে লাগলেন। আস্তে আস্তে গেট পাহারা গেটের পাল্লা দুটি টেনে দিল।

দু'চার দিনের মধ্যেই আরও মুক্তির নির্দেশ এসে গেল। শাহাবুদ্দীন চৌধুরী এবং রাশেদ পর পর মুক্তি পেয়ে চলে গেল। বিদায় মুহূর্তে শুধু ভাবপ্রবণতায় রাশেদ বলে উঠল, আপনারা সকলেই কিন্তু আমার বিয়েতে যাবেন। আপনাদের মুক্তির পরই আমি বিয়ের দিন স্থির করব।

আমরা মনে মনে হেসেছিলাম। কয়েকদিন পর রাশেদ নিজেই ওর বিয়ের খবর দিয়ে গেল। বিদায়কালীন নিমন্ত্রণের কথা তখন আর ওর মনে নেই।

কয়েকদিন পর হাকিম সাহেব মুক্তি পেয়ে গেলেন। হাকিম সাহেবের মুক্তিতে সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উঠলেন। ভদ্রলোক সিংহল থেকে ফিরে আসার সময় বিমান ঘাঁটিতেই গ্রেপ্তার হন। ঢাকায় নেমে পরিবার-পরিজনদের সাথে একটিবার দেখাও করতে পারেননি। সুদূর লংকা থেকে তাদের জন্য যে সব উপহার সামগ্রী এনেছিলেন তাও জেল কর্তৃপক্ষের হেফাজতে দিয়ে দিতে হয়েছিল। পত্নী-প্রেমটা হাকিম সাহেবের বেশ জমাট। দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে এখনো তাদের কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি টানটা তাই স্বভাবতই অন্যদের চাইতে বেশি।

বেচারা হাকিম সাহেব পড়েছিলেন মহা সমস্যায়। সিংহলের এক প্রখ্যাত হস্তরেখাবিশারদ হাত দেখে বলেছেন চল্লিশ বৎসর বয়সে তার প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। এক সপ্তাহ পূর্বে হাকিম সাহেব চল্লিশে পদার্পণ করেছেন। এক্ষুণি মুক্তি না পেলে গণকের ভবিষ্যদ্বাণী যে ব্যর্থ হয়ে যাবে। লগন যে

www.pathagar.com

বহিয়া যায়। হাকিম সাহেব তাই মুক্তির জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। কর্তৃপক্ষ হাকিম সাহেবের বংশরক্ষার নিগূঢ় সমস্যাটির সংবাদ পেয়েছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু অচিরেই তাকে মুক্তি দিয়ে সিংহলের ভবিষ্যৎ বক্তার বিচার সফল হওয়ার সম্ভাবনার পথ উজ্জ্বল করে দিলেন।

ইন্টারভিউ করে এলাম এডভোকেট রব সাহেব এবং মীর হোসেনের সঙ্গে। মীর আমার পুরান বন্ধু। ছাত্রলীগ করেছি বহুদিন এক সঙ্গে। ১৯৬২-র আন্দোলনে জেলও খেটেছি এক সঙ্গে। এখন হাইকোর্টের এডভোকেট। আবদুস সালাম খান এবং রব সাহেবের সঙ্গে আমার রিট মামলার কৌশূলী।

রব সাহেব বললেন, শীঘ্রই আমার মামলার শুনানী হবে।

বাইরের জগতের এক করুণ ছবি তুলে ধরলেন রব সাহেব। খাদ্য সমস্যা চরমে পৌঁছেছে দেশের মধ্যে। গেল কিস্তিতে অধিকাংশ জেলায়ই ধান হয়নি। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। অন্যান্য জিনিসপত্রের দামও বেড়ে গেছে অত্যধিক। পল্লীগ্রামে কোন রেশনের ব্যবস্থা নেই। শহর এলাকায়ও রেশনের চাউল অর্ধেক কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। জোয়ার, ভুট্টা আর গম খেয়ে কিছু লোক বাঁচার চেষ্টা করছে। গরিবের ঘরে প্রায়ই উনূন জ্বলে না। অর্ধাহারে, অনাহারে মানুষের দেহ দিন দিন কংকালসার হয়ে যাচ্ছে। ভিক্ষুকের শোভাযাত্রা চলেছে ঢাকার রাজপথে।

এদেশের মানুষ না খেতে পেয়ে রাস্তায় ডাস্টবিনে মুখ থুবড়ে পড়ে মরে থাকবে তবুও মাথাচাড়া দিয়ে দাঁড়াবে না। শরীরের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে কেড়ে খাওয়ার জন্য একবারও হাত বাড়াবে না। এটাই বাঙালীর স্বভাব। চিরদিন তাই সে মার খেয়ে আসছে। এত যে দুঃখ-দৈন্য, আর নিদারুণ দুর্ভিক্ষ তবুও দেশের মধ্যে টু শব্দটি নেই। সারা দেশে কবরের শান্তি বিরাজ করছে। সরকারের তাই দুশ্চিন্তা নেই। কোথাও ছিটেফোঁটা আন্দোলনের খবর পেলে সূচনাতেই তাকে নির্মমহস্তে দমিয়ে দিচ্ছে।

শুনলাম কয়েক শ' কৃষক-শ্রমিক দল বেঁধে ঢাকা আসছিল ভুখা মিছিল করে খাদ্যের দাবী জানাতে। সরকার খবর পেয়ে পূর্বাহ্নেই শতাধিক পুলিশ পাঠিয়ে দেয় তাদের হটিয়ে দিতে। সশস্ত্র পুলিশের অতর্কিত আক্রমণে

www.pathagar.com

কৃষক-শ্রমিকের ক্ষুদ্র দলটি ছত্রভংগ হয়ে যায়। ভুখা মিছিল আর শহরে প্রবেশ করতে পারে না। পুলিশ বীরবিক্রমে শ'দেড়েক ক্ষুধায় কাতর কংকালসার দেহকে ধরে এনে জেলের মধ্যে পুরে দেয়। জেলের মধ্যে দু'বেলা পেট ভরে ভাত পাওয়া যাবে এ খবরটি শুনে ক্ষুধাতুর মানুষের চোখগুলো লোভাতুর হয়ে ওঠে।

রব সাহেব আরও বললেন, দেশের এই চরম খাদ্য সংকটের মুহূর্তে সরকার রাজবন্দীদের মুক্তির বিবেচনা হয়ত স্থগিত রাখবে। আরও কতদিন অদৃষ্টে জেল ভোগ আছে ভাবতে ভাবতেই সেলে ফিরে এলাম।

বহির্জগতের বার্তা নিয়ে আমাদের মাঝে নূতন অতিথির আগমন হল। আলমগীর কবীরকে কর্তৃপক্ষ আমাদের মাঝেই পাঠালেন। আলমগীর কবীর এদেশের অধিবাসী হলেও প্রায় এক যুগ যুক্তরাজ্যে বাস করে এসেছেন। বিলাতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলেন তিনি। যুক্তরাজ্যের গণতান্ত্রিক এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার আবহাওয়ায় গড়ে ওঠা আলমগীর কবীর ওখানকার পাকিস্তানী নাগরিকদের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন, জন্মভূমির বহুদূরে বাস করেও আলমগীর কবীরেরা দেশমাতৃকার ক্রন্দন শুনতে পেতেন।

দেশের বুকে যখন গণতন্ত্রের হত্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছে, দেশবাসীকে যখন শত অত্যাচার আর উৎপীড়নে জর্জরিত করা হয়েছে তখন আলমগীর কবীরের মতো প্রাণবান ছেলেরা কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলেই চুপ করে থাকতে পারেনি, তার বিরুদ্ধে সেখানে বসেই আওয়াজ তুলেছে। পাকিস্তানী গণমানুষের হাজার দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী সারা বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছে। পাকিস্তানের কর্মকর্তারা বিশ্বের মিলন কেন্দ্র লন্ডন শহরে পা দিয়েই ওদের বিক্ষোভ আর কালো-পতাকায় সংবর্ধিত হয়েছে।

ওদের বিরুদ্ধে সরকারের তাই তীব্র আক্রোশ। বিলেতের আইনের শাসনের রাজত্বে ওরা ওদের হিংসা চরিতার্থ করতে পারেনি। ওদের দেশে ফিরে আসার অপেক্ষায় দিন গুণেছে।

দীর্ঘদিন পরে দেশের এই সব সুযোগ্য সন্তানেরা যখন প্রত্যাবর্তন করেছে

www.pathagar.com

তক্ষুণি ওদের ধরে জেলে পুরে দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ প্রবাসের পর দেশমাতৃকার কোলে ফিরে এসে সন্তানেরা এমনি সাদর সংবর্ধনা লাভ করেছে।

কবীর সাহেবকে পেয়ে আমাদের ঝিমিয়ে আসা পরিবেশ আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা রয়েছে কবীর সাহেবের। আমরা তার কাছ থেকে দুনিয়ার হালচাল জিজ্ঞাসা করি। কবীর সাহেবও উৎসাহী শ্রোতা পেয়ে আনন্দের সাথে দেশ-বিদেশের গল্প করেন আমাদের কাছে।

সুলতান তাড়াতাড়ি কবীর সাহেবকে ওর ব্রে কমিটির মেম্বার করে নিল, যাতে ব্রীজ কমিটি তাকে আর দলে ভিড়াতে না পারে।

নিয়মিত শরীর চর্চা করে অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী আলমগীর কবীর। মেধাবী ছাত্র আলমগীর সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েও পেশায় একজন সাংবাদিক। রেডিও কমেন্টেটার, টেলিভিশন ক্রিটিক, সাংস্কৃতিক ভাষ্যকার এবং সর্বোপরি একজন ফ্রিল্যান্স জার্নালিস্ট হিসেবেই কবীর সাহেব কাজ করে এসেছেন। সংস্কৃতিমনা কবীর সাহেব একজন ভাল গায়কও। সুন্দর রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে পারেন।

ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, রাশিয়া এবং হনলুলুর কিছু কিছু গানও কবীর সাহেব গাইতে পারেন। আমরা সে সব গানের এক বর্ণ বুঝতে না পারলেও হেসে হেসে হাততালি দিয়ে বড় সমঝদারের মত ক্রমাগত মস্তক সঞ্চালন করি।

কবীর সাহেবকে পেয়ে আমাদের সান্ধ্য গান-বাজনার আসর নতুন করে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

মানিক ভাইয়ের শারীরিক অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকে যাচ্ছে। ব্লাডপ্রেসার, ডায়াবেটিস ছাড়াও ইদানিং দাঁতের ব্যথায় ভুগছেন। পরীক্ষায় দেখা গেল তাঁর ব্লাড সুগার বিপজ্জনক সীমা অতিক্রম করে গেছে। কয়েকটি দাঁতও ফেলে দিতে হবে। ডাক্তার, সিভিল সার্জন আর জেল কর্তৃপক্ষ তাঁকে নিয়ে বিপদে পড়ে গেলেন। যে সব রোগে মানিক ভাই ভুগছেন সে সবের চিকিৎসা জেলখানার 'বোখার আউর পেট গড়বড়ের' চিকিৎসা কেন্দ্রে হওয়া সম্ভব নয়। সিভিল সার্জন তাই সরকারকে লিখলেন বাইরের হাসপাতাল

www.pathagar.com

থেকে বড় ডাক্তার এনে তাঁর চিকিৎসা করানোর জন্য। অনেক বিলম্বে লাল ফিতার দৌরাত্ম্য পার হয়ে সে প্রস্তাব গৃহীত হল। ডা. শামসুদ্দীন এবং ডা. বেগ মানিক ভাইকে পরীক্ষা করে অবিলম্বে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে পূর্ণ চিকিৎসা করার অভিমত দিলেন।

অভিজ্ঞ ডাক্তারদ্বয়ের পরামর্শের পরেও মানিক ভাইয়ের চিকিৎসার ব্যাপারে অমার্জনীয় উদাসীনতা চলতে লাগল। সরকারের সমস্যা তাকে কোথায় নেবে। মেডিক্যাল, মিটফোর্ডে নিতে ভরসা করে না, যদি মানিক ভাই হাসপাতালে গিয়েই দেশের মধ্যে বিপ্লব এনে ফেলেন। অনেক চিন্তা, অনেক বিবেচনা আর বিলম্বের পরে মানিক ভাই যখন শয্যাশয়ী হয়ে পড়েছেন তখন তাকে রাজারবাগের পুলিশ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত করা হল। অন্য কোথাও মানিক ভাইকে রেখে ওরা শান্তি পাবে না। সদা শত পুলিশ বেষ্টিত হাসপাতালে রাখার ব্যবস্থা করে ওরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

রুগ্ন দেহেও মানক ভাই একতিল মনোবল হারাননি। বিদায় নেওয়ার সময় আমাদের উদ্দেশে মানিক ভাই বলে গেলেন, আপনারা ভেঙ্গে পড়বেন না, দানবের পরাজয় বিলম্বে হলেও অবশ্যম্ভাবী। সেদিন বেশি দূরে নয় যখন ওরা আপনাদের সংগ্রামের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হবে। ত্যাগ আপনাদের বৃথা যাবে না। ধৈর্য ধরে সেই দিনের অপেক্ষায় থাকুন।

মানিক ভাই চলে গেলেন। আমাদের মনে হল বৃহৎ বটবৃক্ষের সুশীতল ছায়া দূরে চলে গেল – এখন থেকে রৌদ্রের প্রখরতায় আমরা দগ্ধ হতে থাকব।

খালাত বোন নীগারের আজ বিয়ে। আজ ফনুর ওখানে সমস্ত আত্মীয় স্বজনেরা একত্রিত হবেন। সেদিন দেখা করতে এসে ফনু আফসোস করছিল। বলছিল, ছোটদা আপনাকে এখানে রেখে আমরা কি করে আনন্দ করব? ওকে জবাব দিয়েছিলাম, আমাকে তোরা বাকীর খাতায় রেখে দে।

কিছুদিন আগে চাচার একমাত্র ছেলে শাহজাহানের বিয়ে হল। শাহজাহান আমার অত্যন্ত প্রিয়, কিছুতেই আমার অনুপস্থিতিতে বিয়ে করতে রাজী নয়। ডেকে এনে অনেক বুঝিয়ে ওকে পাঠিয়েছি বিয়ে করতে।

এসব কথা মনের মাঝে বেজে উঠলেও বিহ্বল করে দিতে পারে না। কিন্তু

www.pathagar.com

একটি জায়গায় আমি অপরাধী রয়ে গেছি। একটি কোমল প্রাণে আমি যে ব্যথা দিয়েছি সে শুধু করুণই নয়, নির্মমও বটে। কৈশোর থেকে একটানা একটা ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে আমার জীবন বয়ে চলেছে। আর দশটি যুবকের মত প্রেম-ভালাবাসা নিয়ে বিলাসিতা করার সময়-সুযোগ কখনো হয়ে ওঠেনি। কোন কোন সময় ভিন্ন দিক থেকে আহ্বান এসেছে, হয়ত দূর থেকে তা উপলব্ধি করতে পেরেছি। কাছে গিয়ে স্বাদ-গন্ধ সম্যক উপলব্ধি করার স্পৃহা জেগে ওঠেনি। অভিজ্ঞতা হয়েছে – একতরফা কোন জিনিসই বেশি দিন চলতে পারে না।

কিন্তু মিরানা আমার সে ধারণা ভেঙ্গে দিল। বছর তিনেক পূর্বে সে আমায় আবিষ্কার করল আর খোদাই জানেন কি দেখে সে মজল। সপ্তদর্শী সুন্দরী মিরানা পণ করল জয়ী সে হবেই। ওর বালিকাসুলভ কাণ্ডকারখানা দেখে মনে মনে হাসতাম। হয়ত বা মনের অজান্তে কিছুটা প্রশ্রয়ও দিয়ে থাকব। ও কি বুঝল ওই জানে আর জানেন ওর সৃষ্টিকর্তা – ও মেতে উঠল।

ছাত্রজীবন শেষ করে তখন মাত্র কর্ম জীবনে প্রবেশ করেছি। ওদের পাশের বাসায় দুটো ঘর ভাড়া নিয়ে থাকি। অন্দর থেকে উভয় বাড়িতে যাতায়াত করা যায়। ওদের বাসার সকলেই আমাকে নামে চিনতেন। কেননা ওর একটি ভাই ছাত্রলীগ করত এবং আমার একজন প্রথম শ্রেণীর ভক্ত ছিল। অচিরেই ওদের বাসায় আমি ঘরের ছেলে হয়ে উঠলাম। ওর ভাইবোনেরা সব সময় আমার কাছে আসত, একটা স্নেহের বন্ধনে জড়িয়ে পড়লাম। বড় ভাল লাগল একটি পরিচ্ছন্ন শিক্ষিত পরিবারের মার্জিত রুচির আস্বাদ পেয়ে। ওর অন্য ভাই-বোনদের সাথে ওকেও আমি একই চোখে দেখতে চেষ্টা করলাম। প্রখর বুদ্ধিমতী মেয়ে মিরানা বুঝতে পারল সোজা পথে চলবে না। তখন সে ভিন্নতর পথে নূতন পরিকল্পনা নিয়ে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হল।

হয়ত বা পিতামাতার সম্মতি ছিল, ও আমার ঘরে আসতে শুরু করে দিল। আমার অগোছাল ঘরের প্রতটি জিনিসপত্র গুছিয়ে দিতে লাগল। নিজেদের বাসার চাকর দিয়ে প্রায়ই ঘরে ঝাট দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দিতে থাকল। জামা-কাপড় গুছিয়ে বই-পত্র সাজিয়ে আমার ঘরটিকে সুন্দর করে তুলল। ওর কল্যাণ স্পর্শে আমার ঘরের ছন্নছাড়া ভাব অনেকটা কেটে উঠল। হয়তবা প্রশংসা করে থাকব, হয়তবা আনন্দ প্রকাশ করে থাকব – মিরানা মিষ্টি হেসে যেন নিজের ঘরের কাজ করছে এমনি ভাবে নীরবে প্রতিদিন আমার কাজ করে যেতে লাগল। নিজের চেষ্টায় একটা চাকর নিযুক্ত করে

www.pathagar.com

আমার হোটেলে খাওয়ার পাট চুকিয়ে দিল। খাওয়ার টেবিলে পঞ্চব্যঞ্জনের সমাবেশ দেখেই বুঝতে পারি – এর পেছনে কার সযত্ন হস্ত কাজ করছে। বুঝতে পেরেও না বোঝার ভান করি। মনে মনে তৃপ্তিও লাভ করি।

আমি নিজেই টের পেলাম না কখন থেকে আমি মিরানার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। জামা-কাপড় ধোপার বাড়ি দেওয়া থেকে শুরু করে কখন কোন ফাঁকে আমার টাকা-পয়সাও ওর হাতে পৌঁছে গিয়েছে। ওর সেবা পেয়েই যেন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। দুদিন মিরানা আত্মীয়দের বাড়ি গেলে আমি অসহায় হয়ে পড়ি। ওর ছোট বোনরা ওকে আমার 'গার্জেন' বলে ডাকে।

কিছুদিন পর আমাকে সরকারের এই অতিথিশালায় নিয়ে আসা হয়। ওদের সম্পূর্ণ পরিবার আমার সঙ্গে দেখা করতে এল জেলখানায়। বিদায় নেওয়ার সময় সকলের সামনেই ও আমার দুটি হাত চেপে ধরে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। সেদিনই আমি বুঝতে পারলাম মিরানার হৃদয়ে আমার স্থান কোথায়। মনের মধ্যে সেদিন থেকে তীব্র অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলাম। নিশ্চয়ই আমার দুর্বলতা ছিল। নিশ্চয়ই আমি আমার ব্যবহারে ওকে উৎসাহিত করে থাকব। নিজেকে ক্ষমার অযোগ্য মনে হল।

আমিতো জানি, আমার জীবনে শান্তি এবং স্বস্তির সম্ভাবনা কত কম। হয়ত সারা জীবনই আমাকে কারাগারের অন্তরালে কাটিয়ে দিতে হবে, হয়ত জীবনে কোনদিন সুখ-সমৃদ্ধির ছোঁয়া আসবে না। নিঃসীম অন্ধকারে দুঃখ-দারিদ্র্যের মাঝেই হয়ত আমার জীবনাবসান হবে। সুখ ও ঐশ্বর্যের মধ্যে ওকে নিয়ে শান্তির নীড় রচনা করার মসৃণ পথে জীবনকে পরিচালিত করিনি। কণ্টকময় দুরূহ জীবন-পথেই আমার যাত্রা। সেখানে মিরানার মত সুখ-পালিতা, কোমলতা ও ঐশ্বর্যের মেয়ের স্থান হতে পারে না। মিরানাকে ফিরিয়ে দিতেই হবে। যত বড় আঘাতই সে পাক, ওরই মঙ্গলের জন্য ওকে সরিয়ে দিতে হবে। আমার মত দুরূহ পথের যাত্রী ওর জীবন সঙ্গী হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য।

স্থির করলাম জেল থেকে বেরিয়ে ওকে সব কথা খুলে বলে ওর কাছে ক্ষমা চাইব। করলামও তাই। অল্প দিনেই সেবার মুক্তি পেয়ে গেলাম। এক নিরালা মুহূর্তে ওকে সব খুলে বললাম। সব শুনে ওর বড় বড় চোখের তারা দুটো জ্বলে উঠল। স্থির পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে ও বলল, আজ নির্লজ্জের মতই বলছি – জীবনে আর কাউকে আমি চাইনি, তোমাকেই

www.pathagar.com

চেয়েছি, বিশ্বাস আছে তোমাকেই আমি পাব। তা যদি না পাই অন্য কাউকে আমার জীবনে প্রয়োজন নেই।

এই প্রথম ও আমাকে তুমি বলে সম্বোধন করল। কথাগুলি বলেই ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বের হয়ে গেল – আমার শত ডাকাডাকিতেও আর ফিরে এল না। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এর পর যে কদিন ওখানে ছিলাম ও আমার সামনে আসত না কিন্তু আমার প্রতিটি প্রয়োজনের উপর কড়া দৃষ্টি রাখত। চাকর এবং ওর ছোট বোনদের সাহায্যে আমার প্রত্যেকটি কাজ আড়াল থেকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করে দিত।

চাকর ছেলেটির কাছে শুনলাম, আমি কোর্টে চলে গেলে মিরানা ঘরে ঢুকে আমার সব কাজকর্ম করে দিয়ে চলে যায়। ইদানিং কলেজে যাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছে।

মন অস্বস্তিতে ছেয়ে গেল। ভাবলাম, এ অধ্যায় এখানেই শেষ করব। চলে যাব এখান থেকে চিরদিনের মত।

সে বাসা ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে এলাম। আসার সময় সকলের মাঝেই ওর কাছে থেকে বিদায় নিলাম। দেখলাম, ওর চোখের তারা দুটো আজ আরও প্রখর হয়ে জ্বলছে।

প্রায় তিন বৎসর কেটে গেল – মিরানা কিছুতেই বিয়েতে মত দেয় না। ওর বাবা অনেক যোগ্যতর পাত্র যোগাড় করেন – ওর মত মেয়ের জন্য পাত্রের অভাব হয় না। কিন্তু মিরানাকে কিছুতেই রাজি করানো যায় না। কয়েকবার ওদের ওখানে গিয়ে ওকে বোঝাতে চেয়েছি। আমার কথায় কর্ণপাত না করে ও উঠে চলে গেছে। একটি কথাও বলেনি। প্রতিবারই ওর চোখের তারা দুটো জ্বলতে দেখেছি।

এবার গ্রেপ্তার হওয়ার আগের দিন ও আমাকে ওর জীবনের প্রথম এবং হয়ত বা শেষ চিঠি লেখে। সংক্ষিপ্ত সেই চিঠিতে ও লিখেছিল, ... কী অপরাধ আমি করেছি, তার কৈফিয়ৎ দাও। আমাকে ব্যর্থ করে দিয়ে কোনদিনই তুমি সুখী হতে পারবে না ...।

এ চিঠি লেখার সময় নিশ্চয়ই এবার ওর চোখের তারা দুটো জ্বলে ওঠেনি। হয়ত অশ্রুবাষ্পে সে দুটো ছেয়ে উঠেছিল।

ওর ছোট বোন রুবিনা বেশ বড় হয়ে উঠেছে। ওরও বিয়ের সময় হয়ে

www.pathagar.com

এল। কিন্তু বড়কে বাদ দিয়ে ছোটর বিয়ে বাপ-মা দেবেন না। রুবিনার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে ওদের এক দূর সম্পর্কের ফুফাত ভাইয়ের সঙ্গে। কিন্তু মিরানা বিয়েতে কিছুতেই রাজী হচ্ছে না। রুবিনা অধৈর্য হয়ে উঠেছে। প্রায়ই কারণে-অকারণে বড় বোনের সঙ্গে ঝগড়া করে। সবাই বুঝতে পারে ওর জ্বালা কোথায়।

এমনি পরিস্থিতির মাঝে আমি আবার গ্রেফতার হয়ে চলে এলাম। প্রায় বছর উত্তীর্ণ হতে চলল। মাস দুয়েক আগে একদিন মিরানা আর রুবিনা ওরা দুবোন দেখা করতে এসেছিল। মিরানা ওর হাতে-বোনা একটি সোয়েটার আর একরাশ সিগারেট নিয়ে এসেছিল আমার জন্য। স্তব্ধতার মধ্যেই সেদিনের দেখা সমাপ্ত হয়েছিল। মিরানা প্রায় কোন কথাই বলেনি। রুবিনা দুচারটি কথা বলতে চেষ্টা করেছিল। সময় হয়ে গেলে চলে যাওয়ার মুহূর্তে কেন জানি না দুজনই আমার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করল। এমন ত কোন দিন ওরা করেনি। কেন জানি না মনটা ব্যথায় ছেয়ে গেল।

এরপর ওদের আর খবর পাইনি। কিন্তু আমার মনে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছিলাম। মিরানাকে নিজের পাশে টেনে এনে ওর সুন্দর জীবন নষ্ট করে দেওয়ার কল্পনা আমার কাছে পীড়াদায়ক ছিল, অথচ কখন সেই মিরানাই আমার চিন্তাসঙ্গিনী হয়ে উঠল। জমাট বাঁধা মনটা দ্রবীভূত হতে লাগল।

শেষে মিরানাই আমায় রেহাই দিল। কাল রুবিনার চিঠি পেলাম। গত মাসের সতের তারিখে মিরানা আর রুবিনার একই সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে। মিরানার স্বামী একজন উর্ধ্বতন সরকারী কর্মচারী। সবারই আশা মিরানা সুখী হবে। রুবিনার চিঠিতেই ওরা ওদের দুবোনের নূতন জীবনে সার্থকতার জন্য আমার আশীর্বাদ চেয়ে পাঠিয়েছে।

আশীর্বাদ করার যোগ্যতা না থাকলেও প্রার্থনা করেছি আমার কাছ থেকে ও যে আঘাত পেল, সে আঘাত ভুলবার শক্তি যেন সে পায়। আমার অপরাধের শাস্তি শতবার হোক – কিন্তু মিরানা যেন সুখী হয়, ওর সুন্দর জীবন যেন সুন্দরতর হয়ে ওঠে।

যা চেয়েছিলাম তাই ত হল। তবুও কেন অন্তর বার বার হাহাকার করে উঠছে। সমস্ত হৃদয় জুড়ে সব হারানোর ব্যথা বার বার গুমরে উঠছে। এই বুঝি পৃথিবীর নিয়ম। যখন দুহাত ভরে পেয়েছি তখন তার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারিনি। যখন হাত শূন্য হয়ে গেল তখন না পাওয়ার ব্যথা

www.pathagar.com

বুঝতে পারছি।

বার বার শুধু একটা কথাই ভাবি। কি মন্ত্রবলে মিরানার মত জেদী মেয়ে আত্মসমর্পণ করল। কি করেছিলেন ওর বাবা মা জানি না। কি সে কারণ যা মিরানাকে টলিয়েছে বুঝে উঠতে পারি না। কিন্তু শুধু এটুকু বুঝি কম ব্যথায়, সামান্য কারণে মিরানা তার দীর্ঘদিনের আঁকড়ে থাকা সিদ্ধান্ত বদলায়নি। এ ভেবেই সান্ত্বনা খুঁজি – মিরানা এবারই সত্যিকারের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে – অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ পশ্চাতে ফেলে রেখে আলোর পথে পা বাড়িয়েছে। এবার হয়ত আলোয় আলোময় হয়ে উঠবে আলোর মেয়ে মিরানার জীবন।

কয়েদ খানায় পুরেই ওরা ক্ষান্ত হয়নি। অনেকগুলো মামলাও দায়ের করেছে আমাদের কয়েকজনের নামে। মুজিব ভাইয়ের নামে মামলা দিয়েছে অগণিত। তার মামলা জেলখানার মধ্যেই বিশেষ আদালত গঠন করে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিপদ হয়েছে আমাদের। প্রতি সপ্তাহেই কোর্টে যেতে হয়। আদালত কক্ষ পর্যন্ত খুব কম দিনই নেওয়া হয়। সারাটি দিন আমাদেরকে কোর্ট হাজতের নারকীয় পরিবেশে অভুক্ত অস্নাত রেখে সন্ধ্যায় পুনরায় জেলখনায় ফিরিয়ে আনা হয়।

ওখানকার পরিবেশ শুধু যে অস্বাস্থ্যকর তা নয় – প্রাণান্তকরও বটে। কয়েকশত হাজতীকে গুদামজাত করা হয় কোর্ট হাজতের অপ্রশস্ত গোটা তিনেক ঘরের মধ্যে। প্রস্রাব পায়খানার গন্ধে নাড়িভুড়ি বের হয়ে আসে। কফ, কাশি আর পানের পিকে সমস্ত জায়গাটি নোংরা হয়ে থাকে। ওরই মধ্যে মাছের কাঁটা, মাংসের হাড় আর কলার খোসা স্তূপ হয়ে আছে। হাজতীদের লোকজন মুহুরী টাউট আর পুলিশের চিৎকার গালাগালিতে সমগ্র পরিবেশটা নারকীয় রূপ লাভ করে ; এমনি জায়গায় আমাদের সারাটি দিন রাখা হয়। চোখের সামনে দেখতে পাই নির্লজ্জ জবরদস্তিতে হাজতীদের সাথে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের কাছ থেকে এক টাকা দু টাকা আদায় হচ্ছে। আমাদের সামনে ওরা একটু অস্বস্তি বোধ করে – তাই নিজেরাই মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে না দেখার ভান করি।

www.pathagar.com

সেদিন কোর্ট থেকে প্রচণ্ড মাথা ধরা নিয়ে ফিরেই ওবায়েদ বলল, ওরা জেল ফাঁসী যাই দিক আমি আর কোর্টে যাব না।

ওকে বুঝিয়ে বলি, কোর্টে না গেলে শেষ পর্যন্ত আমাদেরই দুর্গতি। বছরের পর বছর ওরা মামলা ঝুলিয়ে রাখবে। তার চাইতে শীঘ্র নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়াটাই ভাল।

সমস্যাটা উপলব্ধি করে ও সহজেই শান্ত হয়ে ওঠে।

ওবায়েদ আমার দীর্ঘদিনের সহকর্মী। ছাত্রলীগের সম্মেলনে গোপালগঞ্জ গিয়েছিলাম ১৯৫৮ সালের প্রথম দিকে। সেখানেই ওর সাথে প্রথম পরিচয়। ও তখন ফরিদপুর জেলা ছাত্রলীগের সম্পাদক। সদা ব্যস্ত, কর্মঠ এবং আন্তরিকতা ভরা ছেলেটিকে তখনই আমার ভাল লেগে যায়।

পরবর্তীকালে ওবায়েদ ঢাকায় এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে অল্প দিনের মধ্যেই আমার একজন বিশ্বস্ত সহকর্মী হয়ে ওঠে। সেদিন থেকে প্রতিটি ছাত্র আন্দোলনে ওকে প্রথম কাতারে দেখা যেত। আমি ছাত্রলীগের সভাপতি থাকাকালীন ওবায়েদকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়েছিল। সে সময় ওবায়েদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংস্থার সাধারণ সম্পাদকও নির্বাচিত হয়। ১৯৬২ এবং ১৯৬৪ সালে একই সাথে আমরা জেল জীবন অতিবাহিত করি। ওবায়েদ আমার ছোট ভাইয়ের মত। প্রতিবারই জেলখানায় ও আমার পাশাপাশি থাকে। এবারও একই ঘরে আস্তানা গেড়েছি।

জেলখানায় ওর কাজ প্রচুর খাওয়া, প্রচুর ঘুমানো আর প্রচুরতর তাস খেলা। ব্রীজের একটি পোকা ও। প্রায়ই আমাকে টানাটানি করে ব্রীজ খেলায় যোগ দেওয়া জন্য। খাওয়া ঘুম সম্বন্ধে কোন কথা বললেই বিপ্লবীদের কথার প্রতিধ্বনি করে ওবায়েদও বলে ওঠে, যখনই সুযোগ আসবে তখনই পেট পুরে খেয়ে একটানা ঘুমিয়ে নেওয়া ভাল – কেননা কখন আবার খাওয়া ঘুম জুটবে তা কেউ বলতে পারে না। বাকীর খাতা শূন্য পড়ে থাক, নগদ যা পাচ্ছি হাত পেতে নিই।

মামা চেয়েছিলেন ভাল ছাত্রের মত লেখাপড়া শেষ করে তাদের মুখ উজ্জ্বল করব। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে হয়ে উঠলাম একজন জেলবার্ড। মামার স্নেহ তার জন্য কমে যায়নি। কিন্তু দেখা করতে এসেই এক চোট বকাঝকা করবেন।

www.pathagar.com

সেদিন বড়দা, মফিদা ও ভাবী এসেছেন শামীম কাকলিলে নিয়ে। ফনুও এসেছে পারভেজ পপিকে নিয়ে। ইন্টারভিউ চলাকালীনই হন্তদন্ত হয়ে মামা ঢুকলেন, তার দেরী হয়ে গেছে। এসেই রুটিন মত শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞেস করে তার পেটেন্ট করা তিরস্কার শুরু করে দিলেন। হাসিমুখে নীরব হয়ে রইলাম। জানি, দুই মিনিটের মধ্যে তিনি একেবারে চুপ করে যাবেন। প্রশ্ন করলেও হুঁ হাঁ ছাড়া আর কোন জবাব দেবেন না।

একটু পরেই মামা চুপ করলেন। যে আই. বি. অফিসারটি ইন্টারভিউ করাতে এসেছিল সে লোকটি একটু ভাল মানুষ গোছের। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই সে মামাকে বোধ হয় সান্ত্বনা দিতে চাচ্ছিল।

মামা হঠাৎ ফেটে পড়লেন, আপনারা ভেবেছেন কি সাহেব? ওকে কতদিন জেলে আটকে রাখতে পারবেন আপনারা? ভেবেছেন আমরা অস্থির হয়ে উঠেছি, না? মোটেই তা ভাববেন না। ও যখন এতটুকু ছেলে, মাত্র সেকেন্ড ক্লাশে পড়ে তখন থেকে ও জেল খাটছে। তখনই আমরা ঘাবড়াইনি। আজ ও বড় হয়েছে, এডভোকেট হয়েছে। এখন জেল খাটলে আমরা অস্থির হয়ে যাব? বলে দেবেন আপনার মোনায়েম খা আর আইয়ুব খাকে আমার ভাগ্নে যদি না পারে, আমার পাঁচটি ছেলে রয়েছে, তাদের ঢুকিয়ে দেব জেলখানায়। দেখি ওরা কত জেল খাটাতে পারে।

বেচারা আই. বি অফিসারটি ত হতবাক। সান্ত্বনা দিতে গিয়ে একি বিপাকে পড়ল সে।

অতিকষ্টে মামাকে শান্ত করে অফিসারটিকে বুঝিয়ে বললাম। স্নেহান্ধ মামার দুর্বলতাটি টের পেয়ে ভদ্রলোক সহানুভূতিশীল হয়ে উঠল।

বিদায় বেলায় ফনুকে নিয়ে এক মুস্কিল। পাঁচটি সন্তানের মা হয়েও আমাকে জড়িয়ে ধরে আকুল কান্না। ওর কান্না দেখলে আমারও মন খারাপ হয়ে যায়। ভাবীকে তাই বলে দিলাম, এর পর দেখা করতে আসার সময় বড়দা যেন ওকে না নিয়ে আসেন। শৈশবে মাতৃহারা এতটুকু বোনটিকে আমরা দুভাই একটু বেশি আদর যত্নেই বড় করে তুলেছি। ওকে না দেখে হয়ত থাকতে পারব কিন্তু ওর চোখের পানি কিছুতেই সহ্য হবে না।

আজ যখন কারাগারে নিরবচ্ছিন্ন অবসরের মধ্যে জীবনের ফেলে আসা দিনগুলির দিকে তাকাই তখন নিজেই অবাক হয়ে যাই। ঝড়ের রাতে তরঙ্গ-

www.pathagar.com

সংকুল সাগর সৈকতের মত জীবনের দিনগুলি অতিবাহিত করে এলাম। সান্ত্বনা এই, কর্মহীন নিরলস মুহূর্ত খুব কমই কাটিয়েছি। একটানা একটা কর্মপ্রবাহের মধ্যে কেটেছে কৈশোর এবং যৌবনের দিনগুলো। আর পাঁচটি ছেলের মত কলেজে ঢুকে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ছাত্র আন্দোলন ও সংগঠনের কাজে যোগ দিইনি। স্কুল জীবনেই আমার হাতে খড়ি হয়েছিল। সে সময়ের ছাত্র সমাজের দ্বারা পরিচালিত ভাষা আন্দোলনই প্রথম আমাকে এ পথে টেনে আনে। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র হয়েও এ কথাটা মনে খুব বাজত, আমাদের অধিকাংশের মাতৃভাষা কেন রাষ্ট্রের সরকারী ভাষার মর্যাদা পাবে না। নিজেকে আন্দোলনকারীদের মধ্যে ভাবতে আনন্দ পেতাম। ভাষার দাবীতে স্কুলে ধর্মঘট করার আহ্বান এলে উৎসাহিত হয়ে উঠতাম। কোমর বেঁধে দলবল জুটিয়ে ক্লাস বর্জন করে রাস্তায় বেরিয়ে আসতাম। সকলের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে চিৎকার করে উঠতাম, বাংলা ভাষার স্বীকৃতি দিতে হবে।

এমনি এক মিছিলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উঁচু ক্লাশের একজন ছাত্র আমার কাঁধে হাত রেখে সস্নেহে জিজ্ঞাস করলেন, খোকা, তুমি কোন স্কুলে পড়?

স্কুলের নাম বললাম।

শুনে তার মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল। কোন ক্লাশে পড়ি এবং কি নাম তাও জেনে নিলেন। পকেট থেকে ছোট্ট একটি খাতা বের করে সব লিখে নিলেন।

আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার কি নাম?

তিনি হেসে জবাব দিলেন, আমার নাম আউয়াল। একদিন তোমাদের স্কুলে যাব – তোমার সাথে কথা আছে।

ভেবে পেলাম না আমার মত একটি স্কুল ছাত্রের কাছে তার কি প্রয়োজন থাকতে পারে। কিন্তু তার সস্নেহ কণ্ঠ এবং বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা ততক্ষণে আমাকে আকৃষ্ট করে ফেলেছে। আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিতেই তিনি হন হন করে মিছিলের সম্মুখ দিকে এগিয়ে গেলেন।

অচিরেই তার পরিচয় পেলাম। ছাত্র সমাজের চিন্তা নায়ক এম. এ. আউয়ালকে ছাত্ররা আউয়াল ভাই বলেই ডাকে।

কয়েকদিনের মধ্যেই আউয়াল ভাই আমাদের স্কুলে এলেন। আমাদের হেড

www.pathagar.com

মাস্টার ব্রাদার জেমসের সঙ্গে দেখা করে আমার সঙ্গে কথা বলার অনুমতি নিলেন। ভিজিটার্স রুমে আউয়াল ভাইয়ের সাথে দেখা হল। তার সঙ্গে আরও একজন ছিলেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন, ইনি ছাত্রনেতা ওয়াদুদ সাহেব। তোমার সাথে পরিচিত হতে এসেছেন।

ওয়াদুদ ভাই আমাকে সস্নেহ আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে বললেন, তোমার কথা আউয়াল সাহেবের কাছে শুনেছি। তোমাকে আমরা চাই।

ঘণ্টা খানেক আলাপ-আলোচনা করে তারা বিদায় নিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই আমি তাদের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে গিয়েছি – তাদের কাছে কথা দিয়েছি ছাত্র সমাজের সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান ছাত্রলীগে যোগ দিয়ে ছাত্র আন্দোলনের কাজ করব।

ছাত্রলীগের কাজ করতে গিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে যাদের সাহায্য, সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা লাভ করেছি তাদের মধ্যে রয়েছেন কামরুজ্জামান সাহেব, আবদুল মমিন তালুকদার, আহমেদ আলী, মিজানুর রহমান, মোশাররফ হোসেন, শহীউদ্দীন ইসকান্দার কচিভাই, সাখাওয়াত উল্লাহ, নুরুল ইসলাম, হারুণ-উর-রসীদ, সরদার ইমামউদ্দীন, রেজা কাদের, দেওয়ান শফিউল আলম, শামসুজ্জোহা খান, আবুল হোসেন, রেফাউল হক, গোলাম কুদ্দুস, ওয়াহেদউদ্দীন, ওয়াহিদুল ইসলাম, রিয়াজুল হক চৌধুরী প্রভৃতি ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ।

ছাত্রলীগের ইতিহাস এদেশের ছাত্র-সমাজের গৌরবদীপ্ত সংগ্রামেরই ইতিহাস। পাকভারত উপমহাদেশে যখন স্বাধীনতার সংগ্রাম দুর্বার হয়ে ওঠে, যখন বাংলাদেশের ছাত্র-যুবক-জনতা পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই মুহূর্তেই জন্ম নিয়েছিল নিখিল বংগ মুসলিম ছাত্রলীগ। দেশকে বিদেশি শাসকদের শোষণ মুক্ত করার পবিত্র দায়িত্ব সেদিন ছাত্র সমাজ অস্বীকার করতে পারেনি। ঘরে আগুন লাগলে যেমন করে অধ্যয়নরত ছাত্রও ঘর ছেড়ে বের হয়ে এসে অগ্নিনির্বাপণের আশু কর্তব্যে হাত দেয়, তেমনি সেদিনের ছাত্র সমাজ তাদের শিক্ষায়তন ছেড়ে রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছিল দেশ মাতৃকাকে বিদেশি শাসকের কবল মুক্ত করার শপথ নিয়ে। স্বাধীনতার সংগ্রামে তাদের সেদিনের অবদানকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। মুসলিম ছাত্রলীগের দান সেদিনের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের চাইতে কম ছিল না। দেশ নায়কেরাও সে কথা অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করেন।

www.pathagar.com

দেশ স্বাধীন হল। ছাত্র সমাজ ভাবল এবার তাদের শিক্ষায়তনে ফিরে যাওয়াই কর্তব্য। স্বাধীন দেশে গণপ্রতিধিরাই দেশকে শাসন করবেন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। দেশের বুকে থেকে অন্যায়, অনাচার দূর হয়ে যাবে। এক সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়ে উঠবে। সেই অনুকূল পরিবেশে ছাত্রসমাজ অধ্যয়নকেই তাদের তপস্যা করে নেবে। আগামী দিনের জন্য তারা নিজেদেরকে তৈরি করবে।

দেশ বিভাগের পর তাই ছাত্র সমাজ তাদের প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে দিয়েছিল। বৎসর খানেক তারা নীরবে দেশের গতিধারা লক্ষ্য করল। তারা দেখতে পেল এক অশুভ শক্তি পাকিস্তানের শাসন দণ্ডকে হস্তায়িত করছে। দেশের মানুষকে স্বাধীনতার পূর্বে যে সব গালভরা প্রতিশ্রুতি নেতৃবৃন্দ দিয়েছিলেন তার থেকে দ্রুত বিচ্যুত হয়ে পড়ছেন। সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কোন প্রতিকার হওয়ার সম্ভাবনা দেখা গেল না। দেশের নতুন কর্মকর্তারা জনগণের সুখ-সমৃদ্ধির কথা বেমালুম ভুলে বাড়ি গাড়ি ও পদোন্নতির চিন্তায় মেতে উঠলেন। যে পিতা স্বাধীনতার মধ্যে তার পুত্রের সুশিক্ষার স্বপ্ন দেখেছিলেন, যে মাতা তার রুগ্ন সন্তানের চিকিৎসার সম্ভাবনায় আশান্বিত হয়ে উঠেছিলেন, যে পরিবার স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর হয়ে মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের সুখ চিন্তায় নিশ্চিত হয়েছিলেন, তারা হতাশ হয়ে দেখলেন তাদের ত কোন পরিবর্তন এল না স্বাধীনতার জুড়ি-গাড়ি চড়ে। শ্বেত চর্মের প্রস্থান হল সত্যই কিন্তু তার স্থান জুড়ে বসল আর এক বাদামী চর্ম। কালো চামড়ার মানুষগুলো হতাশায় মূহ্যমান হয়ে ভাগ্য দেবতাকেই দোষারোপ করতে লাগল। স্বাধীনতার কোন অর্থই তারা খুঁজে পেল না তাদের জীবনে।

শুধু তাই নয়, কালো চামড়ার মানুষগুলোর উপর আরও মর্মান্তিক আঘাত নেমে এল। সে এমনি আঘাত যা সারা বিশ্বের মানুষকে হতবাক করে দিল। দেশের শতকরা পঁয়ষট্টি জন লোকের মুখের ভাষাকে বাদ দিয়ে সরকার সামান্য কয়েকজন অধিবাসীর ভাষা উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা করার এক হীন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠল।

এ ষড়ন্ত্রের মূল সুদূর প্রসারী। একটা অবাস্তব ভৌগোলিক অবস্থানে পাকিস্তান গঠিত। দুই প্রান্তে দুইটি অঞ্চল – মধ্যে দেড় সহস্র মাইল ভারতীয় ভূখণ্ড। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকেই পশ্চিমা ধনবাদীদের ক্রীড়নক এক শ্রেণীর শাসক চাইল পূর্ব পাকিস্তানকে ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে পংগু করে পশ্চিমাঞ্চলের উপর পরিপূর্ণ নির্ভরশীল

www.pathagar.com

করে ফেলতে। তাই প্রথমেই ওদের দৃষ্টি পড়ল এদেশের মানুষের ভাষার উপর।

ওরা জানে বাঙালী অন্তত শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে ওদের চাইতে অগ্রণী। পাক-ভারত উপমহাদেশে একথা প্রবাদ হিসেবেই স্বীকৃত – বাঙালী যা আজ চিন্তা করে অন্যরা তা দুদিন পরে চিন্তা করে। চিন্তার ক্ষেত্রে বাঙালীর এই অগ্রগতি ওরা শুভদৃষ্টিতে দেখতে পারল না। ওদর প্রচেষ্টা চলতে লাগল বাঙালীকে কোন পন্থায় শীঘ্রই শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পর্যুদস্ত করা যাবে। ফলে আঘাত নেমে এল বাঙালীর ভাষার উপর।

একটা জাতিকে পরাধীন করে রেখে যদি কেউ তার উপর বাইরে থেকে নির্বিচার শাসন শোষণ চালিয়ে যেতে চায় তাহলে তার প্রথম কাজ হবে সে জাতির ভাষাকে কেড়ে নিয়ে তাকে শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মেরুদণ্ডহীন করে দেওয়া, কেননা বিশ্বের দরবারে একটা জাতির পরিচয় তার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের মাধ্যমে।

তাই বাংলা ভাষাভাষী পূর্ব পাকিস্তানীদের ভাষার উপরেই আঘাত হানল ওরা।

আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় যখন ভাবি ওরা এক নিঃশ্বাসে গণতন্ত্রের বুলি আওড়ায় আরেক নিঃশ্বাসে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীদের মুখের ভাষাকে কেড়ে নেওয়ার হীন ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। শুধু জনসংখ্যার আধিক্যের প্রশ্নই [illegible]রেও পাকিস্তানের মধ্যে বাংলার চাইতে শ্রেয়তর কোন ভাষা [illegible]ন কেন পাক-ভারত উপমহাদেশের মধ্যে বাংলা সর্বশ্রেষ্ঠ [illegible]গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ ভাষাতেই কবিতা লিখে বিশ্বের দরবার থেকে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ছিনিয়ে এনেছিলেন। কাজী নজরুলের মত বিদ্রোহী কবিও এ ভাষাতেই সাহিত্য চর্চা করেছেন। বাংলা উপমহাদেশের একটা প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী ভাষা।

সেই বাংলাকে বাদ দিয়ে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির মাথায় কুঠারাঘাত করে ওরা ঘোষণা করল উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে। যে স্থলে বাংলাই একমাত্র রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা পাওয়ার দাবী রাখে সে ক্ষেত্রে বাংলাকে ওরা অন্যতম রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদাও দিতে চাইল না।

পক্ষান্তরে উর্দু পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণেরও একমাত্র ভাষা নয়।

www.pathagar.com

ওখানে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত। ওখানকার অধিকাংশ অধিবাসী পশতু, সিন্ধী বেলুচ প্রভৃতি ভাষায় কথা বলে। এমতাবস্থায়ও বাঙালী তার স্বভাবসুলভ সহনশীলতায় এবং দেশের উভয় অংশের ভৌগোলিক প্রশ্ন বিবেচনা করে বাংলা ভাষার একক দাবী না জানিয়ে বাংলা এবং উর্দু উভয় ভাষাকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দানের প্রস্তাব করল।

সরাসরি ওরা এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করল। বাংলাদেশের চিরদিনের দুর্ভাগ্য এদেশের ঘরে ঘরে আজও বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের পেতাত্মা ঘুরে বেড়ায়। পদ আর অর্থের লোভ দেখিয়ে সহজেই এদেশ থেকে জাফর আলীর বংশধরদের হাত করে নেওয়া যায়। ওরাও এদেশ থেকেই শিখণ্ডি দাঁড় করালো। শিখণ্ডিরাও বলল, ইসলাম আর পাকিস্তানের স্বার্থে উর্দুকেই একমাত্র ভাষা করা উচিত।

বাঙালীর এই চরম দুর্দিনে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক দেশবাসীর স্বার্থ ও স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী ছাত্র সমাজ নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে পারল না। ওরা আবার নব উদ্যমে সংগ্রামের মশাল হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

নতুন করে জন্ম নিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ – যার ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে স্বাধীনতা পূর্বকালের শত সংগ্রামের সফলতার মাঝে।

সংগ্রামের শপথ নিয়ে সেদিন নতুন করে আবার সংগঠনের কাজ এগিয়ে চলল। সে সময়ের কাহিনী নিরবচ্ছিন্ন ত্যাগ ও দুঃখ-দুর্দশারই কাহিনী। শত অত্যাচার আর উৎপীড়ন জেল-জুলুম-শারীরিক নির্যাতন সহ্য করে সেদিনের ছাত্র সমাজ তাদের প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলল। শক্তিশালী সংগঠন ছাড়া আন্দোলন সাফল্যলাভ করতে পারে না। তাই সেদিন তারা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠানকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বর্জন করেছিল। শত অত্যাচারেও তারা ভেঙ্গে পড়েনি।

১৯৪৮ সালে সকল বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ হয়ে ছাত্রলীগ নূতন করে গড়ে উঠল। শুরু হল নির্যাতন আর জেল-জুলুমের অধ্যায়। কত ছেলে যে সেদিন শিক্ষায়তন থেকে বহিষ্কৃত হয়ে তাদের জীবনের উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে চিরতরে বিনষ্ট করে দিল, কত ছাত্র যে সেদিন বাড়ি থেকে বিতাড়িত হল, কত কর্মীকে যে সেদিন বছরের পর বছর কারাগারে অতিবাহিত করতে হল, তার সংখ্যা নেই।

www.pathagar.com

সেদিন আজকের মত পরিবেশ ছিল না। সেদিন সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলা ছিল ধর্ম, রাষ্ট্র এবং জনগণের বিরুদ্ধে কথা বলা। বাংলা ভাষার দাবী সেদিন ছিল বিদেশী পঞ্চম বাহিনীর দাবী। সম্ভব-অসম্ভব সর্বপ্রকার অপপ্রচারের মাধ্যমে সেদিন জনগণকেও সরকার সাফল্যের সাথে বিভ্রান্ত করতে পেরেছিল। ঢাকা শহরে এমন স্থানও ছিল, যেখানে হাতে বই দেখলে বা ছাত্র পরিচয় দিলে পঞ্চম বাহিনীর এজেন্ট হিসেবে তাদের ভাগ্যে উত্তম-মধ্যম প্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখা দিত।

এমনি পরিবেশে সেদিন ছাত্ররা তাদের সংগঠন এবং আন্দোলনের কাজ করে গেছেন। প্রতিকূল পরিস্থিতি বা অত্যাচার উৎপীড়ন তাদের দমন করতে পারেনি।

সেদিন ছাত্রলীগ ছাড়া এ দেশের বুকে অন্য কোন ছাত্র প্রতিষ্ঠান ছিল না। শুধু ছাত্র প্রতিষ্ঠানই বা কেন সেদিন অন্য কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এদেশে ছিল না। ছাত্রলীগের সেদিনের সংগঠকরা চিরদিন নমস্য হয়ে থাকবেন। সেই বিপদ-সঙ্কুল মুহূর্তে 'সংগঠন' গড়ে তোলা সামান্য ব্যাপার ছিল না। আজকের দিনে রাতারাতি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। অর্থের আনুকুল্যে আজকে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সহজতর কাজ। নিজের চোখেই দেখেছি, প্রচুর টাকা ব্যয় করে এক একটি প্রতিষ্ঠানকে গড়ে উঠতে।

আশ্বাসের কথা এইটুকু, এই সব প্রতিষ্ঠান দীর্ঘস্থায়ী হয় না। বেঁচে থাকলেও কংকাল ছাড়া ওর আর কিছু থাকে। না। দেখেছি, চা খাইয়ে কেউ কেউ দলে লোক ভিড়াচ্ছে। হয়ত ভিড়েছেও কেউ কেউ। পরদিনই অন্য কেউ তাকে ওভালটিন খাইয়ের নিজের দলে টেনে নিয়েছে। এ হতে বাধ্য। লোভের মধ্যে যার আগমন, বৃহত্তর লোভে তার নির্গমন। সেদিন যারা ছাত্রলীগকে গড়ে ছিলেন তাদের সম্মুখে কণ্টকময় দুরূহ পথের হাতছানি ছাড়া অন্য কোন আকর্ষণ ছিল না। ত্যাগ-তিতিক্ষার সুমহান পথেই তারা যাত্রা করেছিলেন। তাদের সেই যাত্রা যে ব্যর্থ হয়নি এ দেশের ইতিহাসই তার সাক্ষ্য বহন করছে।

পরবর্তী ইতিহাস দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস। যার পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটলো ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারির রক্তক্ষয়ী ঘটনার মধ্য দিয়ে। ১৯৪৮ থেকে শুরু করে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ছাত্র সমাজ ত্যাগ ও তিতিক্ষার মাধ্যমে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের আবালবৃদ্ধবনিতাকে সংগ্রামমুখী করে তুলেছিল। ফেব্রুয়ারির

www.pathagar.com

আত্মদানের মাধ্যমে ভাষার দাবীকে তারা রক্তের অক্ষরে ইতিহাসের বুকে লিখে দিল। সমগ্র জাতি সে রক্তপাতের আহ্বানে সাড়া দিল। রক্ত দান কোনদিন ব্যর্থ হয় না। পৃথিবীর ইতিহাস এ কথা বার বার সাক্ষ্য দেয়, কোন মহৎ কাজও রক্তদান ছাড়া সংঘটিত হয় না।

বাহান্নর বরকত সালামেরাও নিজেদের বুকের উষ্ণ রক্ত ঢেলে দিয়ে ভষার দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করে গেলেন। স্বৈরাচারের হীন ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেল। ছাপ্পান্ন সালে গণপরিষদ বাংলার দাবীকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হল। এদেশের বুকে গণসংগ্রামের প্রথম বিজয় সূচিত হল।

ফেব্রুয়ারির সেই আত্মত্যাগ সমগ্র জাতির চোখ খুলে দিল। একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস বাঙালীর কাছে কেবল একটি আনুষ্ঠানিক দিন নয়। এ দেশের মানুষের কাছে সে দিনটি অনন্ত প্রেরণার উষ্ণ প্রস্রবণ। এদেশের মানুষের সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক চিন্তাধারায় এক বিপ্লব সাধিত হল একুশে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে। এতদিনের ঘুমিয়ে থাকা মানুষেরা জেগে উঠল। প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জোয়ার এল দেশের আনাচে-কানাচে।

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসকেই ছাত্রলীগের ইতিহাস বলা যায়। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত দেশের বুকে অন্য কোন প্রতিনিধিত্বশীল ছাত্র প্রতিষ্ঠান জন্মগ্রহণ করেনি। ছাত্রলীগই এককভাবে সে আন্দোলনে ছাত্রসমাজের নেতৃত্ব দিয়েছিল। সে সময় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, খেলাফতে রব্বানী পার্টি, তমদ্দুন মজলিস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানও ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিল।

১৯৫২ সালের শেষের দিকে ছাত্রলীগের একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে ছাত্র ইউনয়ন প্রতিষ্ঠানে রূপলাভ করল। কিছুটা মতানৈক্য ও কিছুটা নেতৃত্বের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে সেদিনের ঐক্যবদ্ধ ছাত্র সমাজের মধ্যে প্রথম অনৈক্যের বীজ রোপিত হল। পরবর্তীকালে এদেশে আরও কতিপয় ছাত্র প্রতিষ্ঠান জন্ম নিয়েছে। ছাত্রসমাজ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভক্ত হয়ে স্বভাবতই সংগ্রামের ক্ষেত্রে সেদিনের তুলনায় দুর্বল হয়ে গিয়েছে। পরবর্তীকালে ছাত্র ইউনয়ন, ছাত্রশক্তি এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে অবশ্য প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে। বাহান্ন উত্তর কালে ছাত্রলীগের সঙ্গে মিলিত হয়ে ছাত্র ইউনিয়ন এবং পরে ছাত্রশক্তি সংগ্রামের বাভাকে উচ্চে তুলে ধরেছে।

www.pathagar.com

সেলের বাইরে ফাল্গুনের প্রথম বর্ষণ অঝোর ধারায় ঝরে পড়ছে। ভিতরে বসে আমি জীবনের কর্মমুখের সেই সব সোনালী দিনগুলির শত স্মৃতির মাঝে হারিয়ে গিয়েছি। আন্দোলনমুখর সেই সব দিনগুলোর সহস্র ঘটনা আর প্রায় বিস্মৃত হয়ে আসা সহকর্মী বন্ধুদের প্রতিভাদীপ্ত মুখচ্ছবি আমার মানসপটে ভেসে ওঠে। নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, রফিকুল আনোয়ার সিদ্দিকী, আমির হোসেন আমু, মোস্তাহিদ আলী, সৈয়দ আহমদ, আবুল বাশার মৃধা, সুলতান শরীফ, আমিনুল হক বাদশা, আবদুর রউফ চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক, শহীদুল হক মুনসী, শাহ আতিয়ার রহমান, আছমত আলী সিকদার, সওগাতুল আলম ছগীর, এনায়েতুর রহমান, আবদুল ওয়াজেদ, আমানউল্লাহ খান, সিরাজুল ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান পটল, সিরাজুল ইসলাম সুরুজ, মুরীদুল আলম, আহমেদ রফিক ফেরদৌস কোরেশী, আবদুল মান্নান, আবু হেনা, দেওয়ান নুরুল হোসেন চঞ্চল, লতিফ সিদ্দিকী, ফজলুর রহমান ফারুক, মনিরুল ইসলাম, মজহারুল হক বাকী, মোতাহের হোসেন, মোহাম্মদ হুমায়ুন, ওয়াহিদুর রশিদ মুরাদ, জিয়াউল হক, কাজী আরিফ, রফিকুল করিম বিল্টু, সায়েদুর রহমান, সৈয়দ আকবর হোসেন, এ, কে, মজিবুর রহমান, আনিস, আবদুল আজিজ বাগমার, লুৎফুল হাই সাচ্চু, শামসুল আলম দুদু, খন্দকার মাহবুব হোসেন, আনোয়ার হোসেন আনু, ফজলুল হক, ওয়াজিউল্লাহ, শামসুল আলম, আতাউর রহমান, শাহ আজিজুর রহমান, আজিজুল ইসলাম খান, মীর্জা আজিজ, ইলিয়াস আহমেদ, আপেল মাহমুদ, বাতেন, রিয়াজ, কাশেম, মকবুল, জাহানারা, সুধীর হাজরা মফিজুর রহমান, চুন্নু, এন্তাজ আলী, আবদুর রব, আবদুল জলিল, এসহাক তালুকদার, শেখ হায়দার আলী, কলিমুর রহমান, খালেদ মোহাম্মদ আলী, সোলেমান মণ্ডল, ইয়াকুব, নুরুজ্জামান, আবুল কালাম, কাজী মাহবুবু, রবিউল আলম, মাহফুজ, মাহমুদ, আল মুজাহিদী, শওকত, ফজলুল করিম মিঠু, গাউস কুতুব, শামসুজ্জামান খান, রাজিউদ্দিন আহমেদ, কাজী সৈয়দ আহমদ খান, আলী তারেক, ফিরোজ নুন, বাবর, মাসুদুর রহমান, শফিউল আলম, সৈয়দ নজমুল হক, হুমায়ুন কবির শেলী, মোস্তফা, রফিকউল্লাহ, আবদুল বারেক, এ.কে.এম. আনোয়ার, কাজী সোলেমান, শওকত আলী, ওয়ালিউল হক, শাহজাহান কবীর, আফজাল হোসেন ব্যাপারী, কামরুজ্জামান টুটু, এস. এম. আজিজুল হক, সৈয়দা শামসে আরা ইরানী, রিয়াসত মোল্লা, জোয়ারদার, আবদুল মান্নান খান, মোদাস্‌সের আলী – এমনি আরও অনেক সহকর্মী

www.pathagar.com

ভাইদের ছবি চোখের সামনে ভাসতে থাকে। ফেলে আসা দিনগুলার পর্যালোচনায় নিবিড় আনন্দ লাভ করি।

স্কুল জীবন শেষ করে কলেজের আঙ্গিনায় এসে দাঁড়িয়েছি। ছাত্র আন্দোলন আর সংগঠনের কাজে তখন অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছি। কয়েকবার কারা জীবনের আস্বাদও সে সময়ের মধ্যে পেয়ে গিয়েছি।

আমাদের সংগ্রাম সে সময় মূলতঃ যে সব সমস্যার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হচ্ছিল তার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন, অর্থনৈতিক শোষণ-মুক্তি এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলনের দাবীই প্রাধান্য লাভ করেছিল। সরকারের দফতরে আমাদের দাবী আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি না পেলেও নীতিগতভাবে তা গৃহীত হতে চলছিল।

সময়ের এমনি সন্ধিক্ষণে ১৯৫৮ সালে এদেশের বুকে গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করে সামরিক শাসন জারি হল। দেশের সর্বময় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে বসলেন আইয়ুব খান। নূতন শাসনকর্তারা ঘোষণা করলেন দেশের বুক থেকে রাজনীতিকদের 'কুশাসনে' সৃষ্ট প্রত্যেকটি সমস্যার আশু সমাধান করবেন। দেশের মানুষকে শোষণের যাঁতাকল থেকে উদ্ধার করবেন। মানুষের ঘরে ঘরে সুখ ও শান্তির বন্যা বইয়ে দেবেন।

সঙ্গে সঙ্গে জনতার দুশমন আখ্যা দিয়ে কিছুসংখ্যক রাজনীতিককে কারাগারে নিক্ষেপ করা হল। সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বেআইনী ঘোষণা করে ভেঙ্গে দেওয়া হল। দেশের মধ্যে রাজনৈতিক কার্যক্রম অবৈধ ঘোষণা করা হল।

ছাত্র প্রতিষ্ঠানগুলিও রেহাই পেল না। আমাদের কার্যালয় তালাবদ্ধ করে সমস্ত কাগজপত্র বিনষ্ট করে দেওয়া হল। সমগ্র দেশের মধ্যে ভীতির রাজত্ব কায়েম হল। ক্ষমতার আসনে ওরা জাঁকিয়ে বসল।

সশ্রম কারাদণ্ড আর বেত মারার হুঙ্কার ছাড়া কথা নেই। কেউ কোন কথা বললে চৌদ্দ বৎসর, তার কথায় মাথা ঝাঁকালেও চৌদ্দ বৎসর।

সারা দেশ নিশ্চুপ হয়ে গেল।

দেশের মানুষও উত্তক্ত হয়ে উঠেছিল এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী রাজনীতিকদের মাত্রাহীন অনাচার দেখে। নিজেদের জীবনে তারা স্বাধীনতার ফলভোগ করতে পারেনি। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ছাড়া উন্নতি হয়নি।

www.pathagar.com

তাই দেশের মধ্য থেকেও সামরিক আইনের প্রতি অভিনন্দন বর্ষিত হল। দুঃখ-দারিদ্র্য জর্জরিত মানুষ ভাবল এতদিনের অন্যায়-অবিচারের প্রতিকার এবার হবে। রাজনৈতিক দলমতের উর্ধে সামরিক শাসকের হস্তে নিশ্চয়ই এবার তারা সুবিচার পাবে। শোষণক্লিষ্ট পূর্ব পাকিস্তানের মানুষেরা ভাবল এবার তারা তাদের ন্যায্য প্রাপ্য পাবে। এবার তাদের ঘর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ভরে উঠবে।

এতদসত্ত্বেও স্বল্প-সংখ্যক বুদ্ধিজীবী এবং ছাত্র দেশের বুক থেকে গণতন্ত্রের মূলোৎপাটন ও সামরিক একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠায় চিন্তিত হয়ে উঠল। তাদের দূরদৃষ্টিতে এই অবস্থান্তরে মঙ্গলের চাইতে অমঙ্গলই বেশি ধরা পড়ল।

এদের চিন্তাই সঠিক হল। অল্প কালের মধ্যেই নতুন শাসনকর্তাদের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ল। একনায়কত্বের কুশাসনের দেশ ছেয়ে গেল। সামরিক কর্মকর্তাদের টেনে আনা হলো বেসামরিক শাসন কেন্দ্রসমূহে। গণতন্ত্র ও তার ধারক-বাহকদের স্তব্ধ করে দিয়ে দেশের মধ্য থেকে কিছু মুখচেনা গণবিরোধী ব্যক্তিকে শাসনদণ্ডের উচ্চ শিখরে স্থাপন করা হল। ট্যাক্সের বোঝা আরও বেড়ে গেল। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য অস্বাভাবিক ঊর্ধ্বগতি লাভ করল। স্কুল-কলেজের মাইনে, বই-পত্রের দাম বেড়েই চলল। স্বল্প বেতনের চাকুরে ও শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি না হয়ে রুই-কাতলাদের বেতন স্ফীত হতে থাকল। ছোট ব্যবসায়ী ও কুটির শিল্পের ট্যাক্সের বোঝা না কমিয়ে আদমজী-দাউদের মত শিল্পপতিদের জন্য ট্যাক্স হলিডের ব্যবস্থা হল। ধনবাদী সম্প্রদায়ের জান্নাতে মধ্যবিত্ত ও গরীব জনসাধারণের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেল। কিন্তু ছা-পোষা মানুষের দল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে চুপ করে থাকা ছাড়া আর অন্য কোন পথ খুঁজে পেল না।

ছাত্র সমাজের মধ্যে অসন্তোষ বেড়ে উঠল। তারা নিষ্ফল আক্রোশে গুমরে মরতে লাগল। মায়ের অশ্রু আর পিতার বক্ষ বিদীর্ণ করা হাহাকার তাদেরকে চঞ্চল করে তুলল। খাঁ সাহেব ঢাকা অবতরণ করেই ছাত্র সমাজকে সম্বোধন করে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তোমাদের স্লোগান-শোভাযাত্রার দিন শেষ হয়ে গিয়েছে। তোমাদের রাস্তায় নেমে আসতে দেখলে আমি বরদাস্ত করব না।

শক্তিমদমত্ত শাসকের সেদিনের হুমকি শুনে মনে মনে হেসে উঠেছিলাম। ভাবছিলাম, এ কথার প্রতি-উত্তর কবে দিতে পারব।

www.pathagar.com

আইয়ুবের শাসনামলে পূর্ব-পাকিস্তানের উপর অতীতের অবিচারের প্রতিবিধান ত হলই না বরং তার আমলে দুই প্রদেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য আরও বেড়েই চলল। অসাম্য দূরীকরণের প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ সরকার তাকে আরও বাড়িয়ে তুলল। পূর্ব-পাকিস্তানীদের পাট, চা, মাছ, আর চামড়ার টাকায় গড়ে ওঠা কেন্দ্রীয় রাজধানী এতদিন উভয় পাকিস্তানের সম্পত্তি ছিল। খাঁ সাহেবের কলমের এত খোঁচায় করাচী শহরকে পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পত্তিতে পরিণত করা হল। এই বিরাট সম্পদকে পূর্ব পাকিস্তানীদের থেকে কেড়ে নিয়ে পশ্চিম-পাকিস্তানকে চিরতরে দিয়ে দেওয়া হল। নূতন রাজধানী করার নামে পশ্চিম-পাকিস্তানে নূতন শহর গড়া শুরু হল। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে পশ্চিম-পাকিস্তানের মরুভূমির মধ্যে স্বর্গপূরী তৈরির কাজ চলতে লাগল। সংখ্যালগিষ্ঠ অধিবাসীদের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠদের চাইতে তিনচার গুণ বেশি স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, মিল, ফ্যাক্টরী তৈরি হতে লাগল। দেশের বাজেটের সিংহভাগ পশ্চিম-পাকিস্তানে ব্যয় হতে লাগল।

শত দাবী সত্ত্বেও দেশরক্ষা বাহিনীর একটি বিভাগকেও ওরা পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করতে সম্মত হলো না। পূর্ব পাকিস্তানের আত্মরক্ষার স্বার্থে এখানে সামরিক একাডেমী ও অস্ত্র কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে রাজি হল না। শত শত কোটি টাক ব্যয়ে সিন্ধু নদীর লবণাক্ততাকে দূর করে সম্পূর্ণ অববাহিকায় শস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হল। কিন্তু কয়েক শত কোটি টাকা ব্যয়ে পূর্ব-পাকিস্তানের বন্যা প্রতিরোধের স্থায়ী ব্যবস্থা করে প্রদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে পারল না।

দুঃখ হয় এই ভেবে, যারা অর্থ উপার্জন করে তাদের জন্য সে অর্থ ব্যয় হয় না। সে অর্থ ব্যয় হয় অন্যত্র। বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ অর্জন করে পূর্ব পাকিস্তান, কিন্তু তা ভোগ করে অন্য অঞ্চল। এদেশের মানুষ নিজেরা না খেয়ে যে মাছ বিক্রি করে, এদেশের চা, চামড়া, আর পাটের বিনিময়ে যে অর্থ উপার্জিত হয় তার অধিকাংশই তাদের ভোগে আসে না। ফলে সুজলা সুফলা শষ্য-শ্যামলা বাংলাদেশ – যাকে এককালে এশিয়ার রাণী বলা হত – যার উদ্বৃত্ত ফসলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের খাদ্য সংকট দূর হত, আজ তাকেই ভিখারিনীর বেশে বিদেশীদের দ্বারে হাত পাততে হয় খাদশস্যের জন্য। এমনি ন্যায়বিচার আর ভ্রাতৃত্বের ব্যবহার এদেশের মানুষ ভোগ করছে।

এর বিরদ্ধে কোন কথা বলা চলবে না। কথা বললেই সে রাষ্ট্রের দুশমন,

www.pathagar.com

ইসলাম আর মুসলমানের বড় শত্রু। ত্বরা করে তাকে জেলে পুরে না দিলে দেশ, ধর্ম আর জাতিকে বুঝি বাঁচান যায় না।

মানুষের সহ্য করারও একটা সীমা আছে। সে সীমাই অতিক্রম করে গেল।

দুই প্রদেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য আর তার প্রতিবিধানের উপর বক্তৃতা করার সময় মুজিব ভাই প্রায়ই একটি গল্প বলে থাকেন।

পিতা মৃত্যুর সময় তার দুই পুত্রের জন্য তিনটি জিনিস রেখে যায়। একটি খেজুর গাছ, একটি কাঁথা আর একটি গরু।

বড় ভাই অত্যন্ত চতুর। সকল প্রকৃতির ছোট ভাইকে সে প্রতারণার বুদ্ধি আঁটল। ছোট ভাইকে বলল, আয়, আমরা দু'ভাই জিনিস তিনটা ভাগ করে নিই।

ছোট ভাই রাজী হয়ে বড় ভাইকেই ভাগ করতে অনুরোধ করল।

বড় ভাই ওকে বুঝিয়ে বলল, খেজুর গাছটির নীচের অংশ তুই নে। উপরের অংশ আমি নিই। কখন উপরে উঠে তুই পড়ে হাত-পা ভাংবি, তাই উপরেরটা আমিই নিলাম। তুই আমার ছোট ভাই, তোকে কি বিপদের মধ্যে ঠেলে দিতে পারি?

ছোট ভাই খুশি মনে বড় ভাইয়ের প্রস্তাব মেনে নিল।

কাঁথাটি সম্বন্ধে বড় ভাই বলল, তুই কাঁথাটি সমস্ত দিন রাখিস, রাত্রে শুধু আমায় দিস।

ছোট ভাই তাতেই রাজী।

গাভীটির প্রশ্নে বড় ভাই আরও উদারতা দেখাল। বলল, গরুর সামনের অংশটা ভাল, নোংরা থাকে না, পরিষ্কার করার ঝামেলা নেই। তুই সম্মুখের অংশটাই নে। কষ্ট হলেও তোর মুখের দিকে চেয়ে আমাকে পেছনের অংশটাই নিতে হবে।

ছোট ভাই আনন্দে বত্রিশ দন্ত প্রদর্শন করে হেসে উঠল।

www.pathagar.com

দিন নায়। ছোট ভাই খেজুর গাছের গোড়া পরিষ্কার করে, জল ঢালে। বড় ভাই মনের আনন্দে রস খায়। ছোটকে দেয় না। ছোট ভাই সারাদিন কাঁথাটিকে রৌদ্রে রেখে শুকিয়ে গরম করে রাখে – রাতে বড় ভাই সেটি গায়ে দিয়ে সুখে নিদ্রা যায়। শীতের রাত্রে কাঁপতে কাঁপতে ছোটর ঘুম হয় না। গরুটিকে সে সারাদিন ঘাস-বিচালি খাইয়ে তাজা করে তোলে; বড় ভাই এসে দুধটুকু দুইয়ে নিয়ে চলে যায়। ছোটর কপালে একফোঁটা দুধ জোটে না।

বন্দোবস্তটা ছোট ভাইয়ের ভাল লাগল না। বড় ভাইকে গিয়ে বলল, ভাই রোজ তুমি রস খাচ্ছ, আজ আমাকে একটু দাও।

অমনি বড় ভাই মুখ নাড়া দিয়ে উঠল। বলল, রস ত আমিই খাব। উপরের অংশ ত আমার। ভাগের কথা ভুললে চলবে কেন?

ছোট ভাই চুপ করে গেল।

দু'দিন পরে শীতে কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে বড় ভাইকে বলল, ভাই, তুমি কাঁথাটা রোজ গায়ে দিচ্ছো, আজ আমাকে একটু দাও আমি শীতে মরে যাচ্ছি।

বড় ভাই প্রতি-উত্তর করল, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিস না। কথার বরখেলাপ ধর্মে পাপ। আমাদের চুক্তিমত কাঁথা দিনে তোর, রাতে আমার। যা ভাগ্।

বেচারা ছোট ভাই ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এল।

পরদিন বড় ভাইকে বলল, ভাই তুমি রোজ দুধ খাচ্ছো, আজ আমাকে একটু দুধ দাও।

বড় ভাই তেড়ে এল। বলল, আমি কথার বরখেলাপ করতে পারব না। ভেবেছিস, ধর্মে এসব সইবে? মনে নেই, চুক্তিমত গরুর সামনের অংশ তোর পেছনের অংশ আমার? দুই আমিই খাব। তুই পাবি না।

সব মানুষেরই একদিন চোখ খুলে যায়। বোকা ছোট ভাইয়েরও চোখ খুলে গেল। সে বুদ্ধি আঁটল। মনে মনে বড় ভাইয়ের উদ্দেশে বলল, দাঁড়াও তোমাকে শিক্ষা দিচ্ছি।

সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই ছোট ভাই একটা কুড়াল নিয়ে খেজুর গাছটির গোড়া কাটতে শুরু করে দিল।

www.pathagar.com

বড় ভাই দৌড়ে এসে বাধা দিল, একি করছিস?

ছোট ভাই গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল, আমার অংশ আমি কেটে ফেলছি – তাতে তোমার কি? তুমি তোমার রস খাও গিয়ে।

বড় ভাই সবই বুঝল, বলল, গাছ কাটিস না, আজ থেকে দুজনে সমান ভাগে রস খাব।

পরদিন ছোট ভাই কাঁথাটি নিয়ে সমস্তদিন পুকুরের মধ্যে কচুরিপানার ভেতর ডুবিয়ে রাখল। রাত্রে বড় ভাই কাঁথা চাইতেই পুকুর থেকে তুলে এনে দিল।

বড় ভাইয়ের তো চক্ষু স্থির। এ কি করেছিস!

ছোট ভাই নির্বিকার কণ্ঠে জবাব দিল, দিনের বেলা কাঁথাটা আমার, ওটাকে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। রাতের বেলা এটা তোমার। এই নাও, গায়ে দাও গিয়ে।

বড় ভাই হার স্বীকার করল। ঠিক হল, এর পর থেকে দু'জনে ভাগ করে কাঁথাটি ব্যবহার করবে।

বাকী রইল গরু।

ছোট ভাই গরুটির মুখ খুব কষে বেঁধে বহির্বাটির একটি গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখল। দিনরাত এতটুকু দানাপানিও গরুটিকে খেতে দিল না।

বড় ভাই দৌড়ে এসে গরুর দুরবস্থা দেখে শিউরে উঠল। চিৎকার করে ছোট ভাইকে বলল, ওরে করেছিস কি? গরুটা যে না খেয়ে মরে যাবে।

ছোট ভাই জবাব দিল, গরুর মুখের অংশ আমার, ওটা আমি বেঁধে রাখি বা যা খুশি করি তোমার তাতে কি? তুমি তোমার দুধ খাওগে যাও।

বড় ভাই আবার হার স্বীকার করল। ছোট ভাইয়ের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করল তাকে প্রতারণা করার জন্য। তখন দু'ভাই মিলে-মিশে রস, কাঁথা এবং গরুর দুধ সমানভাবে ভোগ করতে লাগল।

পূর্ব-পাকিস্তানকেও এমনি করে প্রতারণা করা হয়েছে বছরের পর বছর। প্রতিবাদ করলেই সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা ও আঞ্চলিকতার বদনাম দিয়েছে, মুসলিম ব্রাদারহুডের বড় বড় বুলি আউড়ে ন্যায্য দাবীকে ধামাচাপা দিয়েছে।

www.pathagar.com

এদেশের মানুষেরও চোখ খুলে গিয়েছে। নিজেদের ক্ষুধার তাড়নায় তারা বুঝতে পারছে একজন খেলে আর একজনের পেট ভরে না। তারও ক্ষুণ্নিবৃত্তির প্রয়োজন আছে। তারাও বুঝতে পারল, গল্পের ছোট ভাইটির মত কার্যক্রম গ্রহণ করার সময় তাদেরও এসে গিয়েছে। অন্যথায় তারা তাদের ন্যায্য প্রাপ্য কোনদিনই আদায় করতে সক্ষম হবে না।

পূর্ব-পাকিস্তানের উপর এ বিমাতাসুলভ ব্যবহার পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পর থেকেই শুরু হয়েছে। এতদিন তবুও চিৎকার করা চলত, বৈষম্যের অবসানের দাবীতে আন্দোলন করা চলত। সামরিক শাসনামলে সভা-সমিতি অবৈধ ঘোষণা করে, বাকস্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে সমস্যা সমাধানের জন্য আন্দোলন করার অধিকার থেকেও এদেশের মানুষকে বঞ্চিত করা হল।

রাজনীতি যাঁরা করতেন সক্রিয় ভাবে তাঁদের কেউ কেউ কারাগারে। প্রতিষ্ঠান অবৈধ ঘোষিত। তাই, দেশর বুকে কোন আন্দোলন দানা বেঁধে উঠল না।

দেশের এই দুর্দিনে সামাজিক ও রাজনৈতিক বন্ধ্যাত্বের মুহূর্তে পূর্ব পাকিস্তানের অকুতোভয় ছাত্র সমাজ আর একবার এগিয়ে এল দেশকে সংগ্রামের পথে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য।

আটান্নর পরে অনেক দিন অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন ছাত্র প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাজ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের কোন অস্তিত্ব নেই। সেদিনের কর্মকর্তারাও কর্মজীবনে প্রবেশ করে গেছে।

ছাত্রলীগের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা পরিলক্ষিত হল। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে গিয়েছি। আমাদের প্রাদেশিক সাধারণ সম্পাদক আজহার আলী ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলেত চলে গিয়েছেন। সভাপতি রফিকউল্লাহ চৌধুরী রাতে আইনের ছাত্র হলেও দিবাভাগে জগন্নাথ কলেজের শিক্ষক। সি. এস. এস. পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছেন। পুরাতন কর্মীরা সব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রতিষ্ঠানের সেই দুর্বলতম মুহূর্তে গোপন বৈঠকে জনাব রফিক-উল্লাহ চৌধুরীকে সভাপতি ও আমাকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে নূতন কমিটির স্কন্ধে প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব অর্পিত হল। সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিস্থিতির

www.pathagar.com

মাঝে সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় পূর্ণ গোপনীয়তার মধ্য দিয়ে নূতন করে ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠান সংগঠিত করার দুরূহ কাজে ব্যাপৃত হলাম। ভয়ে ভয়ে প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলতে হয়। শুনতে পাই ছাত্র নাম নিয়ে কিছু গুপ্তচর ঢুকে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে। কেবল প্রতিষ্ঠানগত প্রস্তুতিই নয় – একটি ব্যাপক ছাত্র আন্দোলনের ভিত্তি রচনার কাজেও হাত দিতে হল। ধীরে ধীরে আমাদের কাজ এগিয়ে যেতে লাগল।

১৯৬১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে প্রকাশ্যে ছাত্রলীগের সম্মেলন আহ্বান করে নূতন কর্মকর্তা নির্বাচিত করা হলো। আমাকে সভাপতি নির্বাচিত করা হল, শেখ ফজলুল হক মনি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হল। আন্দোলনের প্রস্তুতি এগিয়ে চলল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেমিনার, ইফতার পার্টি প্রভৃতির মাধ্যমে ছাত্র সমাজকে আন্দোলনমুখী করে তোলার প্রচেষ্টা চলতে লাগল।

ছাত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে ঐতিহ্য সৃষ্টিকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ আর একটি বিরাট আন্দোলনের ঝুঁকি গ্রহণ করল। পূর্বের ছাত্র আন্দোলনগুলোর চাইতে এ আন্দোলনের প্রকৃতি ভিন্ন আর পরিণাম হয় মৃত্যু নয় চৌদ্দ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। সেদিনের সরকার ছিল জনগণেরই অংশ, আজকের সরকার শক্তি আহরণ করে সামরিক বাহিনীর অস্ত্রের ঝংকারে। ভয়াবহ পরিণতির কথা চিন্তা করেও ছাত্র সমাজ চুপ করে থাকতে পারল না।

এমনি পরিস্থিতিতে সরকার একটি মারাত্মক ভুল করে আমাদের আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করে দিল।

দেশ বরেণ্য নেতা পাকিস্তানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে ওরা গ্রেফতার করল। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ঘৃতাহুতি পড়ল। ছাত্র সমাজ ক্ষেপে উঠল। সোহরাওয়ার্দীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদেই ছাত্রসমাজ দীর্ঘদিন পরে আবার ঢাকার রাজপথে নেমে এল।

১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারির ঘটনা।

পহেলা ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সর্বপ্রথম ধর্মঘট করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল – সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম কণ্ঠবিদারী আওয়াজ উঠল। ছাত্রদের মিছিলে দুপাশ থেকে জনতার স্রোত বাড়তে থাকল। ছাত্র-জনতার সে মিছিল সমগ্র ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করে দাবী জানাল, অবিলম্বে

www.pathagar.com

শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মুক্তি দাও; গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা কর; সামরিক আইন প্রত্যাহার কর, বন্দীদের মুক্তি দাও, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে বাঁচতে দাও।

শোভাযাত্রার মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিলাম, দ্বিতীয় দিন আরও ব্যাপক এবং আরও প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হবে। ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হল সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। ঠিক করা হল, পরদিন দশ ঘটিকায় কার্জন হল প্রাঙ্গণে ছাত্র-জনতার সমাবেশ হবে।

গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হয়ে গেল প্রথম দিনই।

ওদের চোখে ধুলো দিয়ে কাজ করে চললাম।

দোসরা ফেব্রুয়ারির সকাল থেকে কার্জন হল প্রাঙ্গন এবং আশপাশের রাস্তাঘাট ছাত্র জনতায় ছেয়ে গেল। অদূরে হাইকোর্টের গেটের সামনে উদ্যত সংগীন হাতে সামরিক বাহিনী দাঁড়িয়ে। দেশ-বিদেশের সাংবাদিক আর ফটোগ্রাফাররা এসে ভিড় করেছে।

দশটায় কর্মীবাহিনী নিয়ে কার্জন হল প্রাঙ্গণে ঢুকে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এত অধিক জনসমাগম আমরা কল্পনাও করতে পারিনি।

ছাত্র-জনতা অস্থির হয়ে উঠল। তারা আমাদের বক্তব্য শুনতে চায়। শুনতে চায় তাদের প্রোগ্রাম। ছাত্ররা একটি টেবিল জোগাড় করে সেই জনসমুদ্রের মধ্যে বক্তৃতামঞ্চ তৈরি করল। কিন্তু বক্তৃতা করার জন্য কেউ এগিয়ে যেতে রাজী নয়।

চৌদ্দ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের কথাটি একবার মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে গেলেও পরক্ষণেই মনস্থির করে টেবিলের উপর গিয়ে দাঁড়ালাম। ছাত্র-জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ছে। মনে পড়ে গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে সামরিক শাসনকর্তার সেই হুংকার', Gone are the days of slogans and processions. চিৎকার করে বলে উঠলাম, "পশ্চিমা ধনবাদী গোষ্ঠীর ক্রীড়নক এক-নায়কত্ববাদকে আমাদের মাতৃভূমির পবিত্র প্রাংগন থেকে সমূলে উৎপাটিত করার গণ-সংগ্রাম আজ এই মুহূর্ত হতে শুরু হল। জনতার স্বার্থ আর স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী ছাত্র সমাজ এই মুহূর্তে বজ্রকঠিন শপথ নিচ্ছে – স্বৈরাচারী শক্তিকে সমূলে পর্যুদস্ত না করে তারা বিশ্রাম গ্রহণ করবে না।"

ছাত্র-জনতার মুহুর্মুহু স্লোগান আর উল্লাসের মধ্যে তাদের কাছে কর্মসূচী

www.pathagar.com

তুলে ধরলাম। আবেদন জানালাম, সেই মুহূর্তে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য।

কার্জন হল প্রাঙ্গন থেকে প্রায় দেড় মাইল দীর্ঘ শোভাযাত্রা বের হল। রাস্তাঘাট, যানবাহন বন্ধ হয়ে গেল। ছাত্র-জনতার মিছিল গুলিস্তানের কাছে পৌঁছতেই বিক্ষোভকারীদের এক অংশ রাজপথের দুধারের দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়ে আইয়ুবের প্রতিকৃতি নামিয়ে এনে ভেঙ্গে টুকরা টুকুরা করে ফেলতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই দোকানীরা স্বতঃফূর্ত ভাবে মিছিলের সামনে ফটো ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। ভাঙ্গা কাঁচের টুকরায় সমস্ত রাজপথ কণ্টকিত হয়ে উঠল। সর্বপ্রথম সেদিন পাকিস্তানের বুকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী জংগী শাসকের মর্যাদা ধুলায় লুণ্ঠিত হল।

সেদিনের সেই বিক্ষোভ মিছিলের কলেবর আমাদের ধারণাকেও ছাড়িয়ে গেল। শহরের অধিকাংশ পথ অতিক্রম করার পর ওরা নওয়াবপুর রোডের উপর আমদের বাধা দিল। সমগ্র রাজধানী সেদিন সেই মিছিলে ও বিক্ষোভের ঢেউয়ে ভেসে গিয়েছিল। আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও বারবার মিছিলে শান্তি-শৃঙ্খলা ব্যাহত হচ্ছিল। পুলিশ ও মিলিটারী যৌথভাবে শোভাযাত্রার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাঁদুনে গ্যাস আর রাঠি চার্জের ফলে প্রচুর লোক আহত হল। কার্জন হলের সম্মুখে একদল পুলিশ পরাজিত হয়ে হাইকোর্টের মধ্যে আশ্রয় নিল। বিক্ষোভকারীরা তাদের বহনকারী বাসটিকে জ্বলিয়ে দিল।

নিরস্ত্র শোভাযাত্রীরা বেশীক্ষণ অস্ত্রধারী পুলিশ ও সৈনিকদের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারল না। দ্বিতীয় দিনের কর্মসূচী সম্পূর্ণ করার পূর্বেই ছাত্র-জনতার শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল।

বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল। সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সামরিক বাহিনী ছাউনি ফেলল। ছাত্রাবাসগুলিকে তিনদিন তিনরাত ঘিরে রাখল। তিনদিন সম্পূর্ণ এলাকাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হল। লোক চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রইল।

এ তিনদিন ধরে ছাত্ররা হলের মধ্যে অনাহারে কাটাতে বাধ্য হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গনকে ওরা সে কয়দিন যুদ্ধক্ষেত্রের রূপ দিল। হলের মধ্যে ঢুকে ছাত্র এবং হলের বয়-বাবুর্চিদের গ্রেফতার করে তিনদিন পর চতুর্থদিন সকালে ওরা বিজয়ীর বেশে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে গেল। গ্রেপ্তারী পরওয়ানা নিয়ে শহরের যত্রতত্র খানা-তল্লাশী চলতে লাগল।

www.pathagar.com

হুলিয়াও জারি করা হল আমাদের নামে।

ফেব্রুয়ারীর সেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল প্রদেশের কন্দরে-কন্দরে। প্রদেশব্যাপী সেই আন্দোলনকে কার্যকরী করে তোলার জন্য আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। সমগ্র প্রদেশের ছাত্র সমাজ সে ডাকে এক বাক্যে সাড়া দিল। প্রতিটি জেলা, মহকুমা, নগর, বন্দর, গ্রামে দুর্বার ছাত্র আন্দোলনের অগ্নিশিখা জ্বলে উঠল। দীর্ঘদিনের পরিশ্রম সার্থক হতে দেখে সফলতার সম্ভাবনায় উজ্জীবিত হয়ে উঠলাম।

বেশিদিন সরকারের চোখে ধুলা দিয়ে থাকতে পারলাম না। এক রাতে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে চলে এলাম। ভয় ছিল, গ্রেপ্তারের পরে ওরা কী করবে কে জানে। কিন্তু নিরাপত্তা বন্দী করে আটকে রাখা ছাড়া ওরা আর কিছুই করল না। কয়েকজন ছাত্রকে ওরা সামরিক আদালতে বিচার করেছিল – কিন্তু আইনের ফাঁক দিয়ে তারা বেঁচে গেল।

মীর হোসেন চৌধুরী, ওবায়েদুর রহমান, শেখ ফজলুল হক মণি, মোঃ হানিফ – এরাও সে সময় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। জেলখানার দিনগুলোও আমাদের আনন্দেই কাটছিল, কেননা বাইরের ছাত্র সমাজ আমাদের মুক্তির জন্য প্রত্যেকদিন সভা, শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিল। আমাদের অবর্তমানে আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে উঠেছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের জেলা শহর দিনাজপুর থেকে শুরু করে পূর্বাঞ্চলের সমুদ্র-বিধৌত চট্টলা পর্যন্ত সে আন্দোলনের বন্যা বইতে শুরু করে দিল।

সরকার বেশি দিন আমাদের আটকে রাখতে পারল না। প্রথম কয়েক দফায় অন্য ছাত্ররা ছাড়া পেয়ে গেল। শেষ পর্যায়ে ১৯৬২-র জুন মাসে আমিও মুক্তি পেয়ে গেলাম।

জেল থেকে বের হবার পরই নূতন উদ্যমে আন্দোলনের কাজে নেমে পড়লাম। দ্বিতীয় পর্যায়ের এই আন্দোলন মূলত সরকারের কুখ্যাত শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিলের জন্যই পরিচালিত হয়েছিল।

সরকার শিক্ষা কমিশনের যে নূতন রিপোর্ট বের করলেন, তা এদেশের মানুষের কাছে অগ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হল। সে কমিশনের প্রস্তাবনাসমূহ বাস্তবায়িত হলে এদেশের দরিদ্র জনসাধারণের সন্তান সন্ততিরা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হত। University education is not uni-

www.pathagar.com

versal এ সুরটি নগ্নভাবে ফুটে উঠল ওদের প্রস্তাবনাসমূহের মধ্যে।

শিক্ষা কমিশনের সে প্রস্তাবমূহ বাস্তবে ধনীর দুলালদের শিক্ষার পথকেই সুগম করতে পারত। ডিগ্রী কোর্সের মেয়াদ দু'বছরের স্থলে তিন বৎসর, বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং বাণিজ্য বিভাগের পাঠ্যসূচির অবৈজ্ঞানিক-সুলভ রদবদল, স্কুলসমূহে কারিকুলাম অযৌক্তিকভাবে বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি যথেষ্ট পরিমাণে কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা না করে শিক্ষা কমিশনের সেই রিপোর্ট প্রণীত হয়েছিল। শুধু ছাত্র জনসাধারণ কর্তৃকই নয়, দেশের সত্যিকারের শিক্ষাবিদদের দ্বারাও তা প্রত্যাখ্যাত হল।

প্রকৃত শিক্ষাবিদ্‌দের আহ্বান না করে মূলত সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা গঠিত সেই কমিশনের রিপোর্ট শতকরা নব্বই জন দরিদ্র কৃষক-শ্রমিক অধ্যুষিত এই প্রদেশে সম্পূর্ণরূপে অবাস্তব বলে বিবেচিত হল। দেশের মানুষের নাড়ীর সঙ্গে যোগাযোগহীন অযোগ্য ব্যক্তিদের হাতে কর্তৃত্ব এলে এমনি জগা-খিচুড়ীই পরিবেশন হয়ে থাকে।

জাতির পক্ষ থেকে ছাত্র সমাজ সে রিপোর্টের আশু বাতিল দাবী করল। ছাত্রদের পক্ষ থেকে শিক্ষাবিদদের দ্বারা প্রণীত একটি বিকল্প রিপোর্টও পেশ করা হল। কিন্তু সরকার সে রিপোর্ট গ্রহণ করা দূরের কথা, ছাত্রদের ন্যায্য দাবীর প্রতিও কর্ণপাত করল না।

আমরা ডেপুটেশন দিলাম, মেমোরেন্ডাম পাঠালাম, সভা-সমিতির মাধ্যমে দিনের পর দিন প্রস্তাব পাস করলাম, দাবী জানালাম, কিন্তু সরকারের টনক নড়ল না। তখন বাধ্য হয়ে ব্যাপকতর আন্দোলনের পথ বেছে নিতে হল। ছাত্র ইউনিয়নের মোহাম্মদ ফরহাদ, জয়নাল আবেদীন, কাজী জাফর; ছাত্রশক্তির রেজাউল হক সরকার; ছাত্র ফেডারেশনের আবুল হাসনাত প্রমুখের নেতৃত্বে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান একযোগে আমাদের সঙ্গে সে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বাষট্টির সে শিক্ষা আন্দোলন একদিক থেকে তুলনাবিহীন। কেননা দীর্ঘদিন ধরে এত ব্যাপক আন্দোলন আর কোনদিন পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে সংঘটিত হয়নি। সমগ্র পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ সে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সে আন্দোলনের রূপ স্বচক্ষে না দেখলে ব্যাখ্যা করে বোঝান যায় না। সারা বৎসরে সেবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ষাট দিন ক্লাস বসেছিল। বাকী দশ মাস একটানা ধর্মঘট সংঘটিত হয়েছিল। শুধু বিশ্ববিদ্যালয় বা

www.pathagar.com

কলেজসমূহে নয়, সে আন্দোলনের জোয়ার পূর্ব পাকিস্তানের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছিল। এমন একটি নিভৃত গ্রাম ছিল না, যেখানে সে আন্দোলনের সাড়া জাগেনি। এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না যেখানকার ছাত্রছাত্রী দিনের পর দিন ধর্মঘট, শোভাযাত্রা আর বিক্ষোভ প্রদর্শন করেনি।

ছাত্র-আন্দোলনের সেই উত্তাল তরঙ্গে সরকারী শাসনযন্ত্র অসহায় হয়ে পড়েছিল। সেদিনের সরকার সে ছাত্র অভ্যুত্থানকে প্রশমিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। প্রতিটি নগর, শহর, বন্দর আর গ্রামের হাট-বাজার-গঞ্জও সেদিন ছাত্রদের দৃপ্ত পদভারে প্রকম্পিত হচ্ছিল। ধর্মঘট, সভা, শোভাযাত্রা আর বিক্ষোভের কর্মসূচি ছিল প্রতিটি দিনের কার্যক্রম।

সরকার সে উত্তাল সংগ্রামের মাঝে দিশেহারা হয়ে পড়ল। ছাত্রদের দাবীর স্বীকৃতি দেওয়াই সেদিন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হত। তা না করে সরকার প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে এক হিংসাত্মক পন্থা গ্রহণ করল, রাইফেল আর বেয়নেটের আশ্রয় নিয়ে সে আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে চাইল। শুরু হল ছাত্র হত্যাযজ্ঞ। রংপুর, যশোর, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, নওগাঁ, ঢাকা প্রভৃতি স্থানসমূহে ছাত্রদের রক্তে ওরা হস্ত রঞ্জিত করল। ছাত্র সমাজের উষ্ণ রক্ত পান করে ওরা ওদের রক্তপিপাসা নিবৃত্ত করল।

লাঠিচার্জ, কাঁদুনে গ্যাস পুরনো হয়ে গেল। চলতে লাগল সরাসরি গুলিবর্ষণ। কত মা যে তার সন্তানকে হারাল, কত পিতা যে তার নয়নমণি পুত্রকে সরকারের কোপানলে বিসর্জন দিল, কত বোন যে তার ভাইকে হারাল তার সঠিক হিসাব জানা যায়নি।

১৯৬২-র সতেরোই সেপ্টেম্বর আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র রাজধানী শহরে যে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হল, সভ্যতার ইতিহাসে তার নজির পাওয়া দুরূহ।

সারা প্রদেশব্যাপী আমরা সতেরোই সেপ্টেম্বর সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করেছি; পূর্বদিন জনাব সোহরাওয়ার্দী মুক্তিলাভ করে ঢাকায় পদার্পণ করেছেন। ছাত্র সমাজের মনের ইচ্ছা – জাতীয় নেতা সোহরাওয়ার্দীর উপস্থিতিতেই তারা তাদের সংগ্রামের চূড়ান্ত কর্মসূচি পালন করবে। নেতার উপস্থিতি তাদের দ্বিগুণ উৎসাহিত করে তুলল।

ছাত্র সমাজের সে আহ্বানে সমগ্র জাতি অভূতপূর্বে সাড়া দিল। সমগ্র

www.pathagar.com

প্রদেশে পূর্ণ হরতাল পালিত হল। ঢাকা শহরে একটি পান-বিড়ির দোকানও সেদিন খোলেনি। একটি সাইকেল-রিকশাও কেউ দেখতে পায়নি। হরতালের এমনি পূর্ণ সফলতা খুব কমই দেখা গিয়েছে।

উল্লসিত ছাত্র-জনতা বেলা দশটায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করল। শোভাযাত্রা সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল। শোভাযাত্রাটি হাইকোর্ট অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গেই অতর্কিতে পশ্চাৎদিক থেকে পুলিশ শোভাযাত্রার উপর উপর্যুপরি কয়েক রাউন্ড গুলিবর্ষণ করল। ১৪৪ ধারা জারি ছিল না, শোভাযাত্রার উপর কোন নিষেধাজ্ঞাও ছিল না। তবুও একটি বারের তরেও সাবধান বাণী উচ্চারণ না করে ওরা নিরীহ শান্তিপ্রিয় শোভাযাত্রীদের উপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করল।

গুলিবর্ষণের সংবাদ শহরে উল্কার মত ছড়িয়ে পড়ল। সমগ্র শহর রাস্তায় ভেঙ্গে পড়ল। কয়েক স্থানে পুলিশের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ সংঘর্ষ চলল ছাত্র ও জনতার। আহত ছাত্র-জনতায় শহরের প্রতিটি হাসপাতাল পূর্ণ হয়ে গেল, তাদের আর্তনাদে ঢাকার আকাশ-বাতাস করুণ হয়ে উঠল।

ওয়াজিউল্লাহ, বাবুল ও মোস্তফা সে গুলিতে প্রাণ দিল। বাবুল ও ওয়াজিউল্লাহ সেদিনই শহীদ হল। আমরা সারা প্রদেশে তিন দিনের জন্য শোক পালনের কর্মসূচী নিলাম। পরদিন সকালে শহীদানের গায়েবী জানাজা অনুষ্ঠিত হল সলিমুল্লাহ হলের শহীদ পার্কে। জানাজার জামাতেই কর্মসূচী ঘোষণা করলাম। শোক মিছিল নিয়ে রাস্তায় নেমে এলাম।

সেদিনের সেই ভাবগম্ভীর শোকাতুর মিছিলে নগ্নপদ নারী-পুরুষের অভূতপূর্ব সমাবেশ হয়েছিল। শহীদ মিনারের পাদদেশে শোক-মিছিলের উপর নির্দয়ভাবে বেত্রাঘাত চালান হয়। মিছিলের সম্মুখভাগের কয়েকটি ছাত্রীর শরীর ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল। বাধ্য হয়ে শোক মিছিল ভিন্ন পথে চালিত করে নিতে হল।

জগন্নাথ কলেজের প্রবেশদ্বারে পুলিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মোকাবিলা হল। তাদের বুঝিয়ে দিলাম, ছাত্র সমাজ তিনদিন শুধুই শোক পালন করতে চায়। সরকার যদি শোক পালনেও বাধা দেয়, তাহলে দেশের মধ্যে শোকপালন আর বন্ধ হবে না। যত রক্ত ঝরে ঝরুক।

ওরা আমাদের কঠিন শপথ হৃদয়ঙ্গম করল। শোক মিছিলের পথ ওরা ছেড়ে

www.pathagar.com

দিল।

দ্বিতীয় দিন মোস্তফা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। আমরা ওর মৃতদেহ সংগ্রহ করতে চাইলাম। কিন্তু অসংখ্য পুলিশ বেষ্টিত হয়ে মোস্তফার মরদেহ হাসপাতাল ত্যাগ করে চলে গেল। মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে মোস্তফার গায়েবী জানাজা পড়ে আবার আমরা বেরিয়ে পড়লাম রাজপথে – শোকের মিছিল নিয়ে।

তিনদিন আমরা শোক পালন করলাম। সমগ্র প্রদেশব্যাপী সুশৃঙ্খলভাবে একই কর্মসূচী পালিত হল। ছাত্র সমাজ শহীদানের আত্মার কাছে শপথ নিল – আন্দোলনকে তারা সফল করে তুলবেই। মোস্তফা, বাবুল আর ওয়াজিউল্লাহর রক্তদানকে তারা ব্যর্থ হতে দেবে না।

অদম্য অকুতোভয় ছাত্র সমাজের মরণজয়ী শপথের সংবাদ শুনে সরকার ব্যস্ত হয়ে উঠল। আমাদেরকে ডেকে পাঠাল আপোষ-মীমাংসার জন্য।

আমরা সরকারের সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম। আমরা দেখা করলাম জাতীয় নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে যিনি কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেই ছাত্রদের দাবী স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন সরকারের প্রতি। যিনি ছাত্রদের উদ্দেশে বলেছিলেন, I hug them, I kiss them.

ছাত্র-দরদী সেই নেতার কাছেই ছাত্ররা তাদের দাবী-দাওয়া তুলে ধরল। নেতা অঙ্গীকার করলেন, ছাত্রদের দাবী নিয়ে তিনিই সংগ্রাম করবেন যদি সরকার অবিলম্বে ছাত্রদের ন্যায্য দাবী মেনে না নেয়।

ছাত্র সমাজের শক্তি আরও বেড়ে গেল। সরকার সন্ত্রস্ত হয়ে গেল। সোহরাওয়ার্দীর হস্তক্ষেপের ফলে ওরা ওদের প্রতিহিংসাপরায়ণ ভূমিকা ত্যাগ করতে স্বীকৃত হল। নীতিগতভাবে ছাত্রদের দাবী মেনে নিয়ে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিলের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল। সেই সঙ্গে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করল, ধৃত ছাত্রদের মুক্তি দিল, আমাদের নামে জারিকৃত গ্রেপ্তারী পরওয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার করল।

ছাত্র-আন্দোলনের ইতিহাসে আর একটি গৌরবোজ্জ্বলে বিজয়ের অধ্যায় সংযোজিত হল।

আমতলার ঐতিহ্যবাহী প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে সেদিন ওয়াজিউল্লাহ, মোস্তফা ও

www.pathagar.com

বাবুলের রক্তস্মৃতি বিজড়িত সতেরোই সেপ্টেম্বরকে শিক্ষা দিবস নামকরণের প্রস্তাব করতে গিয়ে বলেছিলাম, প্রতি বৎসর এদেশের বুকে সতেরোই সেপ্টেম্বর ফিরে আসবে আমাদের সকলের শিক্ষনীয় বাণী নিয়ে। ছাত্র-জনতা শিক্ষা গ্রহণ করবে ত্যাগ ও সংগ্রাম ছাড়া কোনদিন ঈপ্সিত ফল লাভ করা যায় না, সরকার শিক্ষা গ্রহণ করবে গুলী ও বেয়নেটের জোরে কোনদিন ন্যায্য দাবীকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না।

প্রতি বৎসর সতেরোই সেপ্টেম্বর 'শিক্ষা দিবস' রূপে পালিত হচ্ছে। শহীদানের অমর স্মৃতি এদেশের ছাত্র-জনতার মানসপটে চিরদিন অম্লান থাকবে।

পর পর দুইটি আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারলাম সুসংহত শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানই ছাত্র আন্দোলনের প্রথম কথা। তাই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্রলীগ সংগঠনকে আরও ব্যাপক আকারে এবং জোরদার করে গড়ে তোলার ব্রত নিয়ে প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বেরিয়ে পড়লাম। পূর্ব বাংলার জেলায়-জেলায়, মহকুমায়-মহকুমায় সাংগঠনিক সফরের কর্মব্যস্ত সেই সব গৌরবময় দিনগুলির স্মৃতি কোন দিন ভুলবার নয়।

সেদিন প্রদেশের ছাত্রছাত্রী এবং জনসাধারণ আমাদেরকে যে সম্বর্ধনা জানিয়েছে, যে সাদর অভ্যর্থনা আমরা সেদিন প্রতিটি স্থানে লাভ করেছি তার তুলনা হয় না। ছাত্র আন্দোলন যে এদেশের বুকে কি গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে এবং তরুণদের সংগ্রামী ভূমিকাকে এদেশের মানুষ যে কি গভীর মমতা এবং সহানুভূতি দিয়ে গ্রহণ করেছে সে সত্য প্রতিদিন উপলব্ধি করেছি জেলায় জেলায় ঝটিকা সফরের দিনগুলিতে।

প্রতিটি কর্মী-সম্মেলন, ছাত্র-সমাবেশ আর জনসভায় তিল ধারণের স্থান পাওয়া যায় না। স্বতঃস্ফূর্ত সম্বর্ধনা আর অভিনন্দন আমাদের অভিভূত করে ফেলত।

উত্তরবঙ্গ সফর কালে সময় লক্ষ্য করলাম, সেখানকার শাসন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে ছাত্র-আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গে। মনে হল হয়তবা স্কুল কলেজের কিশোর-কিশোরীরাই দেশের শাসনভার হাতে তুলে নিয়েছে। কিছু কিছু ক্ষয়ক্ষতি এবং বাড়াবাড়িও ওরা করেছে। রেলকর্তৃপক্ষ অসহায় হয়ে পড়েছে। কেবল বিনা টিকেটে যাতায়াতই নয়, রেলের জিনিসপত্রও ওরা তছনছ করে দিয়েছে। তারুণ্যের অতি আবেগে ওরা যত্রতত্র ট্রেন থামিয়ে

www.pathagar.com

ওঠা-নামা করছে, রেল কর্মচারীরা অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকছে।

যে ট্রেনেই আমি ঘুরছিলাম – দেখতে পেয়েছি শতাধিক স্কুল-কলেজের ছাত্র আমার সঙ্গ নিয়েছে। টিকিটের বালাই নেই। শুধু তাই নয়, আমার কামরায় ওরা মাইক্রোফোন বেঁধে দিয়েছে, পূর্বাহ্নেই বিভিন্ন স্থানে ছাত্রছাত্রীদের সমাবেশের ব্যবস্থা করে রেখেছে; খুশিমত ট্রেন থামিয়ে আমাকে দিয়ে বক্তৃতা করিয়েছে, যাত্রীদের অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে।

কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা পৌঁছে দেখলাম অগণিত ছাত্রছাত্রী আর জনতার মাঝখানে পুষ্পশোভিত একটি সুদৃশ্য শেভ্রোলেট গাড়ি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। সিকি মাইল দূরে গঙ্গা-কপোতাক্ষ পরিকল্পনার সুসজ্জিত বাংলোতে আমাদের অবস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সে টুকু পথও ওরা আমাদের হাঁটিয়ে নেওয়ার অগৌরব করবে না। গাড়িতে না উঠে ওদের শোভাযাত্রায় হেঁটেই বাংলাতে পৌঁছলাম। ওরা মনক্ষুণ্ন হল।

বাংলোতে পৌঁছে দেখি খানসামা-বোয়ারাদের দৌড়াদৌড়ি, হাঁকা-হাঁকি। খাঁটি ইংলিশ কায়দায় লাঞ্চ ডিনারের আয়োজন। ছাত্রদেরকে অমিত ব্যয়িতার জন্য তিরস্কার করলাম। ওরা হাসিমুখে চুপ করে রইল। কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রলীগের নেতা নূর আলম জিকু আমাকে চুপে চুপে সংবাদ দিল, ছাত্ররা গঙ্গা-কপোতাক্ষের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে গাড়ি, বাংলো এবং লাঞ্চ ডিনার আদায় করেছে, একটি পয়সাও ওদের দিতে হয়নি।

ভেড়ামারার মত ছোট্ট জায়গায় ছোট ছোট ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিপত্তির বহর দেখে অবাক হলাম। ছাত্র-সমাবেশ ও জনসভা শেষ করে রাতে ওদের নিয়ে বসলাম। ওদেরকে বোঝালাম, এমনি অপ্রয়োজনীয় বাড়াবাড়ির ফলে ছাত্র আন্দোলনই জনগণের সহানুভূতি হারিয়ে ফেলবে। ছাত্র সমাজের কাছে দেশবাসীর সহানুভূতি হারানোর চাইতে বড় ক্ষতি আর হতে পারে না।

ওরা ওদের ভুল বুঝতে পারল। কথা দিল ভবিষ্যতে এমন কাজ ওরা আর করবে না। সর্বত্রই ছাত্রদেরকে একথা আমরা হৃদয়ঙ্গম করাতে সমর্থ হয়েছি।

আমার ছাত্রজীবন প্রায় শেষ হওয়ার পথে। 'ল' পূর্বেই পাস করেছি। অল্পদিনের মধ্যে এম. এ পরীক্ষার ফল বের হবে। তার পরই প্রায় এক যুগের কর্মমুখর ছাত্র-আন্দোলনের ক্ষেত্র থেকে বিদায় নিয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করব।

www.pathagar.com

তাড়াতাড়ি প্রদেশময় সংগঠনের কাজ সমাধান করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ক্ষেত্র প্রস্তুতই ছিল। সংগঠন গড়ে উঠল অত্যন্ত দ্রুততার মধ্য দিয়ে। ছাত্রলীগকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে দেখে গর্বে আনন্দে বুক ছেয়ে গেল।

১৯৬৩ সালের নবেম্বরে ঢাকায় প্রাদেশিক সম্মেলন আহ্বান করলাম। তিন দিবসব্যাপী সে ঐতিহাসিক সম্মেলনে প্রদেশের সর্বপ্রান্তর থেকে বার শত প্রতিনিধি যোগদান করল। বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে সম্মেলনের কাজ শেষ হল। ওবায়দুর রহমান ও সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে কার্যকরী সংসদ গঠিত হল। সে সম্মেলনে শেষ বারের মত সভাপতিত্ব করে ছাত্রলীগ তথা ছাত্র-আন্দোলনের মধ্য থেকে বিদায় নিলাম।

তৃতীয় দিন আটই নভেম্বর সারা রাত্রি সম্মেলনের কাজ শেষে যখন বিদায়ী বক্তৃতা করতে দাঁড়ালাম তখন পূর্ব আকাশ ফর্সা হয়ে উঠেছে। রাত্রির অন্ধকার কেটে গিয়ে আগামী দিনের সূর্যালোকের স্নিগ্ধ আভা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রশ্ন উঠেছে, ছাত্ররা তাদের একমাত্র তপস্যা লেখাপড়া অবহেলা করে কেন আন্দোলনের মাঝে মেতে ওঠে এবং পূর্ব পাকিস্তানেই কেন ছাত্র আন্দোলন এত প্রবল। বিভিন্ন স্থানে আমাদেরকে এ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

দেশের সরকার দোষারোপ করে বলে এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী রাজনীতিকরাই নাকি নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ছাত্র সমাজকে রাজনৈতিক আবর্তে নিয়ে আসে। সরকারের এ দোষারোপ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। প্রথমত, ছাত্র সমাজ যে আন্দোলন গড়ে তোলে তাকে সরকারী ভাষায় রাজনৈতিক আন্দোলন বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে তাকে রাজনৈতিক আন্দোলন বলা উচিত নয়। ছাত্র সমাজ যেটুকু করে তা তারা নিজেদের গরজে বাধ্য হয়েই করে। স্বার্থান্বেষীদের অদৃশ্যহস্তের কারসাজী আবিষ্কার করে সরকার যখন আত্মতৃপ্তি লাভ করে, ছাত্র সমাজ তখন উপেক্ষার হাসি হাসে। ছাত্রদেরকে উস্কানি দেওয়া ত দূরের কথা এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে, যখন ছাত্র সমাজই তাগিদ দিয়েছে নিষ্ক্রিয় রাজনীতিকদেরকে সক্রিয় আন্দোলনে এগিয়ে

www.pathagar.com

আসার জন্য। এমনও হয়েছে, যখন ছাত্র সমাজই ঐক্যবদ্ধভাবে রাজনীতিকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ঘুরে তাদের মাঠে নামাবার প্রচেষ্টা চালিয়েছে দিনের পর দিন। এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয় – যখন ছাত্র সমাজের তাগিদে এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলেই পরস্পর কলহলিপ্ত রাজনৈতিক দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে এগিয়ে এসেছে।

কোন রাজনীতিবিদই যে ছাত্র-আন্দোলনের উস্কানি দেয় না একথা বলা সত্যের অপলাপ। হয়ত কেউ কেউ ছাত্রদেরকে সরকার বিরোধী আন্দোলনে এগিয়ে যেতে উৎসাহ দিতে চেষ্টা করে এবং সে আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতেও প্রয়াস পায়। কিন্তু এদের সংখ্যা অতি নগণ্য। প্রায় নেই বললেই চলে। দ্বিতীয়ত, যারা ছাত্র-আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করে, তারা এদের চাইতে বিদ্যাবুদ্ধি খুব কম রাখে না। এদের প্রভাব থেকে তারা সহজেই নিজেদেরকে মুক্ত রাখার যোগ্যতা বহন করে।

তাই ছাত্রসমাজকে যখনই বাইরের রাজনীতিকদের অনুচররূপে আখ্যায়িত করা হয়, তখন তাদের উপর সবচাইতে বেশী অবিচার করা হয়। অবশ্য ব্যতিক্রম নেই, একথা বলা চলে না। ব্যাকরণসিদ্ধ সূত্রের মধ্যেই যখন ব্যতিক্রম রয়েছে, তখন ছাত্র সমাজের মধ্যেও যে থাকবে না তা নয়। কিন্তু ব্যতিক্রম দিয়ে সমষ্টিকে বিচার করা চলে না। সমষ্টির পরিচয় তাদের কার্যধারার মধ্যেই সম্যক প্রতিফলিত হয়।

১৯৪৮ সালে যখন ছাত্রলীগ পূর্ব পাকিস্তানের বুকে প্রথম ছাত্র আন্দোলনের গোড়াপত্তন করে তখন ত উস্কানি দেওয়ার কেউ ছিল না। ১৯৬২ সালে যখন আমরা আন্দোলন গড়ে তুললাম তখন উস্কানি দেওয়া দূরের কথা – এমন রাজনৈতিক খ্যাতিবান ব্যক্তিদের দেখেছি, যারা আমাদের দেখলেই আতঙ্কিত হয়ে উঠতেন।

ছাত্র আন্দোলনের দায়িত্ব ছাত্র সমাজের উপরই ন্যস্ত করে অনুভূতিশীল মন নিয়ে একে বিচার করা উচিত। কী স্বার্থ বা প্রয়োজনের তাগিদে একজন ছাত্র নিজের আরাম-আয়েশ সুখ-স্বাচ্ছন্দকে অবহেলা করে শত দুঃখ আর নিপীড়নের পথ বেছে নিয়ে নিজেদের যৌবনের সোনালী দিনগুলিকে ব্যর্থ করে দেয়, কিসের তাড়নায় সে উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতকে অন্ধকারের নিঃসীমতায় টেনে নিয়ে যায়, কোন্ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সে হাসিমুখে চরম আত্মত্যাগে প্রস্তুত হয় – এসব প্রশ্নকে দরদী মন নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ

www.pathagar.com

করলেই ছাত্র-আন্দোলনের প্রকৃত কারণ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোককে বাদ দিলে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ একই সঙ্গে দরিদ্র এবং অশিক্ষিত। এই সব দরিদ্র এবং শিক্ষাহীন মানুষষের ঘর থেকেই ছাত্রদের পাঠান হয় উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য। পিতা-মাতা শত অভাব-অনটনের মাঝেও সন্তানের পড়ার খরচ জোগান নিজেদের শরীরের রক্তকে পানি করে। ভবিষ্যতের আশায় থাকে তারা, সন্তান তাদের শিক্ষিত হয়ে ফিরে আসছে, দুঃখ-দারিদ্র দূর করে অচিরেই শিক্ষিত সন্তান তাদেরকে সুখ-সম্পদের দ্বারে পৌঁছে দেবে। বুক ভরা আশা নিয়ে তারা দিন গণে।

কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে ছাত্ররা শিক্ষার আলোক বর্তিকায় কেবল নিজেকেই দেখতে পায় না, দু'চোখ খুলে তারা তাদের পারিপার্শ্বিককেও দেখতে পায়। দেখতে পায় তারা বিশ্বের মানুষের জীবনকে। বুঝতে শেখে মনুষ্যত্বের অর্থ, জানতে পারে মনুষ্যত্বের দাবী ও অধিকারকে। নিজের জ্ঞানে তারা উপলব্ধি করে, তারা প্রতারিত হচ্ছে এক আদৃশ্য শক্তির হস্তে। অশিক্ষিত পিতামাতার মতো ভাগ্যের দোহাই পাড়তে তাদের শিক্ষিত মন প্রস্তুত নয়।

তারা দেখতে পায় ভাগ্যের প্রশ্ন কোন প্রশ্নই নয়। পাটের দাম কমে যাওয়ার ফলে যখন তার চাষী পিতা মাসের বরাদ্দ টাকা পাঠাতে পারে না, তখন সে বুঝতে পারে পাটের মূল্যের নিম্নগতির মধ্যে লুকিয়ে আছে আদমজী-ইসপাহানী এবং তাদের ক্রীড়নকদের কারসাজী। তখনই সে প্রশ্ন করে, কৈফিয়ত চায়। একেই অন্য ভাষায় আন্দোলন বলা হয়।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপনান্তে পিতামাতার দুঃখ দুর করার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বেরিয়ে এসে সে দেখতে পায় বেকারত্বের সীমাহীন অন্ধকার তাকে ঘিরে আছে। তখন সে কর্মসংস্থানের দাবি তোলে। একেও রাজনৈতিক আন্দোলন বলা হয়। শিক্ষিত সন্তান যখন দেখতে পায় তার পিতা মাতা তথা দেশবাসী মানবতা এবং স্বাধীনতার মৌলিক দাবী থেকে বঞ্চিত, তখন শিক্ষার মূল্য দেওয়ার জন্যই তাকে সংগ্রামের পথ বেছে নিতে হয়।

দেশের আগামী দিনের নাগরিকরা যখন দেখতে পায় তার মাতৃভূমির সম্পদ দু'হাতে লুণ্ঠন করে নিয়ে বেনিয়া শক্তি অন্য অঞ্চলকে দিনের পর দিন গড়ে তুলছে – তখন সে মনুষ্যত্বের খাতিরেই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সে যখন দেখতে পায় তার পকেট থেকে জোর করে ছিনিয়ে নেওয়া অর্থ দিয়ে ধনীর

www.pathagar.com

পান-ভোজনের ব্যবস্থা হয়েছে, তার দরিদ্র পিতা-মাতার পানি-ভাতের ব্যবস্থা নেই, তখন সে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ওদের লুণ্ঠনকারী হস্ত চেপে ধরতে যায় – একেই ওরা বলে অহেতুক আন্দোলন।

দেশ মাতৃকার শিক্ষিত সন্তান যখন দেখতে পায় এদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি আর ভাষার উপর আঘাত নেমে আসছে, যখন দেখতে পায় সে ষড়যন্ত্রকে রুখে না দাঁড়ালে ভবিষ্যতের বংশধরেরা তাদের ক্ষমা করবে না, তখন তারা চিৎকার করে রাস্তায় বের হয়ে আসা ছাড়া গত্যন্তর খুঁজে পায় না। এরই অন্য নাম ছাত্র-আন্দোলন।

ছাপোষা দরিদ্র এবং অশিক্ষিত বাবা-মা যে সংগ্রামের ঝুঁকি নিতে পারে না, সে সংগ্রামই কাঁধে তুলে নেয় যোগ্য সন্তান। পিতার বক্ষ বিদীর্ণ করা হাহাকার আর মায়ের অঝোর অশ্রুধারাই তাকে সংগ্রামের পাথেয় জোগায়।

দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নের মধ্যে একজন শিক্ষিত ছাত্র তার নিজের অস্তিত্বের প্রশ্নই দেখতে পায়। তাই কোনটিকেই সে অবহেলা করতে পারে না। এছাড়াও রয়েছে ছাত্র সমাজের নিজস্ব সমস্যাবলী – যা তাকে বাধ্য করে সংগ্রামের পথ বেছে নিতে। স্কুল-কলেজের বেতন বৃদ্ধি, শিক্ষকের অভাব, বই পুস্তকের মূল্যবৃদ্ধি, ছাত্রাবাসের অভাব, শিক্ষায়তনের স্বল্পতা, সরকারের শিক্ষা-সংকোচন নীতি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে কালাকানুন প্রয়োগের ফলে উদ্ভূত সমস্যাবলী সমাধানের জন্য ছাত্রদেরকেই অগ্রণী হতে হয়। এটাই ছাত্র আন্দোলন।

ছাত্র আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, দরদী মন নিয়ে বিবেচনা করার প্রতিশ্রুতি দিলে সরকার প্রায়ই অনেক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এড়াতে সমর্থ হত। কিন্তু সে পথ গ্রহণ না করে সরকার অনমনীয় মনোভাব পোষণ করতে থাকে এবং অত্যাচার উৎপীড়নের মাধ্যমে আন্দোলনকে দমিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টায় থাকে। ফলে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। কতকগুলো তাজা তরুণ প্রাণকে ওরা চিরতরে বিনষ্ট করে দিয়ে বিদেশি শাসকদের অনুকরণে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করতেই হয়। রক্তের দান বৃথা যেতে পারে না।

যেখানে অন্ধকার সেখানেই আলোর প্রয়োজন। যেখানে অন্তহীন সমস্যা বিরাজমান সেখানেই সমাধানের দাবী জোরদার। তাই পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র-আন্দোলন এত প্রবল। এটা পূর্বপাকিস্তানের ভৌগোলিক বিশেষত্ব নয়। এটা

www.pathagar.com

পূর্ব পাকিস্তানের দুঃখজনক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিরই পরিণাম।

পৃথিবীর অনুন্নত এবং অশিক্ষিত স্থানগুলোর মধ্যে পূর্বপাকিস্তান অন্যতম। এখানকার জনসাধারণ তাদের দু বেলার অন্ন সংস্থানের প্রশ্নেই হিমশিম খায়, আন্দোলনের মাধ্যমে দাবী আদায়ের চিন্তা সব সময় তারা করতে পারে না। অশিক্ষা আর কুশিক্ষায় জর্জরিত মানুষেরা সংগ্রামের বন্ধুর পথ ছেড়ে ভাগ্য দেবতার ওপর দোষারোপের মাঝেই তৃপ্তি খোঁজে। তাই তাদের সন্তানদের সে ফাঁক পূরণের কর্তব্যে সাড়া দিতে হয়। পূর্ব পাকিস্তানের বুকে তাই ছাত্র আন্দোলনের ঢেউ সব চাইতে উত্তাল।

শুধু পাকিস্তান কেন পৃথিবীর যে কোন অনুন্নত দরিদ্র দেশের দিকে চাইলে এ সত্য দিবালোকের মত প্রতিভাত হয়। পৃথিবীর মুসলিম দেশসমূহ এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহেও ছাত্র-আন্দোলন একই কারণে ব্যাপকতা লাভ করেছে।

তারুণ্যের স্বাভাবিক প্রাণাবেগেই পৃথিবীর সমস্যা সঙ্কুল স্থান সমূহে ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। সূর্য উদয়ের দেশ জাপান থেকে শুরু করে মালয়েশিয়া, বার্মা, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ভারত, ইরান, তুরস্ক এবং আরব দেশসমূহে তাই বারে বারে ছাত্র-আন্দোলনের ঢেউ জাগে। তাই ত আজ ছাত্র আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক আন্দোলনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তাই ত বিশ্বজোড়া এর এত প্রভাব প্রতিপত্তি।

কদিন যাবৎ কবির সাহেবকে আই.বির লোকেরা অনবরত জিজ্ঞাসাবাদ করে চলেছে! সকাল-বিকাল চার ঘণ্টা করে দু'জন অফিসার কবির সাহেবকে নিয়ে প্রশ্ন উত্তরের পালা চালিয়েছে আজ পাঁচ দিন। জেলগেটের সে পালা শেষ করে এসে প্রতিবারই ক্লান্তিতে বিছানায় ভেংগে পড়ছে কবির সাহেব। যুক্তরাজ্যে অবস্থান করার প্রতিটি দিন আর মুহূর্তের পুঙ্ক্ষানুপুঙ্খ হিসাব চাচ্ছে ওরা। ওখানকার প্রতিটি বিক্ষোভ আর আন্দোলনে তার ভূমিকার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা ওদের দাবী।

জিজ্ঞাসাবাদ পর্বের শেষ দিন কবির সাহেব সেলে ফিরে এলে তাকে অত্যন্ত বিমর্ষ মনে হল। আমাদের প্রশ্নের জবাবে বললেন, সরকার তাকে যুক্তরাজ্যে ফেরত পাঠাবার পরিকল্পনা করেছে বলে তার বিশ্বাস। বিদায় মুহূর্তে আই. বি অফিসাররা ইঙ্গিত করে গেছে। দীর্ঘ বারটি বৎসর প্রবাসে কাটিয়ে

www.pathagar.com

জন্মভূমির কোলে ফিরে এসেছে যে সন্তান দেশমাতৃকার সেবার শপথ নিয়ে, তারই বুঝি স্থান সঙ্কুলান হচ্ছে না দেশের বুকে। দেশ এবং দেশের মানুষকে ভালবাসার জন্যই হয়ত কবির সাহেবকে দেশান্তরের গ্লানি বহন করতে হবে। তার মানসিক অবস্থা অনুধাবন করে আমরা যারপর নাই দুঃখিত হয়ে উঠলাম।

কিন্তু কবির সাহেব এবং আমাদের সকল দুশ্চিন্তা মুছে দিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে তার মুক্তির নির্দেশ এসে গেল। তার জবানবন্দী হয়ত ওদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে অথবা ব্রিটিশ নাগরিক কবির সাহেবকে দীর্ঘদিন আটক করে রেখে দেওয়া হয়ত যুক্তিযুক্ত মনে করছে না। কারণ যাই হোক, বদ্ধকারার লৌহ কপাট খুলতে দেখে আমাদের আনন্দ ধরে না। এমনি করেই একদিন বন্দরের কাল শেষ হয়ে যাবে। এমনি করে আমরাও একদিন কারাগারের বাইরে মুক্ত পৃথিবীর আলো-বাতাসে বিচরণ করতে পারব। প্রতিটি মুক্তিই আমাদের আকাঙ্ক্ষিত মুক্তজীবনের সম্ভাবনার বাণী বয়ে আনে।

পর পর বেশ কয়জন ব্রে মেম্বার মুক্তি পেয়ে যাওয়ায় আমাদের জমজমাট ব্রের আসর ভেংগে পড়ল। জেল লাইব্রেরির বহু পঠিত বইগুলির মধ্যে আর আমেজ নেই। শুয়ে বসে দিন কাটতে চাইছে না। মমিন সাহেব আমাকে এসে পাকড়াও করলেন, আপনাকে আমার পার্টনার হতে হবে। বুঝতে না পেরে তার দিকে তাকাতেই বললেন, ব্রীজ টুর্নামেন্ট শুরু হবে। লোক কম, আপনাকেই আমি পার্টনার নিয়েছি।

আমি ত সাত হাত জলের নীচে। ব্রীজ খেলা ত দূরের কথা তাসের কোন খেলাই আমি জানি না। জেলের মধ্যেই মাত্র সেদিন ইস্কাপনের বিবির প্রেমে পড়েছি।

মমিন সাহেবকে সবিনয় নিবেদন করলাম, তাসের রাজ্যে অন্ধ আমি, ব্রীজ পার হতে পারব না।

কিন্তু উদ্যোগী খেলোয়াড় মমিন সাহেবকে দমান গেল না। খাতা টেনে নিয়ে বসে গেলেন আমাকে ব্রীজের নিয়ম-কানুন রপ্ত করাতে।

www.pathagar.com

সুবোধ ছাত্রের মত ব্রীজের কায়দা-কানুন মুখস্থ করতে লাগলাম। কি করব? পড়েছি যবনের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে।

টুর্নামেন্ট খেলতে লাগলাম। যতই নিয়ম-কানুন মুখস্থ করি না কেন খেলতে বসলেই সব গোলমাল হয়ে যায়। কানুন হয়ত বজায় থাকে ঠিকই কিন্তু পরাজয় এড়াতে পারি না কিছুতেই। আমার অবস্থা হয়েছে সেই তিন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত।

অংক শাস্ত্রে অগাধ ব্যুৎপত্তিশীল তিন পণ্ডিত রাস্তা চলতে চলতে এক খালের ধারে এলেন। খালটি পার হতে হবে। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন, খালে তিন হাত জল। পণ্ডিতত্রয় অংক কষতে লাগলেন, তিন হাত জল হলে তিন জনের ভাগে এক হাত করে পড়বে। কাপড় ভিজবার কোন সম্ভাবনা নেই। তিন পণ্ডিত জলে নামলেন, তাদের কাপড় ভিজতে লাগল। তাড়াতাড়ি পাড়ে উঠে তারা নূতন করে অংক কষতে লাগলেন। নিশ্চয়ই অংকে কোথাও ভুল আছে, তা না হলে তাদের কাপড় ভিজতে পারে না। অংক কষে আবার তিনজন জলে নামেন – কিন্তু এবারও কাপড় ভিজতে থাকে। আবার উঠে অংক কষতে থাকেন।

তিন পণ্ডিতের অংক কষা চলতেই থাকে, কিন্তু ভিজবার সমস্যার সমাধান হয় না।

মমিন সাহেব যতই আমায় নিয়ম-কানুন শিখাচ্ছেন; আর যতই আমি দৈনিক কাগজের ব্রীজ কলামে হুমড়ি খেয়ে পড়ি না কেন ফলাফল একই। কিন্তু মমিন সাহেব একাই একশ। আমার মত এক ঠ্যাং খোঁড়া ঘোড়া নিয়ে বাজীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করলেন। তিন টিমের মধ্যে অবশ্যই নয়, রীতিমত পাঁচটি টিম ছিল।

মমিন সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় বেশি দিনের নয়। আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক নির্বাচিত হবার পরই তাকে জানতে পারি। এর পর ছয় দফা আন্দোলনের বাণী নিয়ে যখন আমরা প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় ঘুরতে থাকি, সে সময় তিনিও দলে ছিলেন। তাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ জেলখানার মধ্যেই পাই। আওয়ামী লীগে মমিন সাহেব যোগ দিয়েছিলেন অধুনা। ছাত্রজীবনে ভাষা আন্দোলন এবং অন্যান্য প্রগতিশীল আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। নেত্রকোনা মহকুমার মোহনগঞ্জের খান সাহেবের জ্যেষ্ঠ সন্তান মমিন সাহেব ঢাকা হাইকোর্টের একজন এ্যাডভোকেট। পেশায়

www.pathagar.com

আইনজীবী হলেও ঐশ্বর্যের বরপুত্র মমিন সাহেবকে জীবিকার জন্য আইনের দ্বারে ঘুরতে হয় না।

দিল-দরিয়া মানুষ মমিন সাহেব নির্বিকার চিত্তে জেল খেটে যাচ্ছেন। কোন বিশেষ ভাবান্তর তার মধ্যে নেই। ধনবান লোকদের স্বাভাবিক ব্যয়কুণ্ঠতা তার নেই। আমাদের কাছে তিনি একটি কামধেনু বিশেষ। ভলিবল কিনতে হবে পাকড়াও কর মমিন সাহেবকে, ব্লাডার ছিঁড়ে গেছে বল মমিন সাহেবকে, তাস কিনতে হবে খোঁজ মমিন সাহেবকে। আমাদের এমনি সব নিত্যকার প্রয়োজন তিনি হাসি মুখে মিটাতে কার্পণ্য করেন না।

এমনিতে খুব ভাল কিন্তু রেগে গেলেই তাকে নিয়ে মুশকিল। ইংরেজিতে যাকে 'কুইক টেম্পার' বলে – মমিন সাহেবেরও অনেকটা তাই।

সামান্য ব্যাপারেই রেগে আগুন হয়ে ওঠেন। উত্তেজনার কোন কারণ দেখলে আমরা তাকে নিয়ে সন্ত্রস্ত থাকি।

নিজের এই দুর্বলতাটির সম্বন্ধে তিনিও সজাগ। চেষ্টা করেন মেজাজটি শান্ত রাখতে। উত্তেজনার কোন ব্যাপারে এগিয়ে যেতে বললে হেসে নিজের মাথাটি দেখিয়ে বলেন এটাকে বিশ্বাস নেই, যা হয় আপনারই করুন।

মমিন সাহেবকে নিয়ে আমাদের বড় সমস্যা, তিনি আজও দার পরিগ্রহ করেননি। বয়স হল তবুও কেন এ ফরজ কাজটি তিনি করছেন না জিজ্ঞাসা করলেই হেসে উত্তর দেন, আমি কি করব? যখনই যাকে পছন্দ করি তখনই তার অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায়। আমার ঘটে না থাকলে কি আমি দায়ী?

এ উত্তরের মাঝে যে ফাঁক রয়ে গেল তা বুঝতে পেরেও চুপ করে যাই, কি করব! আমাদের এনকোয়ারী কমিশন সাহাবুদ্দিন চৌধুরীর পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই অবিবেচক সরকার তাকে খালাস দিয়েছে। চৌধুরী উপস্থিত থাকলে মমিন সাহেব নিশ্চয় এমন দায়সারা উত্তর দিয়ে পরিত্রাণ পেতেন না।

ভলি এবং ব্যাডমিন্টন খেলায় মমিন সাহেব বেশ পারদর্শী। কিছুদিন পূর্বেও আমাদের কোন আউটডোর খেলাধুলার ব্যবস্থা ছিল না। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অনেক দেন-দরবার করে শেষ পর্যন্ত আমরা খেলার মাঠ আদায় করেছি। আমাদের সেলের পশ্চাতে গোচারণের যে জমিটুকু ছিল তাতেই আমাদের খেলার মাঠের ব্যবস্থা হয়েছে। খেলার মাঠে আমাদের কসরত দেখে কয়েদি

www.pathagar.com

এবং ছোকরা ফাইলের ছেলেরা হেসে অস্থির। হার্টের রোগী ক্ষীণদেহী রফিক ভাই রীতিমতো জুতা মোজা পরে ভলিবল খেলতে নামেন। সারাক্ষণ অন্য খেলোয়াড়দের ভুল-ভ্রান্তির চলতি বিবরণ দিয়েই চলেছেন, কিন্তু তার কাছে একটি বল আসলেই সর্প দেখার মত লম্ফ দিয়ে পাঁচহাত দূরে সরে গিয়ে আত্মরক্ষার সফলতায় হেসে কুটপাট হয়ে পড়েন। তার কাণ্ড কারখানা দেখে হাসির গমকে খেলায় সাময়িক বিরতি এসে যায়।

এত করেও রফিক ভাই ভাগ্যলিখন খণ্ডাতে পারলেন না। একদিন একটি বল একেবারে তার দেহেই এসে পড়ল। সেটিকে ঠেকাতে গিয়ে রফিক ভাই বাম হাতের আঙ্গুলই মচকে ফেললেন। সেই যে খেলা ছাড়লেন, আর কোনদিন রফিক ভাইকে হাতী দিয়ে টেনেও মাঠে নামানো যায়নি। অঙ্গুলির এক্সরের জন্য শেষ পর্যন্ত তাকে মেডিক্যালেও দৌড়াতে হয়েছে। দীর্ঘদেহী মিজান ভাই এককালে নেটে হয়ত ভালই খেলতেন, কিন্তু এখন তাঁর এক একটি ভ্রান্ত স্ট্রোককে আমরা মেড ইন চাঁদপুর আখ্যা দিয়েছি।

জালাল সাহেব ত ইজিপশিয়ান খেলোয়াড়। তার প্রতিটি মার আর স্টাইলের মধ্যে কবির সাহেব মিশর দেশের ঘ্রাণ পেতেন। সেই থেকেই তাকে ইজিপশিয়ান খেলোয়াড় নাম দেওয়া হয়েছে। তার ভুলভ্রান্তি আবিষ্কার করাও আমাদের ধৃষ্টতা।

বেঁটে গোলগাল বজলুল রহমান যখন লুঙ্গি খুলে যাওয়ার ভয়ে ভুড়ির উপরে গামছার পট্টি বেঁধে খেলতে নামেন তখন মাঠের মধ্যে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বজলুল রহমানের জানের দোস্ত মহিউদ্দিন তখন মাঠে দুটো বল দেখতে পেয়ে কোনটা খেলবে ভেবে অস্থির হয়ে পড়ে।

কিন্তু সবাইকে পরাস্ত করে দিয়েছে আমাদের বর্তমান ম্যানেজার সিরাজ। খেলায় আগ্রহ আছে প্রচুর। খেলতে যাবেও প্রতিদিন। কিন্তু খেলার মাঠে তার এ্যাকশন দেখে আমরা খেলব কি পেটের খিল খুলতেই অস্থির হয়ে পড়ি। ম্যানেজারের বল মারার মধ্যে একটা আর্ট আছে – শুধু আর্ট নয় রীতিমত ফাইন আর্ট। বলটি আসার সাথে সাথে ত্রিভঙ্গ মূর্তি ম্যানজার যে সূক্ষ্ম কারুকার্যের সঙ্গে তার মোকাবেলা করে তাকে কেবল সেই 'দেবতার মন্দিরে দেবদাসী গো আমি পূজারিনী' নৃত্য-ভাবের সাথে তুলনা করা যায়। নৃত্যের আর্ট সুচারুভাবে পালিত হয় ঠিকই, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক বলটির স্পর্শদোষে ম্যানেজারের নৃত্য-পরা হস্ত দুটি কোনদিন দূষিত হয় না।

www.pathagar.com

সিরাজকে আমি অনেক দিন থেকে চিনি। দীর্ঘদিন ধরে তাকে আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে দেখতে পেয়েছি। বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সিরাজ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে। প্রতিটি আন্দোলনের কার্যালয়ে তাকে দেখা গিয়েছে নীরবে সাংগঠনিক কাজের মধ্যে মেতে থাকতে।

১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান কর্মী শিবিরের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিল সিরাজ। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির হকার সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সিরাজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে পরিচালিত সংগ্রামের ফলে ঢাকায় তিনটি হকারস্ মার্কেট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কয়েক হাজার বেকার হকার সে সব বিক্রয় কেন্দ্রে জীবিকা সংস্থানের পথ খুঁজে পেয়েছে।

শৈশবে পিতৃহীন সিরাজ নিজের পায়ে দাঁড়িয়েই লেখাপড়া শিখেছে। সহায়-সম্বলহীন জীবনে আত্মবিশ্বাস আর কঠোর শ্রমের মধ্যে দিয়েই সে নিজেকে দাঁড় করিয়েছ।

ম্যানেজার সিরাজের এখন দোর্দণ্ড প্রতাপ। কিছুদিন থেকে আমাদের রন্ধনশালা দশ সেলে চলে আসায় তার ক্ষমতা আরও বেড়ে গেছে। যখন যাকে খুশি খাওয়া বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে। তাকে খুশি রাখার জন্য আমরা সকলেই সচেষ্ট – কেননা একথা সার বুঝেছি, ভাতে মারার চাইতে বড় মার নেই।

সিরাজের অন্তরঙ্গ বন্ধু বজলুর রহমান আদর করে সিরাজকে 'মেরেজান' বলে ডাকে। ম্যানেজার শব্দের অক্ষরগুলিকে পারমিউটেশন কম্বিনেশন করলে নাকি এ রকমই দাঁড়ায়।

মিজান ভাই অসুস্থ হয়ে জেল হাসপাতালে চলে গেলেন। তাঁর অনুরোধে এ কয়দিনের জন্য তার ঘরে বাস করলাম।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছি। তোরাব আলী সামনে এসে দাঁড়াল, সঙ্কুচিত ভাবে বলল, চাচাজী, জেল আপীলের রায় বের হতে কতদিন লাগবে? বুঝলাম ওর মামলার জেল আপীল হয়েছে, তার রায় সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসা করছে।

www.pathagar.com

পেশায় আইনজীবী এ খবর সকলেই জানে। তা ছাড়া জেলখানায় ঘন ঘন আসাতে অনেকেই আমায় চেনে। দরখাস্ত লিখে দেওয়া, উকিলের কাছে সুপারিশপত্র পাঠান, মামলার বিষয়বস্তু শুনে পরামর্শ দেওয়া প্রভৃতি কাজ এখানেও করতে হয়।

অধিকাংশ কয়েদীরই জেল আপীল রয়েছে। খুব কম সংখ্যক ভাগ্যবান কয়েদী সরাসরি কৌশলী নিয়োগ করে হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্টে তাদের মামলা পরিচালিত করতে সক্ষম হয়। অন্যদেরকে অখণ্ডনীয় ভাগ্য লিখনের উপর নির্ভর করে ডেপুটি জেলার প্রণীত জেল আপীলের উপরই ভরসা করে থাকতে হয়। সে সব আপীলর রায় বের হতেও অত্যন্ত বিলম্ব হয়। অনেকের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সাজা খাটার প্রায় শেষ মূহূর্তে আপীলের রায় বের হয়। হাইকোর্ট এবং সুপ্রীম কোর্টের অত্যধিক কাজের চাপ এবং বিচারপতির স্বল্পতার জন্যই এরূপ বিলম্ব হয়ে থাকে।

তোরাব আলীকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোর কি মামলা?

ও লজ্জায় মাটির সাথে মিশে গিয়ে জবাব দিল, চাচাজী আমার মামলাটা খুব মন্দ। কর্মদোষে আমি ৩৬৬ ধারায় অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছি।

বুঝতে অসুবিধা হল না শ্রীমান নারী ধর্ষণ মামলার আসামী। একটু আশ্চর্যই হয়ে গেলাম। তোরাব আলীর মত সাদাসিধে, বিনয়ী এবং শান্ত ছেলের পক্ষে এমনি অপরাধ সংঘটিত করা সাধারণ ঘটনা হতে পারে না।

ওকে প্রশ্ন করে করে তখন যে ঘটনা শুনলাম, তাতে আমার ধারণা বদ্ধমূল হল, তোরাব আলী সত্যিই কর্মদোষে জেলের ঘানি টানছে। ওর বিবরণ এবং নীরব অশ্রুই সত্য ভাষণের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ওর মামলার নায়ক খলিলের কাছ থেকেও ওর নির্দোষিতার সমর্থন পেয়েছি।

ময়মনসিংহ জেলার নিভৃত পল্লী দক্ষিণ গাঁও গ্রামে তোরাব আলীর বাড়ি। চাষ-আবাদ করে বেশ স্বচ্ছল অবস্থায় সুখ-শান্তিতেই ওদের দিন কাটে। ওরা চার ভাই, ওর বাবা এখনো সবল হস্তে লাংগলের ফলা চেপে ধরে মাঠের পর মাঠ চাষ করতে পারে। চারটি জোয়ান ছেলে রয়েছে ঘরে। বড় দুই ছেলের বিয়ে দিয়ে নাতি-নাতনীর মুখও দেখে ফেলেছে, ওর বাবা। তোরাব আলী সকলের ছোট। সুখী চাষী পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান তোরাব আলী বাবা, মা, ভাই, ভাবীদের অত্যন্ত আদরের পাত্র। সারাদিন মাঠে কাজ করে বাড়িতে

www.pathagar.com

ফিরেই মায়ের স্নেহ, ভাবীদের আদর কুড়িয়ে তোরাব আলী গ্রামের আখড়ায় গিয়ে ঢোকে আড্ডা দেওয়ার মানসে। তোরাব আলীর সবই ভাল, পরিশ্রমী এবং সৎ ছেলে হিসেবে ওর সুনাম আছে। দোষের মধ্যে শুধু বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা দেওয়া। একটু রাত করে ঘরে ফিরে তোরাব আলী। বৃদ্ধা মা ঘুম থেকে উঠে ওর ভাত বেড়ে দেয়। ভাবীরা তখন স্বামীদের নিয়ে সুখ নিদ্রায় মগ্ন।

আড্ডাই তোরাব আলীর কাল হল। ইদানিং ওদের আখড়া মেতে উঠেছে খলিলকে নিয়ে। খলিল গ্রামেরই নিত্যহরির ছেলে। ওর পূর্ব নাম সত্যহরি। ওরা ছিল কৈবর্ত্ত দাস। পিতা মাতা উভয়ের মৃত্যুর পর একমাত্র সন্তান সত্যহরির হাতে কিছু টাকা এসে পড়ল। শৈশব থেকে ছেলেটা একটু বেপরোয়া, কিছুই মানতে চায় না। বেশ কিছু টাকা হাতে পড়ায় যুবক সত্যহরি ধরাকে সরা জ্ঞান করতে লাগল। ওর বাবা জীবিত থাকতে ওকে ব্যবসায় না ঢুকিয়ে দরজির দোকান করে দিয়েছিল ভাল মূলধন দিয়ে। সত্যহরির সে দরজির দোকান এক্ষণে গ্রামের সকল বখাটে ছেলেদের কেন্দ্রস্থল হয়ে পড়ল। সত্যহরির নজর পড়ল ঘোষ পাড়ার গোকুল ঘোষের মেয়ে মায়ারানীর উপর।

মায়ারা পাঁচ বোন, কোন ভাই নেই। গোকুল ঘোষের সাংসারিক অবস্থাও বেশ ভাল, মেয়েগুলি দেখতে সুশ্রী। বাড়িতেই শিক্ষক রেখে ওদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দিয়েছে গোকুল ঘোষ। বড় মেয়ে মায়াই সবচেয়ে সুন্দরী। বয়সও ষোল পার হল। গ্রামের সমস্ত যুবকদের তীব্র আকর্ষণের বস্তু মায়া। তার একটু হাসির জন্য তারা সব কিছু করতে প্রস্তুত। মায়া হেঁটে গেলে পশ্চাতে একাধিক দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়।

তরুণী মায়ার সেদিকে খেয়াল নেই, মিষ্টি হেসে সে চলে যায়। কারো দিকে সে চোখে তুলে তাকায় না। গাঁয়ের ছেলেরা মায়াকে জয় করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। সত্যহরি অনেকদিন থেকে মায়াকে হাত করার জন্য প্রচেষ্টায় ছিল। ঘোষপাড়ায় ওকে প্রায়ই আনাগোনা করতে দেখা যেত।

সেদিন দ্বিপ্রহরে মায়া ওদের বাড়ি সংলগ্ন পুষ্করিনীর ঘাটে এক মনে স্নান করছিল। সত্যহরি একটা বৃক্ষের আড়ালে দাঁড়িয়ে লোভাতুর চোখ দুটি দিয়ে মায়ার যৌবন প্লাবিত দেহকে লেহন করছিল। স্নানরতা বিবস্ত্রা মায়ার রূপ-সুধায় সত্যহরি এমনি মগ্ন হয়ে গিয়েছিল যে তার পশ্চাতে মায়ার ছোট বোন

www.pathagar.com

কণা এসে দাঁড়ালেও সে টের পায় না। কণা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কঠিন স্বরে বলে উঠল, সত্য দা, ছি! ছি! তোমার এমন কাজ, লুকিয়ে দিদির স্নান করা দেখছ?

মায়া ছোট বোনের কণ্ঠস্বর শুনে উপরের দিকে তাকিয়ে সব বুঝে ফেলল। ওর স্নানও প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। সিক্ত বসনেই দেহের ভাঁজগুলি আড়াল করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করতে করতে উঠে এল। সত্যর দিকে ঘৃণাভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পাশ কাটিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

কণা সত্যকে বলল, আমি বাবাকে গিয়ে এখুনি বলছি।

সত্য তখন মরিয়া হয়ে পড়েছে। সেও বলে বসল, বলগে যা। আমি তোর দিদিকে বিয়ে করব। ভালয় ভালয় বিয়ে না দিলে ছিনিয়ে নিয়ে যাব। দেখি তোরা কি করতে পারিস।

বলেই সত্যহরি হন হন করে হেঁটে চলে গেল।

কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়ল। মায়ারা সাবধান হয়ে গেল। ঘোষের মেয়ের বিয়ে কৈবর্ত্ত দাসের ঘরে হতেই পারে না। সত্যহরির বামন হয়ে চাঁদ ছোঁয়ার আকাঙ্ক্ষা দেখে সকলেই উপেক্ষার হাসি হাসল।

গ্রামের যুবকেরা কিন্তু সত্যহরিকে উৎসাহ দিতে লাগল। এদের মধ্যে মুসলমানই বেশি। সত্যহরি যখন দেখল সহজ পথে মায়াকে লাভ করার সম্ভাবনা নেই তখন সে বাঁকা পথে অগ্রসর হতে লাগল। দলবল জুটিয়ে একদিন স্নানের সময় মায়াকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার আয়োজন করল। কিন্তু সত্যহরির পরিকল্পনা পূর্বাহ্নেই প্রকাশ হয়ে পড়ায় সব ব্যর্থ হয়ে গেল। গোকুল ঘোষ হিন্দু সমাজের মজলিস আহ্বান করে সত্যহরির অত্যাচারের প্রতিবিধান চাইল। মজলিস সত্যহরিকে ডেকে এনে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণান্তে পঁচিশ ঘা জুতা মেরে সেবারের মত শাসিয়ে ছেড়ে দিল।

গোকুল ঘোষ মেয়ের বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল। অবস্থাপন্ন হিন্দু ঘরের সুন্দরী মেয়ের পাত্র যোগাড় করা পল্লী গ্রামে বেশ কষ্টকর ব্যাপার। গোকুল ঘোষ মেয়ের বিয়ের জন্য ছুটাছুটি করতে লাগল। একটি পাত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ভগবানের ইচ্ছা হলে হয়ত এখানেই হয়ে যাবে।

হিন্দু মজলিসে পাদুকা দ্বারা সম্বর্ধিত সত্যহরি হিন্দু ধর্মের উপর গোস্বা হয়ে গেল। জুতা খাওয়ার পরই তার দিব্য দৃষ্টি খুলে গেল – মূর্তি পূজা পাপ, হিন্দু

www.pathagar.com

ধর্মে মোক্ষ হবে না। সত্যহরি মুসলমান বন্ধুদের যার পর নাই উল্লাসের মধ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। ওর নামকরণ হল খলিলুর রহমান।

সদ্য ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত খলিলকে নিয়ে সমস্ত গ্রাম মেতে উঠল। আমাদের তোরাব আলীও দলের একজন উল্লেখযোগ্য পাণ্ডা। খলিল নবধর্মে দীক্ষিত হয়েই তার মুসলমান বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করল। সে এখন আর নিকৃষ্ট কৈবর্ত্ত দাস নয়। এখন সে ধর্মশ্রেষ্ঠ ইসলামের পা-বন্দ। সকল জাতের বড় জাত তার এখন। এখন কেন সে মায়াকে পেতে পারবে না। সে সকলকে বুঝিয়ে বলল, মায়াও তাকে চায়, কেবল সমাজ আর পিতামাতার শাসনের ভয়েই তার কাছে এগিয়ে আসতে পারে না। খলিলের বন্ধুরা তাকে উৎসাহ দিল, মায়াকে জোর করে ছিনিয়ে এনে মুসলমান করে বিয়ে করতে।

তোরাব আলী সে প্রস্তাবে বাধা দিল। সে বলল, কারো মেয়েকে জোর করে ছিনিয়ে আনা কেবল অন্যায়ই নয়, ধর্মে এর চেয়ে বড় পাপ আর কিছু হতে পারে না। আমি এর মধ্যে নেই।

যুবক বন্ধুরা তোরাব আলীর কথায় হেসে উঠল। মায়াকে অপহরণের পরিকল্পনা চলতে লাগল।

এ পর্যন্ত বলতে বলতে তোরাব আলী সে রাত্রে কেঁদে ফেলেছিল। বলেছিল, চাচাজী আমিও পাপী। তা না হলে ওদের সে পরিকল্পনার কথা আমি গোকুল ঘোষকে তখনই বলে দিলাম না কেন? কেন আমি সকলের কাছে ওদের ষড়যন্ত্র প্রকাশ করে দিয়ে এত বড় পাপ কাজকে রোধ করলাম না। সেই পাপেই আজ আমি জেল খাটছি। চাচাজী, সাজা আমার ঠিকই হয়েছ।

বলতে বলতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল তোরাব আলী।

ওকে শান্ত হওয়ার সুযোগ দিলাম, কিছুক্ষণ পর নিজেই আবার বলতে শুরু করল। খলিলরা ঠিক করল রাতের অন্ধকারে ওরা মায়াকে ছিনিয়ে নিয়ে আসবে। এ কাজে ওরা নিজেদের শক্তি সাহসকে যথেষ্ট মনে করল না। পার্শ্ববর্তী গ্রামের দু'জন নাম করা গুণ্ডা সদাগর আর রোস্তমকেও ওরা সংগ্রহ করল। সদাগর রোস্তম সহজেই এ কাজে খলিলদের সাহায্যে এগিয়ে এল।

সে সন্ধ্যার কথা তোরাব আলীর খুব মনে আছে। একটু আগেই লাঙ্গল গরু নিয়ে তোরাব আলী মাঠ থেকে ফিরে এসেছে। হাত মুখ ধুয়ে উঠানের এক কোণায় খোলা উনুনের পার্শ্বে বড় ভাবী আম্বিয়ার কাছে গিয়ে বসেছে।

www.pathagar.com

আম্বিয়া পিঁড়ি এগিয়ে দিয়ে মাটির বর্তনে খানকয়েক চিতই পিঠা ও একটু নারকেল গুড় দিয়ে বলল, ছোট মিয়া, বসে গরম পিঠা খাও। দেখি ক'খান খেতে পার। তোরাব আলী তখন আড্ডায় যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছে। গোটা দুই পিঠা গোগ্রাসে গিলে ঢক ঢক করে এক গ্লাস পানি খেয়েই সে উঠে পড়ল। ওকে উঠতে দেখে অম্বিয়া বলল, ওকি। যাচ্ছ কোথায়? কিছুই যে খেলে না, চিতই পিঠা নারকেল গুড় না তুমি এত ভালবাস?

ওর মাও ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, তোরাব আজ আর কোথাও যাস্ না। চুলার পারে বসে আমাদের সঙ্গে একটু গল্প কর আর পিঠা খা। রোজ সন্ধ্যায় কি বাইরে না গেলে চলে না?

ভাবির অনুরোধ, মায়ের কথা কোনটাই তোরাব আলীর কানে গেল না। সে যেতে বলল, পিঠা রেখে দিও সকালে যাব।

খলিলদের আসরে গিয়ে উঠল তোরাব আলী। সমস্ত আড্ডা তখন জমজমাট। তোরাব আলীকে দেখে ওরা উল্লসিত হয়ে উঠল। আজকের আসর এবং সকলের ভাব দেখে তোরাব আলী একটু চিন্তিত হলো। সদাগর আর রোস্তমকে দেখতে পেয়ে রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়ল সে। এদের অনেক অপকীর্তি আর নৃশংস ঘটনার কথা ওর জানা।

খলিল ওকে বলল, একটু পরেই মায়াদের বাড়ি যাব, আজ রাতেই ওকে নিয়ে এসে মুসলমান করে বিয়ে করব। তোমাকে আমার সঙ্গে থাকতে হবে দোস্ত।

তোরাব আলী ভয়ে পেয়ে গিয়েছিল, সে খলিলের প্রস্তাবে রাজি হল না। সওদাগর তোরাব আলীর কাঁধে হাত রেখে বলল, কি মিয়া, যাবে না কেন? ভয় পাচ্ছ? আরে সদাগর আর রোস্তম থাকতে ভয়টা কিসের?

সকলের প্ররোচনায় আর অনেকটা কম বয়সের উত্তেজনায় তোরাব আলী ওদের সাথে যেতে রাজী হয়ে গেল। এটাই হল ওর জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক ভুল।

রাত্রি আটটার সময় ওরা মায়াদের বাড়ির দিকে রওনা হল। পল্লী গ্রামে তখনই বেশ রাত হয়ে গিয়েছে। ওরা মায়াদের বাড়ি পৌঁছে দেখতে পেল মায়া তখনও জেগে পড়াশুনা করছে। এবার সে প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পরীক্ষা

www.pathagar.com

দিবে। মায়ার ঘরে ওর একটি ছোট বোন ও দিদিমা শুয়ে আছে। তোরাব আলীরা ঘরের চারিদিকে অন্ধকারে ওৎ পেতে রইল।

কিছুক্ষণ পরেই মায়া ওর দিদিমাকে ডেকে তুলল, দিদিমা ওঠ, বাইরে যাব। হাই তুলতে তুলতে বৃদ্ধা উঠে দরজা খুলতেই রোস্তম আর সদাগর ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে মায়ার মুখে কাপড় চাপা দিয়ে ওকে পাঁজা-কোলা করেই ছুটে বেরিয়ে আসল। চক্ষের নিমিয়ে ওরা মায়াকে নিয়ে চলে এল। ওর দিদিমা আর বোনের চিৎকারে অন্যান্য ঘর থেকে সবাই বের হওয়ার পূর্বেই ওরা সরে পড়তে সমর্থ হল। কিন্তু তার পূর্বেই মায়ার দিদিমা খোলা জানালার নীচে দণ্ডায়মান তোরাব আলীকে দেখতে পেয়েছে।

দৌড়তে দৌড়তে তোরাব আলী শুনতে পেল মায়ার দিদিমার কণ্ঠস্বর, ওরে খাঁ পাড়ার তোরাব আলীও এর মধ্যে আছে রে।

ততক্ষণে সমস্ত গ্রামে সাড়া পড়ে গেছে। চিৎকার লোকজনের দৌড়াদৌড়িতে রাতের নিস্তব্ধতা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে। লোকজনের সোরগোল আর ঘোষপাড়ার স্ত্রী-পুরুষের চিৎকার আশপাশের গ্রাম থেকেও লোকজন ছুটে আসতে শুরু করেছে।

তোরাব আলী দৌড়ে ওদের বাড়িতে ঢুকে নিজের ঘরে গিয়ে শয্যা গ্রহণ করল।

এদিকে সদাগর আর রোস্তম মায়াকে নিয়ে ছুটতে ছুটতে গ্রামের উত্তরে যে গহীন জঙ্গল রয়েছে সেখানে ঢুকে পড়েছে। খলিল চেষ্টা করেও অন্ধকারের মধ্যে ওদের ধরতে পারেনি। পূর্ব পরিকল্পনা মত খাল পাড়ে যে নৌকাটি ঠিক করে রেখেছিল দৌড়ে সেখানেই গেল। কিন্তু রোস্তম, সদাগর বা মায়াকে দেখতে না পেয়ে উন্মাদের মত দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল। ওর দলের অন্য সবাই ততক্ষণ যার যার বাড়িতে ঢুকে পড়েছে।

নরপিশাচ সদাগর আর রোস্তম মায়াকে সেই জঙ্গলের অভ্যন্তরে উন্মুক্ত ছোরার নীচে রেখে যথেচ্ছা ভোগ করল। ভয়ে অর্ধমৃতা মায়ার অনাঘ্রাতা দেহের উপর দুটি শকুনের ঘৃণ্য ক্ষুধার তৃপ্তি লাভ হল। হতভাগিনী মায়া তার জীবনের ষোলটি বসন্তের সঞ্চিত যৌবনসুধা দুটি নরপশুর কামানলে বিসর্জন দিল। সারা রাত ধরে তার উপর পশুদ্বয়ের অত্যাচার চলল। বহুদিন পর এমনি উৎকৃষ্ট ভোজ্য পেয়ে ওরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

www.pathagar.com

মায়ার জবানবন্দীতে পরে জানা গিয়েছিল তার উপর পাঁচবার অত্যাচার সে স্মরণ করতে পারে। তার পরই সে অজ্ঞান হয়ে যায়। ডাক্তারদের রিপোর্টে প্রকাশ পায় অজ্ঞান হওয়ার পরেও ওকে রেহাই দেওয়া হয়নি। ভোররাতের দিকে মায়ার ক্ষতবিক্ষত সংজ্ঞাহীন দেহ জঙ্গলের পার্শ্বে ফেলে দিয়ে ওরা পালিয়ে যায়। পরদিন সকালে মায়ার অজ্ঞান দেহ গ্রামবাসীরা দেখতে পায়।

পরের ইতিহাস অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। সে রাতেই থানা থেকে দারোগা-পুলিশ এসে সমস্ত দক্ষিণগাঁও গ্রাম চষে ফেলে।

তোরাব আলী, খলিল এবং আরও কয়েকজনকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। তোরাব আলীর আর নারকেলি গুড় দিয়ে পিঠে খাওয়া হয় না। সে বলে, মায়ের নিষেধ না শুনে আড্ডায় গিয়ে সে কেবল মার মনেই আঘাত দেয়নি, সে যে খোদার মনেও আঘাত দিয়েছে। তাই ত খোদার অভিশাপ নেমে এল তার জীবনে।

মামলায় মায়া সাক্ষী দিল, সে কাউকে চিনতে পারেনি। তোরাব আলী এবং খলিলের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিল মায়ার বৃদ্ধা দিদিমা এবং ওর ছোট বোন কণা ও মীনা। আরও সাক্ষী জুটে গেল। সকলেই তোরাব আলীর ডুবন্ত তরীকে আরও ডুবিয়ে দিয়ে গেল। বিচারে তোরাব আলী আর খলিলের সাত বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হল।

মায়ার প্রেমপ্রার্থী, তার অকলঙ্কিত জীবনের শনি খলিল তার দেহের স্পর্শও লাভ করতে পারেনি। যে দু'টি হাতে মায়ার লজ্জারক্ত সুন্দর মুখটি তুলে ধরে চুম্বনের স্বপ্নে বিভোর হয়েছিল খলিল, আজ সেই হাত দু'টি দিয়েই তাকে অপকর্মের ঋণ শোধ করতে হচ্ছে। জেলখানার সবচাইতে কষ্টকর ফাইল গম চাক্কীর গম পিষে আজ খলিলের সেই হাত দুটির তালুতে ফোস্কা ফুটেছে। কর্মদোষে তোরাব আলী আজ জেলের ঘানি টানছে।

মাঝখান থেকে দুটি ক্ষুধার্ত পশুর পৈশাচিক কামানলে কুমারী মায়ার সুন্দর পবিত্র দেহ কালিমা লিপ্ত হয়ে গেল।

কাহিনী শেষ করে তোরাব আলী অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে কাঁদল। ওর মনের গ্লানি দূর হয়ে যাওয়ার জন্য ওকে কাঁদতে দিলাম। নীরবে ওর অশ্রুসিক্ত কালো মুখটির দিকে চেয়ে রইলাম। মনে হল, অনুশোচনার অশ্রুতে ওর সব গ্লানি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। অন্তরের শুভ্রতা ওর কালো মুখমণ্ডলকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

www.pathagar.com

কাগজে একটি তরুণ বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ পড়ে শোকাভিভূত হয়ে পড়লাম। কিশোরগঞ্জ বারের তরুণ উকিল সংগ্রামী রাজনৈতিক কর্মী আবু তাহের খান পাঠান যে এত শীঘ্র এ পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে পরলোকে চলে যাবে তা ভাবতেও পারিনি।

লম্বা একহারা গড়নের শ্যামবর্ণের যুবকটিকে যেদিন প্রথম ইকবাল হল ছাত্রলীগের সভায় বলিষ্ঠ কণ্ঠে বক্তৃতা দিতে শুনি, সেদিন থেকেই তার প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করেছি। অল্পকালের মধ্যেই খান পাঠান তার কর্মদক্ষতা, সাহস এবং হৃদয়ের গুণাবলীর বলে আমাদের মধ্যে একটি স্থায়ী আসন লাভ করে। অচিরেই আমরা পরস্পরের বন্ধু হয়ে উঠি। খান পাঠানের সঙ্গে যতই মিশেছি ততই তার গুণাবলীর পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি।

বেশির ভাগ সময় একটি খদ্দরের জহর কোট গায়ে থাকত তাহেরের। খুব কম কথা বলার অভ্যাস ছিল তার। কিন্তু যখন বলত, প্রয়োজনীয় বক্তব্যের মধ্যে তার সংগ্রামী চিন্তাধারার বলিষ্ঠ অভিব্যক্তিটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠত।

যত কঠিনই হোক না কেন একটা কাজের দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করে নিশ্চিত হওয়া যেত। রবারের মত টেনে ছাত্র জীবনকে অহেতুক বাড়িয়ে তোলার পক্ষপাতি ছিল না খান পাঠান। দু'বৎসরের মধ্যে আইন পাশ করে কিশোরগঞ্জ বারে যোগ দিয়ে ঘর-সংসার করে তাড়াতাড়িই কর্মজীবনে প্রবেশ করে। অল্পকালের মধ্যে আইনজীবী হিসাবেও সফলতা লাভ করতে থাকে। পেশার বাইরে সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রাঙ্গণেও খান পাঠান সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে থাকে। জীবনের মাত্র শুরু আগামী দিনের সম্ভাবনার দ্বারমাত্র খুলে গিয়েছে খান পাঠানের সম্মুখে। এমনি সময়ে পরলোকের ডাক এসে পড়ল তার কাছে। পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব আর তার গুনমুগ্ধ সহস্র মানুষকে শোকের সাগরে নিক্ষেপ করে চিরতরে চলে গেল আবু তাহের খান পাঠান। দেশ একটি সত্যিকারের সেবক হারালো আর আমরা হারালাম একজন দরদী বন্ধু এবং সংগ্রামী সহকর্মীকে। দেশের অভাব ঘুচবে কিনা জানি না কিন্তু আমাদের অভাব যে ঘুচবে না তা বিলক্ষণ জানি।

কদিন পর আরও একটি মৃত্যু সংবাদ আমাকে বিহ্বল করে দিল।

www.pathagar.com

বিচারপতি ইব্রাহিম সাহেবের মৃত্যুতে সারা দেশই শোক পালন করেছে, কিন্তু লৌহকপাটের অন্তরালে তাঁর একজন অত্যন্ত স্নেহাস্পদ ভক্তের হৃদয়ে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা কেউ জানবে না। এখানেও সবাই তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন, তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করেছেন। আমিও তাতে শরীক হয়েছি, কিন্তু আমার সমস্ত হৃদয় জুড়ে যে তীব্র ব্যথা এবং ব্যক্তিগত ক্ষতির বেদনা অনুভব করেছি তা অন্যদের উপলব্ধি করতে দেইনি।

বিচারপতি ইব্রাহিম সাহেবের কথা এদেশের মানুষকে বলার অপেক্ষা রাখে না। পূর্ব বাংলা এবং পাকিস্তানের সমস্ত অঞ্চলের মানুষই তাঁকে জানতেন। তার সম্বন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ড. সিদ্দিকীর মন্তব্যটি আমার সবচাইতে বেশি মনঃপুত হয়েছিল। কার্জন হলের এক সম্বর্ধনা সভায় ড. সিদ্দিকী বিচারপতির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন : In him law has been personified.

সত্যিই মরহুম ইব্রাহিম সাহেবের জীবনের সাথে আইন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। আইন ব্যবসায়ী হিসেবে যে জীবনের শুরু হয়েছিল তা পরবর্তীকালে আইনের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গনে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। ল' কলেজের অধ্যাপনা থেকে শুরু করে দীর্ঘকাল বিচার বিভাগের বিভিন্ন স্তরে কাজ করে হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করেও কর্মজীবনে পরিত্যাগ করেননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তানের আইনমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে গেছেন তিনি। ভাইস চ্যান্সেলার থাকাকালীন আমি তাঁর স্নেহের দৃষ্টিতে পড়েছিলাম। কিন্তু আইনমন্ত্রীর পদ থেকে যখন তিনি পদত্যাগ করে চলে আসেন তখন থেকেই তাঁর সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কেন জানি না তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁর স্বপ্ন ও কল্পনার ছবি আমার কাছে তুলে ধরতেন।

এ সময়ে তাঁর সাথে মিশে আমি তাঁর যে পরিচয় পেয়েছি তা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধির কথা – ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। আইয়ুব সাহেবের মন্ত্রীসভায় যোগ দেয়ার জন্য তিনি অনেকের কাছেই বিরূপ সমালোচনা লাভ করেছেন। কিন্তু আমি জানি, শুধু এ দেশের মানুষের মঙ্গল চিন্তাই তাঁকে বৃদ্ধ বয়সে সে দায়িত্ব নিতে প্রেরণা দিয়েছিল। জীবনে সম্মান-প্রতিপত্তি তিনি কম পান নি – সে সবের প্রতি লোভ তাঁর ছিল না। তাঁর দৃষ্টিতে ছিল পূর্ববাংলার নিপীড়িত মানুষের মুক্তির প্রশ্ন। তিনি ভেবেছিলেন রাজনৈতিক দলাদলির ঊর্ধ্বে

www.pathagar.com

অবস্থানকারী সৈনিক-শাসনর্তার কাছ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের সুখ-সমৃদ্ধি আদায় করে আনতে সক্ষম হবেন।

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে ওদের সত্যিকারের রূপ তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়ে উঠল। ওদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হল। তিনি দেখলেন তাঁর স্বপ্ন এখানে সফল হবার নয়। এক কথায় পদত্যাগপত্র পেশ করে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে চলে এলেন। আর ফিরে গেলেন না।

এর পর থেকে তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত এদেশের মানুষের মুক্তির চিন্তায় পর্যবসিত হয়েছে। তাঁর প্রতিটি কাজ, প্রতিদিনের ধ্যান-ধারণা আর স্বপ্ন পূর্ববাংলার মানুষের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শোষণ মুক্তির চিন্তায় রূপ লাভ করেছে। বৃদ্ধ বয়সে কঠিন শারীরিক পীড়া অবহেলা করে তিনি প্রায় প্রতিটি দিন বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সভা-সমাবেশে যোগ দিয়ে তার স্বপ্ন ও সাধনার বাণী শুনিয়েছেন। অচিরেই তিনি পূর্ব বাংলার মুক্তপ্রাণ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হয়ে ওঠেন। মৃত্যুর পূর্ব দিন পর্যন্ত তাঁর কণ্ঠ থেকে গণতন্ত্রের স্বপক্ষে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামী বাণী ধ্বনিত হয়েছে। এক রাতে ইব্রাহীম সাহেবের পুরানা পল্টনের বাসায় গিয়েছিলাম তাঁর অসুস্থতার কথা শুনে। সিরাজুল আলম খান ও বাসার মৃধাও ছিল আমার সঙ্গে। কুশলাদি বিনিময়ের পর তিনি তাঁর অন্তরের কয়েকটি কথা বললেন আমাদেরকে। লোহার সিন্দুক খুলে একটি ব্যাঘ্রের প্রতিকৃতি খচিত মনোগ্রাম ও একটি নূতন পতাকার নমুনা দেখালেন। বললেন, ওদের সাথে থাকা চলবে না। স্বাধীনতার জন্য আজ হোক, কাল হোক, যুদ্ধ তোমাদের করতেই হবে। অর্থের প্রয়োজন হলে সাধ্যমত আমি দেব। আমার দু'বিঘে জমি আছে আমাবাগানে, বিক্রি করে তোমরা টাকা নিতে পার।

একটু থেমে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, আমি কি নূতন সূর্য দেখে যেতে পারব? তোমরা কি আমাকে সে আলোর ছটায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সৌভাগ্য দিবে?

তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তর সেদিন মুখে দিতে পারিনি, কিন্তু মনে মনে দিয়েছিলাম। হৃদয়ের গভীরে সে কথা অনুরণিত হয়েছিল। জানি না, সে নীরব প্রতিশ্রুতি সম্ভাবনার আলোতে আসতে সক্ষম হবে কিনা!

তাঁর স্বপ্ন কবে সফল হবে জানি না। কিন্তু এইটুকু জানি পরাধীনতার শৃঙ্খল

www.pathagar.com

ভেঙ্গে শোষণমুক্ত পূর্ব বাংলার মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধির ছবি দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর বিদেহী আত্মা তৃপ্তি লাভ করবে না।

পর পর দু'টি দুঃসংবাদে মানসিক যাতনার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলাম। এমনি সময়ে একটি প্রত্যাশিত সুসংবাদ পেয়ে উজ্জীবিত হয়ে উঠলাম। কাগজে দেখলাম মোশতাক ভাই বার কাউন্সিল নির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেছেন। ঢাকা হাইকোর্টের বিশিষ্ট এডভোকেট আওয়ামী লীগ নেতা খন্দকার মোশতাক আহমদকে মুজিব ভাই, নুরুল ইসলাম চৌধুরী এবং তাজউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে একই রাত্রে গ্রেফতার করা হয়। মুজিব ভাইকে ঢাকা জেলে রাখলেও এঁদের তিনজনকে কুমিল্লা, বগুড়া এবং ময়মনসিংহ জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। হাইকোর্টে নুরুল ইসলাম চৌধুরী সাহেবের আটকাদেশ অবৈধ ঘোষিত হওয়ায় তিনি অচিরেই বগুড়া জেল হতে মুক্তি পেয়ে যান। খন্দকার সাহেব এখনও কুমিল্লা জেলে দেশরক্ষা আইনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছেন।

আইন ব্যবসায়ী এবং আইনজীবীদের নিয়ন্ত্রিত করার জন্য সরকার নূতন আইন করেছেন – বার কাউন্সিল এ্যাক্ট। কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্য নির্বাচিত হবেন আইন ব্যবসায়ীদের মধ্য থেকে। কারান্তরালে আবদ্ধ থেকেও হাইকোর্টের সুপরিচিত এ্যাডভোকেট এবং প্রখ্যাত বাগ্মী খন্দকার মোশতাক আহমদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামলেন।

প্রদেশব্যাপী মোশতাক ভাইয়ের যে পরিচিতি আছে তাতে আমরা আশা করেছিলাম তাঁর নির্বাচনে অসুবিধা সৃষ্টি হবে না। তবুও আমরা চিন্তিত হয়ে পড়লাম। জেল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যদি হেরে যান – সে হবে আমাদের সকলের পরাজয়। আইনজীবী হিসেবে আমারও কর্তব্য রয়েছে।

তাছাড়া তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। নিরহঙ্কার, সরল ও খুরধার যুক্তির অধিকারী মোশতাক ভাইকে আমার অত্যন্ত ভাল লাগে। তাঁর অকৃত্রিম স্নেহের পরশে আমি উদ্ভাসিত। রাজনৈতিক অঙ্গনে স্বচ্ছ চিন্তাবিদ, ন্যায়নিষ্ঠ সমাজবাদী ও সত্যিকারে গণতন্ত্রমনা একজন আদর্শবাদী সংগ্রামী নেতা হিসেবে তিনি সুপরিচিত। তাই তাঁর নির্বাচনের সাফল্য সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তবুও চুপ করে বসে থাকতে পারিনি। কোর্ট হাজতের প্রাঙ্গনে সহকর্মী বন্ধুদের হাত ধরে অনুরোধ করে আসি মোশতাক ভাইকে

www.pathagar.com

জয়যুক্ত করতেই হবে। বিভিন্ন জেলায় আইনজীবী বন্ধুদের কাছে ব্যক্তিগত আবেদন পাঠাবার ব্যবস্থা করে আসি – মোশতাক ভাইকে একটা ভোট দিতেই হবে।

এক কারাগারে বন্দী প্রার্থীর জন্য অন্য কারাগারের বন্দীর ক্যানভাস দেখে বন্ধুরা হাসে। কিন্তু আশ্বাস দিতে ভোলে না আমাদের মোশতাক ভাই আজ ওদেরও ভাই হয়ে পড়েছেন। তাঁর পক্ষে ওরা কাজ করবে বৈকি।

নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হলে আমরা যারপর নাই আনন্দিত হয়ে উঠলাম। বন্দী মোশতাক ভাইয়ের বিজয়ে আমরা দশ সেলের বন্দীরা নিজেদের বিজয়োল্লাস পালন করলাম। দুঃখ রইল মোশতাক ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানাতে পারলাম না। কিন্তু এ কথা জানি বুকে বুকে না মিলুক – দূরের কারান্তরালে থেকেও মোশতাক ভাই তাঁর অন্তরের নিভৃতে আমাদের শুভেচ্ছা আর অভিনন্দনের স্পর্শ লাভ করবেন।

গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে কিছুদিন ফেরার থাকতে হয়েছিল। রাজনৈতিক পরিভাষার এই আন্ডার গ্রাউন্ডে বাস করা কারাবাসের চাইতেও অস্বস্তিকর। এক শ্রেণীর রাজনৈতিক কর্মী আছেন যাঁরা আন্ডার গ্রাউন্ডের তাঁদের প্রতিভার প্রকৃষ্ট স্বাক্ষর রাখেন, কিন্তু আমরা যারা নিয়মতান্ত্রিক আইনানুগ জীবন যাত্রার অভ্যস্ত তাদের পক্ষে ফেরারী জীবন সুগম হতে পারে না। জনগণের মাঝে পরিচিতি সম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে একথা আরও প্রযোজ্য।

শত বিতৃষ্ণা থাকলেও অনেকবারই আমাকে ফেরার হতে হয়েছে। আন্দোলনের প্রারম্ভেই যখন গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারী হয়ে গিয়েছে, পূর্বাহ্নে সংবাদ আহরণ করে কাজের স্বর্থে গা-ঢাকা দিতে হয়েছে। পুলিশ ও টিকটিকির চোখে ধুলো দিয়ে দিন যাপন করা তেমন কষ্টসাধ্য নয়। চলমান আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করাই যা কষ্টকর। অভিজ্ঞতায় দেখেছি, এদেশে পুলিশ ও আই বি বিভাগ অন্যত্র প্রচুর যোগ্যতা রাখলেও এসব ক্ষেত্রে সব সময় সফলতা লাভ করতে পারেন না।

অনেকদিন থেকেই সাদা-পুলিশের সদাসতর্ক দৃষ্টি আমাকে ছায়ার মত অনুসরণ করে। নিদারুণ প্রাকৃতিক দূর্যোগের দিনে বাত্যাবিদ্ধস্ত চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

জেলার নিভৃত পল্লীতে ছাত্রদের নিয়ে রিলিফ করতে গিয়েও এদের অনুপস্থিতির অভাব অনুভব করিনি। কিন্তু যখন আমাকে গ্রেপ্তার করার প্রয়োজন হয়েছে তখন এদের চোখে ধুলা দিতে এতটুকু বেগ পেতে হয়নি। এদের সে সময়ের ব্যর্থতার যারপর নাই পুলক অনুভব করেছি।

ফেরার থেকেও যত্রতত্র ঘোরাফেরার জন্য প্রথম দিকে বন্ধুরা তিরস্কার করতেন কিন্তু পরবর্তী সময়ে আমার উপস্থিতি তাদেরও সহজ বোধ হয়েছে।

এক রোববার সকালের দিকে এডভোকেট মঞ্জুরুর রহীম সাহেবের বাসায় গিয়ে দেখি আসর জমজমাট। আইনজীবিদের রবিবাসরীয় আড্ডা গরম হয়ে উঠেছে 'রামি' খেলার মাঝে। প্রতি পেয়েন্টে আয়ুবের এক পয়সা। আলহাজ সৈয়দ মোহাম্মদ আলী, আবদুল মতীন, খন্দকার মাহবুব ও মঞ্জু ভাই মিলে ভোর থেকেই তাস খেলায় লেগে গেছেন। ভাব দেখে মনে হল তাঁরা ন্যাশনাল টাইম নষ্ট করতে প্রস্তুত নন।

আমার আকস্মিক উপস্থিতিতে প্রথমটায় হটচকিয়ে উঠলেও পরক্ষণেই সবাই সাদর অভ্যর্থনা করলেন।

মোহাম্মদ আলী ভাই তার স্বভাবসুলভ হাস্যোদীপ্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, এস ভাই, এস। পঞ্চরত্ন না হলে কি খেলা জমে।

বেশ কিছুদিন বন্ধুসঙ্গ-বিবর্জিত আমি সারাটি দিন আনন্দের মাঝে তাস খেলায় কাটিয়ে দিলাম। সেন্ট গ্রেগরীজ স্কুলের প্রাক্তন সহপাঠি বন্ধুদের সান্ধ্য আসরেও মাঝে মাঝে হাজির হয়ে গিয়েছি। আমার উপস্থিতির ফল বিপদজনক হতে পারে জেনেও তারা আমায় পেয়ে অনাবিল আনন্দে মেতে উঠেছেন।

ছাত্রাবস্থায় যতবার ফেরার হয়েছি প্রথমেই গিয়ে উপস্থিত হতাম রতনদের বাড়ি। সাথে ছাত্রলীগ কর্মী ময়না বা আবদুল্লা। ঢাকার অদূরে ওদের বাড়ি থেকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার সুবিধা ছিল। তাছাড়া দাদা, ভাবী, রতন, ওর বৌ জুই, গগন, মাখন ওরা সবাই আমাকে স্নেহ ভালবাসা ও শ্রদ্ধায় এতটা কাছে টেনে নিয়েছে যা চিরদিন আমার আকর্ষণ করবে। এই পরিবারের প্রতিটি সদস্য আমার অত্যন্ত আপন। ওদের বাড়িতে আমি নিজের বাড়ির সহজতা অনুভব করি।

এমনিতে শত অনুরোধে আবদার সত্ত্বেও কর্মব্যস্ততার জন্য যাওয়া হয়ে ওঠে

www.pathagar.com

না। কিন্তু গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হলেই সোজা ওদের ওখানে গিয়ে হাজির হই। আমায় দেখতে পেলেই ওরা বুঝতে পারে – নিশ্চয়ই পুলিশ তাড়া করেছে। দাদার গিন্নী, যাকে আমরা খাদ্যমন্ত্রী বলে খোষামোদ করি, দৌড়ে এসে পান-চর্চিত সুন্দর মুখটিতে এক ঝলক হাসি ছড়িয়ে হাত মুখ নেড়ে বলে ওঠেন, বিড়াল কি মান্দার গাছে সহজে ওঠে! এতদিনে সিশ্চয়ই আবার পুলিশে তাড়া করেছে। তাই শ্রীমানের আগমন হল। পালাবার বেলায়ই ভাবীর আঁচল – সুদিনে মাথার টিকিটিও দেখতে পাই না। হাসি মুখে খাদ্য বিভাগের গঞ্জনা সহ্য করি। জানি রূপের প্রসংশাই ভাবীর সব চাইতে বড় দূবর্লতা। বলি, ভাবী, অনেকদিন পর আপনাকে দেখলাম। আরও বেশি সুন্দর হয়েছেন আপনি। দিন দিন বয়স যেন আপনার কমছে। পাঁচ বাচ্চার মা হলে কি হবে এখনও আপনাকে কুমারী বলে চালিয়ে দেওয়া যায়।

মনের আনন্দ মুখের ঝামটায় আড়াল করে হাসি চেপে ভাবী চলে যান আমার ফরমায়েশ করা খাবারের আয়োজন।

এবার ফেরা হয়ে ওদের ওখানে যাওয়া হয়নি। মাখন সেদিন দেখা করতে এসে সকলের পক্ষে আমায় অনুযোগ দিয়ে গিয়েছে। রতনের বউ শাসিয়েছে ভবিষ্যতে যদি কখনো যাই আমাকে শুধু যে খেতে দেবে না তাই না, উপরন্তু পুলিশ ডেকে এনে ধরিয়ে দেবে। স্নেহশীলা ভগ্নিসমা এই বধূটির অভিমানের কথা শুনে নিজেকে অপরাধী ভেবেও তৃপ্তি পাই।

এবার ফেরার থাকার সময় বার দুই সিনেমা দেখতে গিয়েছি। প্রতিবারেই রাতের শো এবং সঙ্গে ভাবী। প্রেক্ষাগারে বসে নির্বিকার ভাবে আমি ছবির ঘটনার মধ্যে ঢুকে গিয়েছে কিন্তু বিপদ হয়েছে ভাবীকে নিয়ে। একটি লোক যদি আমাদের দিকে তাকায় তাহলেই ভাবীর হৃদকম্প উপস্থিত। চুপি চুপি বলবেন, দেখ দেখ লোকটা তোমাকে কি রকম দেখছে, আই, বি নয়ত?

নিশ্চিত জানি লোকটা আমাকে দেখছিল না। আমাদের দেশের মানুষের স্বভাব সুলভ দৃষ্টিক্ষুধা নিয়ে সে ভাবীকেই দেখছিল। তাঁকে উত্যক্ত করার জন্য বলি, সুন্দরী নারীর রূপের সৃষ্টি হয়েছে পুরুষেরই অবলোকনের জন্য।

ভাবী ঝংকার দিয়ে ওঠেন, হ্যাঁ লোকটা আমাকে দেখছিল। নির্ঘাত দেখতে পেলাম লোকটা প্যাট প্যাট করে তোমাকে দেখছে। আমার কথা ত বিশ্বাস করবে না; সিনেমা দেখার লোভে যখন হাত কড়ি পড়বে তখন বুঝবে।

www.pathagar.com

ভাবীকে শান্ত করে সিনেমার ঘটনার দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করি। দু'এক মিনিট পরেই ভাবী আবার কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে উঠলেন, দেখ দেখ ঐ লোকটা তোমাকে দেখেই বাইরে চলে গেল, পুলিশ ডাকতে গেল না ত?

ভাবীর ধারণা দুনিয়ার লোকদের আর কোন কাজ নেই সকলেরই একমাত্র কাজ তাঁর দেবরটিকে ধরিয়ে দেওয়া। বুঝিয়ে বলি লোকজন প্রকৃতির ডাকেও হল থেকে বের হতে পারে। ভাবী বিশ্বাস করতে চাননা। ছবির পর্দায় দৃষ্টি না রেখে হলের দরজার দিকেই তাঁর শঙ্কিত দৃষ্টি সারাক্ষণ আটকে থাকে।

কিন্তু সব কিছুকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল আমাদের বাবলীর সতর্কতা। বাবলী আমার বন্ধুর মেয়ে। সরকারের একটি মাঝারিগোছের চাকরি করেন আমার এই বন্ধুটি। পাঁচ বৎসরের বাবলী এক বৎসরের ছেলে ইমু আর প্রেমময়ী পত্নী নিয়ে ছোট্ট সুখের সংসার। তিন রুমের একটি ফ্ল্যাট নিয়ে তারা থাকেন। প্রীতিও স্নিগ্ধতার পরিপূর্ণ এই সুখী পরিবারটিকে আমার অত্যন্ত ভাল লাগে। সুযোগ পেলেই তাদের মাঝে কিছুটা সময় কাটিয়ে দেই। বন্ধুর অকৃত্রিম হৃদ্যতা, বন্ধুপত্নীর সাগ্রহ যত্ন আর সর্বোপরি গোটা পরিবারে আনন্দদায়িনী বাবলীর ছেলেমানুষী আর দুষ্টুমীর কীর্তিকলাপ অত্যন্ত উপভোগ করি। রবিঠাকুরের কাবুলিওয়ালার মিনির আর একটি সংস্করণ আমাদের বাবলী। ওর মিষ্টি মুখের সহস্র পাকামী আর পেট ভরা দুষ্টমুখী আমাদের সর্বক্ষণ মাতিয়ে রাখে। সদা চঞ্চল মুখরা বাবলীর শত অত্যাচারের আনন্দে আমরা নিজেদের হারিয়ে ফেলি।

এবার গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী হলে বন্ধুটি এসে তার ওখানে নিয়ে গেলেন। দু'একদিন তাদের মাঝে থাকব শুনে সবাই খুশী। প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা এই সুখী পরিবারটির সাহচর্যে সময় আনন্দে কাটবে ভেবে আমিও উজ্জীবিত হয়ে উঠলাম। সব চাইতে আনন্দিত বাবলী। এতক্ষণ সে ওর মার দশহাত একটি শাড়ি পরিধান করার প্রয়াস পাচ্ছিল। আমাকে দেখে দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে উঠল, মোয়াজ্জেম চাচা, তুমি নাকি আমাদের বাসায় থাকবে? একমাস থাকতে হবে কিন্তু। তোমার কোন কষ্ট হবে না। আমি পাখা দিয়ে তোমাকে বাতাস করব।

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বন্ধু পত্নীর দিকে তাকাতেই সে বলল, কিছুক্ষণ পূর্বে বিজলী বন্ধ হয়ে ফ্যান চলছে না। অল্পক্ষণের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে

www.pathagar.com

যাবে।

হেসে বাবলীকে কোলে তুলে নিতেই সে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল, জান মোয়াজ্জেম চাচা, আমার পুষি তিনটা বাচ্চা দিয়েছে। তুমি একটা নেবে?

বার বার আমার নাম ধরে চিৎকার করায় ওর মা-বাবা অস্বস্তি অনুভব করছিলেন। ওকে আমার কোল থেকে নামিয়ে ওর মা বললেন, চাচাকে আর নাম ধরে ডেক না। বাবলী বলে উঠল, একশ'বার ডাকব। ডাকব না মোয়াজ্জেম চাচা?

ওর মা তখন ওকে বুঝিয়ে বললেন, নাম ধরে ডাকলে চাচাকে ধরে নিয়ে যাবে।

চাচাকে ধরে নিয়ে যাবে? কেন ধরবে? চাচা কি করেছে? একসাথে সব প্রশ্নবান ছুঁড়ে মারল বাবলী। ওর অনুসন্ধিৎসা অনিবার্য।

ওর বাবা তখন ওকে কাছে টেনে নিয়ে বুঝাতে লাগলেন, চাচাকে পুলিশ খোঁজ করছে। সে এখানে এসে লুকিয়েছে, যদি তুমি তার নাম ধরে ডাকাডাকি কর আর লোকে জানতে পেরে পুলিশকে বলে দেয় তাহলে তোমার চাচাকে ধরে নিয়ে যাবে। আর তাকে তুমি পাবে না। চাচা না তোমাকে এত আদর করেন?

শুনে বাবলী গম্ভীরভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ওর সদা চঞ্চল কচি মুখে গাম্ভীর্যের ছাপ অত্যন্ত বেমানান লাগছিল।

ওর বাবা ওকে ডেকে এনে আরও বললেন, লোকজন কেউ এসে কলিং বেল বাজালে সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে ভিতরে নিয়ে আসবে না। আমি বাসায় না থাকলে তোমার মাকে না বলে কাউকে ভিতরে আনবে না। তা না করলে তোমার চাচাকে ওরা ধরিয়ে দিবে।

সব শুনে বাবলী গম্ভীরভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কোন উচ্চবাচ্চ করল না। ওর ম্লান মুখচ্ছবি আমায় পীড়া দিচ্ছিল।

বন্ধুকে বল্‌লাম, কেন তুমি আমাদের আনন্দ প্রতিমাকে নিরানন্দ করে দিলে? কি প্রয়োজন ছিল এতটুকু বাচ্চাকে এতসব বলার?

বন্ধু হেসে বললেন, তুমি তো জান ওকে, বুঝিয়ে না বললে কিছুতেই নিষ্কৃতি দেবে না। আর তাছাড়া আমি বাসায় না থাকলে মাঝে মাঝে বাবলীই দরজা

www.pathagar.com

খুলে দেয়। ওকে বলা প্রয়োজন।

সেদিনটি নির্বিবাদে গেল। পরদিন যখন বন্ধু অফিসে চলে গেছেন এবং বাসায় চাকরটি বাজারে গিয়েছে, এমনি সময় দরজার বেল্ বেজে উঠল। বন্ধুপত্নী রান্না ঘরে ব্যস্ত ছিলেন, বাইরের ঘরটিতে আধশোয়া অবস্থায় আমি একটি সাহিত্য পত্রিকা পড়ছিলাম। উঠে গিয়ে মধ্যের ঘরে পুতুল খেলায় ব্যস্ত বাবলীকে ডেকে আনলাম, বললাম দেখত বেটি কে এসেছে। ওকে পাঠিয়ে ওর পুতুলগুলি পরীক্ষা করে দেখছিলাম। শুনতে পেলাম দরজা খুলেই বাবলী অভ্যাগত লোকটিকে ধমকাচ্ছে, বেল বাজাচ্ছেন কেন? কাউকে ভিতরে আসতে দেব না। আব্বা বারণ করেছে। জানেন না মোয়াজ্জেম চাচা আমাদের বাসায় লুকিয়ে আছে? তাকে পুলিশে ধরবে। আপনি চলে যান। আর কখনো বেল বাজাবেন না।

লোকটি কি উত্তর দিয়েছে শুনতে পাইনি, তার পূর্বেই আমার আক্কেল গুড়ুম। আমার অবস্থা তখন, ভিক্ষা চাই না মা কুকুর সরাও। দৌড়ে রান্না ঘরে গিয়ে বন্ধুপত্নীকে বল্লাম, শীগগির বাবলীকে সামলান। ওই আমাকে ধরিয়ে দেবে।

বাবলীর মা নিজেই তখন দরজায় গিয়ে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনেন। বন্ধু অফিস থেকে ফিরে এলে সেদিনই তাদের কাছ থেকে বিদায় নেই। আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সতর্ক প্রহরী বাবলীর সর্তকতার কাছ থেকে আত্মরক্ষা করাই সমধিক প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

আর একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়েছিলাম সেদিন শ্রীনগর লঞ্চ ঘাটে। বাড়ি থেকে ঢাকা ফিরছিলাম। সঙ্গে ভাগ্নে আলম এবং খালাত ভাই খোকা। খোকা ফরিদপুর কলেজে অধ্যাপনা করে। শ্রীনগর থানার সংলগ্ন বাজার। বাজারের পার্শ্বেই লঞ্চ ঘাট। থানার চোখ এড়িয়ে নৌকা করে লঞ্চের পশ্চাৎ দিক থেকে উপরে উঠলাম। দ্বিতলে উঠেই দেখতে পেলাম এ এলাকার সরকারী লীগের দু'জন পাণ্ডা বসে আছে। আমাকে দেখতে পেয়েই তারা সাত তাড়াতাড়ি লঞ্চ থেকে নেমে গেল। ব্যাপারটা তাৎপর্যপূর্ণ মনে হল। খোকা বল্ল, ভাইয়া চলুন নৌকা নিয়ে ফিরে যাই। ওরা নিশ্চয়ই থানায় খবর দিতে গিয়েছে।

সরকার সমর্থক পুলিশের তোষামোদকারী এই দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের বিলক্ষণ চিনি। এদের অসাধ্য কোন কাজ নেই। তবুও নেমে যেতে স্বীকৃত

www.pathagar.com

হলাম না। দ্বিতলের প্রায় যাত্রীই আমাকে চেনে। ঢাকা যাচ্ছি বলার পর হঠাৎ নেমে যাওয়ার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ নেই। তাছাড়া ওদের কারণে দুর্বলতা শোভা পায় না।

চুপ করে বসে রইলাম লঞ্চ ছাড়ার অপেক্ষায়। অল্পক্ষণের মধ্যেই লঞ্চ ছাড়ার উপক্রম হল। খালাসীরা নোংগর তুলে ফেলেছে। বিকট আওয়াজ করে ইঞ্জিন চালু হয়ে গিয়েছে। একটু একটু করে লঞ্চ চলতে শুরু করছে, এমনি সময় দু'জন কনষ্টেবল নিয়ে একজন দারোগা দৌড়ে এসে চিৎকার করে লঞ্চ থামাতে বললেন।

হন্তদন্ত পুলিশবাহিনীকে দৌড়ে এসে লঞ্চ থামাতে দেখে নিশ্চিত হয়ে গেলাম – আমার মুক্ত জীবনের শেষ প্রহর ঘনিয়ে এসেছে। একটু পরেই গ্রেফতার হয়ে যাব। আলম ও খোকা অস্থির হয়ে পড়ল। ওরা লঞ্চের সারেংকে সময়জ্ঞান ইত্যাদি যুক্তি দিয়ে পাড়ে না ভিড়াতে অনুরোধে করতে লাগল। এদের ডেকে বৃথা চেষ্টা করতে নিষেধ করলাম। প্রবল প্রতাপান্বিত থানাওয়ালাদের আদেশ লংঘন করার সাহস সারেং কেন মালিকদেরও নেই। আসন্ন বন্দী জীবনের কথা স্মরণ করে নিজের মনকে প্রস্তুত করলাম। লঞ্চ ঘাটে ভিড়ল, পুলিশ কর্মচারীরা উপরে উঠে এসে আমাদের পার্শ্বেই আসন গ্রহণ করল। লঞ্চ আবার ছেড়ে দিল। ভাবলাম হয়ত এরাও ঢাকা যাবে, আমাকে গ্রেফতার করার দায়িত্ব এদের নেই।

খোকা কানে কানে বলল, ভাইয়া আমার সন্দেহ হচ্ছে ওদের উপর আদেশ হয়েছে আপনাকে ঢাকা ঘাটে গ্রেফতার করার।

সন্দেহ ভারাক্রান্ত মন সবই বিশ্বাস করতে চায়। ভাবলাম হতেও পারে। কিন্তু একটু পরেই সব সন্দেহের অবসান হল। দারোগাটির সাথে আলাপ হল। অন্য যাত্রীরা আমার পরিচয় দিলেন। দারোগা সাহেব উৎসাহ নিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন। শুনলাম তারা ঢাকা যাচ্ছেন একটি সেসন মামলার সাক্ষী দিতে। অন্য একজন যাত্রীকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম সরকার সমর্থক পাণ্ডা দু'জন তাকেই তুলে দিতে এসেছিল। কথা-বার্তা শেষ হতেই তারা নেমে যায়।

আমার আসা এবং তাদের নেমে যাওয়া আপাতত দৃষ্টিতে যুক্ত মনে হলেও সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কহীন। ঠিক তেমনিভাবে লঞ্চ ছেড়ে দেওয়ার মুহূর্তেই পুলিশের আবির্ভাবও কার্যকারণহীন। মাঝখানে সঙ্কুলতার যে অভিজ্ঞাতা লাভ

www.pathagar.com

তাও দৃষ্টান্তবিহীন।

ঈদ এসে গেল। রমজানের রোজার শেষে এই ঈদ মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ আনন্দানুষ্ঠান। জেলের বাইরে কখনো রোজা করা হয়নি, কিন্তু এবার সিদ্ধান্ত নিলাম রোজা করব। একমাস ধরে দিনমান উপবাস থেকে আর কোন উপকার হয়েছে কিনা জানি না, কিন্তু দেহ খানিকটা হাল্‌কা হয়েছে এটা উপলব্ধি করেছি। মিজান ভাই, হক সাহেব, বজলুর রহমান এবং ওবায়েদও পূর্ণমাস রোজা করল।

সরকারী নির্দেশে আমাদের রোজা একটা কম হল। ঊনত্রিশটি রোজা শেষ হতেই সরকারী তরফ থেকে পরদিন ঈদ ঘোষণা করা হল। কিন্তু সমস্ত দেশ সরকারী 'রুয়তে-হিলাল' কমিটির সিদ্ধান্ত আগ্রহ্য করে পরবর্তী দিন ঈদের নামাজ সম্পন্ন করল।

কয়েক বৎসর ধরে প্রতিবারই ঈদের নামাজনুষ্ঠান নিয়ে গোলযোগ হচ্ছে। সারা দেশব্যাপী একই দিনে ঈদ অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। সরকার একদিন ঈদ ঘোষণা করেন, দেশের জনসাধারণ এবং আলেম সম্প্রদায় অন্য দিন ঈদ অনুষ্ঠিত করেন। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সভ্যতার স্বর্ণশিখরে বাস করেও আজ পর্যন্ত ঈদের মত সার্বজননি ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে এরা শৃঙ্খলা ও একতার মধ্যে অনুষ্ঠিত করতে পারলেন না। ঈদের নামাজানুষ্ঠান নিয়ে দাংগা-হাংগামা পর্যন্ত সংঘটিত হয়েছে। শান্তির ধর্ম ইসলামের শুদ্ধতা বারবার অশান্তির ঝড়ে ব্যাহত হয়েছে।

সরকারী অব্যবস্থার এক ধাপ শোচনীয়তার জন্য জেলকর্তৃপক্ষ সুপরিচিত। তারা এসে ফরমুলা ঘোষণা করে গেলেন-যেহেতু সরকার আগামীকাল ঈদ উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেহেতু ঈদের নামাজ কালই হবে, কিন্তু যেহেতু আগামীকাল ঈদের জন্য জেলকর্তৃপক্ষ প্রস্তুত নন সেহেতু ঈদের ভোজ পরবর্তী দিন হবে।

সকালে ঘুম থেকেই উঠেই জুনিয়র মেম্বারদের কাছ থেকে শুনতে পেলাম আমাদের বয়োবৃদ্ধ সদস্যরা জেল-কর্তৃপক্ষের এই ফরমুলা প্রায় গ্রহণ করার পথে। সঙ্গে সঙ্গে সব জুনিয়র সদস্যদের একত্রিত করে খাদ্য বিভাগের

www.pathagar.com

ইনচার্জ শামসুল হক সাহেবের রুমের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে লাগলাম। এ সব ব্যাপারে দশ সেলে আমাকে অগ্রবর্তীর ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। আমাদের একটিই দাবী-সহজ এবং সরল বক্তব্য। ঈদের নামাজ হলে ঈদের ভোজও দিতে হবে। পেটের তৃপ্তি না হলে আত্মার তৃপ্তি হতে পারে না। আমাদের বক্তব্য অত্যন্ত সহজ।

হক সাহেব তাড়াতাড়ি রসদ গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী দেওয়ান সাহেবকে ডেকে আনলেন। তুমুল বিক্ষোভের ফলে দশ সেলের শান্তি-শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়ে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত আমাদের আন্দোলনের কাছে জেল কর্তৃপক্ষ এবং দশ সেলের কর্তৃপক্ষ নতি স্বীকার করলেন। ঠিক হল আমাদের ঈদের ভোজ সেদিনই হবে এবং রন্ধন শালা না থাকলেও ঈদের রান্না দশ সেলেরই একটি প্রকোষ্ঠে রান্না করা হবে।

সারা জেলখানার মধ্যে সেদিন কেবল দশ সেলেই ঈদের খাওয়া হয়েছে। কয়েদীদের বড় চৌকা এবং অন্য সকল স্থানেই পরদিন খাওয়া হয়েছে।

নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় গোলমাল বাধল। আমি কিছুতেই জামাতে যাব না – বন্ধুরাও আমাকে না নিয়ে যাবেন না। জীবনে বেশ কয়েকবার জেলখানার জামাতে ঈদের নামাজ পড়েছি কিন্তু চৌষট্টি সালের পর থেকে আর নামাজ পড়তে যাইনি। একটা ছোট্ট ঘটনায় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম – বন্দী অবস্থায় জেলখানার জামাতে আর যাব না।

চৌষট্টি সালে সেবার ছাত্রদের সাথে আমাকেও নিরাপত্তা আইনে আটক করা হয়। ছাত্র জীবন থেকে বিদায় নিয়ে ব্যবহারিক জীবনে প্রবেশ করলেও ছাত্র আন্দোলনের দায়িত্ব সরকার তখনও আমার ঘাড়ে চাপাতে দ্বিধা করেন না। কোথাও কোন আন্দোলন হলে তার পশ্চাতে আমার অদৃশ্য হস্ত কাজ করছে এটা ওদের বদ্ধমূল ধারণা।

পুরনো বিশ সেলে পনর বিশ জন ছাত্রসহ আছি। ছাত্ররা আমাকেই তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছে। সে সময় ঈদ এল। আমাদের দলে চার পাঁচটি হিন্দু ছাত্রও ছিল। তারা আব্দার করল আমাদের সঙ্গে তারাও ঈদের জামাতে যাবে, পার্শ্বে দাঁড়িয়ে জামাতের সুশৃঙ্খল গণ-প্রার্থনার মনোমুগ্ধ কর রূপ অবলোকন করবে। মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গোপনীয়তা কিছু নেই। শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের ধর্মে অন্য ধর্মাবলম্বীদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার কোন ব্যাপার নেই। বাইরের বিভিন্ন নামাজানুষ্ঠানে প্রচুর ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের দর্শক

www.pathagar.com

হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। অনেকে নামাজের ছবিও তুলে নিয়েছেন।

হিন্দু ছাত্র ভাইদের এই আবেদনে কোন অসঙ্গতি দেখলাম না। ডেপুটি জেলর এবং জমাদারের সঙ্গে আলোচনা করলাম। তারা সহজেই সম্মতি দিলেন। হিন্দু ছাত্রদের সে কথা জানাতে তারা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উঠল। ঈদের দিন প্রত্যুষে মুসলমান ভাইদের সাথে তারাও হৈ চৈ করে স্নান সমাপন করল। হৃষ্টচিত্তে নূতন পোষাক পরিধান করে সুগন্ধি মেখে জামাত দেখতে যাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে আমাদের সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগল।

নির্দিষ্ট সময়ে জমাদার আমাদের নিতে এল। তারাও আমাদের সাথে চল্‌ল, কিন্তু বিশ ডিগ্রীর গেটে গিয়েই জমাদার স্বীয় মূর্তি ধারণ করল। বল্‌ল, হিন্দু ছাত্ররা যেতে পারবে না। আমি প্রতিবাদ করলাম। বল্‌লাম, তাদের যাওয়ার প্রশ্নে পূর্বাহ্নে অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

জমাদার কোন যুক্তিই শুনল না। পূর্বের অনুমতির কোন মর্যাদা দিতে কর্তৃপক্ষ রাজী নয়। অনেক তর্ক বিতর্কের পরও কোন ফল হল না। উৎসবের পোষাকে সজ্জিত হিন্দু ছাত্রদের চোখে মুখে তখন নিবিড় লজ্জা ও বেদনার ছাপ ফুটে উঠেছে। তাদের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। নিজেদেরকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা নামাজে যাব না। জেল কর্তৃপক্ষকে আরও বলে দিলাম জেলের অভ্যন্তরে বন্দী অবস্থায় আর কোনদিন জামাতে যাব না।

দশ সেলের বন্ধুরা এ ঘটনা জানতেন না। তাদের জানাতেও চাইনি। তারা জোর করে আমাকে নিয়ে যেতে চাইলেন। আমি তাদের অভিসন্ধি বুঝতে পেরে সাতাশ সেলে চারু বাবুর ঘরে আত্মগোপন করলাম। বন্ধুরা সারা মেন্টাল এলাকা খুঁজতে লাগলেন। ওবায়েদ, হারুণ চারুবাবুর ঘর থেকে আমাকে পাকড়াও করে নিয়ে এল। সকলেই আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে চৌষট্টির ঘটনা ব্যক্ত করে আমার সিদ্ধান্তের কথা জানাতে হল। সব শুনে তারা আমায় রেহাই দিলেন।

জেলখানার একমাত্র ঈদের জামাতেই সকল বন্দীদের একত্র সমাবেশ হয়। পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাত এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনার একমাত্র সুযোগ। বদ্ধ আবহাওয়ায় পরস্পরের রাজনৈতিক মতবাদের আদান-প্রদানও কিছুটা সংঘটিত হয়। নামাজ ফেরত বন্ধুদের কাছে শুনলাম, মুজিব ভাই এবং অন্যান্য রাজবন্দীরা রাগ করেছেন জামাতে উপস্থিত না হাওয়ার জন্য। শান্তি

www.pathagar.com

স্বরূপ মুজিব ভাই আমাকে হাসপাতাল প্রেসক্রিপশন করেছেন কয়েকদিনের জন্য।

কর্তৃপক্ষের নিকট আমরা দাবী জানিয়েছিলাম অন্তত ঈদের দিনে আমাদের সকল রাজবন্দীদের কিছুক্ষণের জন্য একত্রিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হোক। জেলখানায় এ রকম দৃষ্টান্তও আছে। কিন্তু তারা আমাদের দাবী পূরণে অক্ষমতা প্রকাশ করলেন।

আমাদের অনেকের বাড়ি থেকেই ঈদের খাদ্যদ্রব্যাদি জমা দেওয়া হয়েছিল, তাই দিয়ে আমাদের দ্বিপ্রহরের আহার সমাধা হল। এখানকার খাবার তৈরি করতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল।

এবারে ঈদের একমাত্র আনন্দ ও বৈশিষ্ট্য ছিল আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ছাব্বিশ সেলের বন্দী ভাইদের আমরা এক সঙ্গে নিয়ে এসে খাওয়াতে পেরেছি। কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এড়িয়ে পরদিন আমরাও দল বেঁধে ছাব্বিশ সেলে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে এসেছি। গত আট বৎসর ধরে নিরাপত্তা আইনে বন্দী সন্তোষ ব্যানার্জী বল্‌লেন, দল বেঁধে নিমন্ত্রন খেতে যাওয়ার বা নিমন্ত্রিতদের নিজ হাতে পরিবেশন করে খাওয়ানোর মধ্যে বাঙালীর যে তৃপ্তি তা প্রায় ভুলে যেতে বসেছিলাম। আওয়ামী লীগের বন্ধুদের জন্য তা সম্ভব হল। আপনাদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

সন্তোষ দার হাসি মুখের কথাগুলি শুনে আনন্দিত হওয়াই উচিত ছিল কিন্তু একটা প্রচ্ছন্ন বেদনার করুণ সুর সমস্ত পরিবেশকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

পাঁচই ডিসেম্বর আমরা সোহ্‌রাওয়ার্দী মৃত্যু-বার্ষিকী পালন করলাম। মরহুম সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবকে এদেশের মানুষ জানে পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা হিসেবে। তাঁর পরিচিতি স্বাধীনতা উত্তরকালে পাকিস্তানের নিরংকুশ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অগ্রনায়ক হিসেবে, তাঁর খ্যাতি দেশের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী দলের স্রষ্টা হিসাবে।

এদেশের লক্ষ কোটি মানুষের মত আমাদের ধারণা পাকিস্তানের ইতিহাসে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর ন্যায় সর্ব গুণান্বিত নেতা আর কেউ ছিলেন না । তিনি না হলে হয়ত পাকিস্তানের সৃষ্টিও সম্ভব হত না। –অন্ততঃ বাংলাদেশের এই

www.pathagar.com

অংশ কখনোই পাকিস্তানরূপে প্রতিষ্ঠিত হত না।

রূপার চামচ মুখে নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে সামাজিক উচ্চতর ব্যবধান এ ঐশ্বর্যের বন্ধন ছিন্ন করে এই মহাপ্রাণ কর্ম-জীবনের প্রারম্ভ থেকেই এদেশের ভাগ্য বিড়ম্বিত মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দীর্ঘ ঘটনাবহুল জীবনে অনেক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে এই মহানায়ক ইতিহাসের পাতায় স্বীয় গুণরাজি, কর্মদক্ষতাও আদর্শ পরায়নতার জন্য চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবেন।

সংগ্রাম বহুল জীবনে খুব অল্প সময়ের জন্যই এই নেতা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাকী সমগ্র জীবন তিনি গণ-মুক্তির আন্দোলনে নেতৃত্বে দিয়ে এসেছেন। তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি গণতন্ত্রের স্বপক্ষে কাজ করে গেছেন।

রাজনীতবিদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ব্যক্তি হিসাবে শুধু যে মহান ছিলেন তা নয়। তাঁর চারত্রিক তুলনা খুজে পাওয়া দুষ্কর। জীবনে তিনি মিথ্যাবাদিতার আশ্রয় নেননি। প্রলোভন তাঁকে বশীভূত করতে পারেনি। নিজেও লোভ দেখিয়ে বাঁকা পথে কোনদিন মিথ্যার স্পর্শে ম্লান হয়নি।

শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী জানতেন না এমন কাজ ছিল না। অসামান্য প্রতিভার অধিকারী এই অগ্নি পুরুষ মোটরের কল-কব্জা মেরামত থেকে শুরু করে চারুকলার সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ অনায়াসে করতে পারতেন। কঠোর ও কোমলতা তাঁর মধ্যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। দয়া, প্রেম, মহত্ব ছিল তাঁর উদার হৃদয়ের চিরন্তর ফলগুধারা। অনেকের মতে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মত প্রাণবান এবং নীরব দাতা প্রাতঃস্মরণীয় মহসীনের পরে এদেশে জন্ম গ্রহণ করেনি। বাংলাদেশের অগণিত সংসারে তিনি অর্থ সাহায্য করেছেন। বহু দরিদ্র ছাত্র তাঁর অর্থে বিদ্যার্জন করেছে। অসংখ্য রাজনৈতিক কর্মীকে তিনি জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর ডান হাতের দান বাম হাত জানতে পারত না। সস্তা প্রশংসা ও আত্ম প্রচারণার ঊর্ধ্বে তিনি সারা জীবন নীরবে কত যে দান করে গেছেন তাঁর সঠিক বৃত্তান্ত তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরাও দিতে পারেননি। কিছু কিছু প্রকাশ পেয়েছে তাঁর মৃত্যুর পর।

ছাত্রলীগের সভাপতি থাকাকালীন নেতার সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে তাঁর হৃদয়ের যে পরিচয় পেয়েছি তা আজীবন স্মরণ থাকবে। তাঁর সামান্য স্নেহ লাভ করতে পেরেছিলাম –

www.pathagar.com

চিরদিন এ সত্য আমায় উৎসাহ যোগাবে।

যে নেতা আজীবন এ দেশের মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছেন, সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন, এ দেশের মানুষের মণিকোঠায় যার স্থান স্বর্ণ সিংহাসনে, সেই তাঁকে অযোগ্য ঘোষিত করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হল। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস একেই বলে। আজাদী সংগ্রামের অগ্রানায়ক, দেশপ্রেমিক নেতা হলেন দেশদ্রোহী। আর ইংরেজের সেদিনের বেতনভুক কর্মচারীরা হলেন দেশ প্রেমের প্রধানতম অবতার।

পাক-ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিপুরুষ মওলানা মোহাম্মদ আলী লন্ডন থেকে ঘোষণা করেছিলেন, পরাধীন ভারতে তিনি ফিরে যেতে চান না। বিশ্বপতি তাঁর ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন – লন্ডনের বুকেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। পরাধীন ভারতে তাঁকে ফিরে আসতে হয়নি। গণতন্ত্রের দিশারী শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীও লেবাননের বৈরুতে থেকে লিখেছিলেন, দেশের অগণতান্ত্রিক আবহাওয়ায় তাঁর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। রোগজীর্ণ দেহে প্রত্যাবর্তন করে মানুষের কাজেই যদি না লাগতে পারলেন তা হলে আর বেঁচে থেকে লাভ কি! মওলানা মোহাম্মদ আলীর মত তিনিও দেশের মাটিতে জীবদ্দশায় আর ফিরে আসতে পারেনি। জন্মভূমির বুকে গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ লাভ না দেখেই তাঁর অতৃপ্ত আত্মার স্বর্গারোহণ হল।

দুঃখ হয় এই ভেবে, নেতার অন্তিম শয়ানে একটি প্রাণীও উপস্থিত ছিল না। কোটি-মানুষের অন্তরের দেবতা মধ্যপ্রাচ্যের এক হোটেলের নীরব প্রকোষ্ঠে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয় দেশবাসীর চোখের আড়ালে মৃত্যুর শীতল হস্তে আত্মসমর্পণ করেন। শেষ মুহূর্তে তাঁর মুখে এক বিন্দু জল সিঞ্চনের লোক ছিল না। এমনই হয়! যিনি সকলের জন্য সর্বস্ব অকাতরে বিলিয়ে দেন, সকলের অগোচরেই তিনি চির বিদায় নেন।

শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুকে কেউ কেউ স্বাভাবিক ভাবেন। সকলেরই চিন্তার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু আমার মন কিছুতেই তাঁর মৃত্যুর স্বাভাবিকতা সম্বন্ধে সন্দেহাতীত হতে পারছে না। সোহ্‌রাওয়ার্দীর নশ্বর দেহ যেদিন লক্ষ মানুষের অশ্রুদ্ধারার মধ্য দিয়ে বাংলার মাটিতে ফিরে এল, সে রাত্রে এক দুস্বপ্ন দেখেছিলাম! দেখেছিলাম, শহীদ সাহেবের লাশ কফিন থেকে বের করা হল, তাঁর মস্তক এবং দেহ বিচ্ছিন্নভাবে রক্ষিত।

স্বপ্ন বিশ্বাস করি না ঠিকই, কিন্তু সেদিন থেকে যে সন্দেহের ধুম্রজালে

www.pathagar.com

আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম, আজও তা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। নেতার মৃত্যুবার্ষিকী এবারই জেলের মধ্যে পালন করছি। অন্যান্যবার এদিনটিতে বাইরে ছিলাম এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। নারায়ণগঞ্জ, বিক্রমপুর ও কুলাউড়ায় সোহ্‌রাওয়ার্দীর মত্যু-বার্ষিকীর সভায় পর পর যোগ দিয়েছি। আওয়ামী লীগের প্রথম কাতারের কর্মীবৃন্দ কারাগারে বন্দী থাকলেও সমগ্র প্রদেশব্যাপী এই দিনে পূর্ণ মর্যাদার মধ্য দিয়ে তাঁর মৃত্যু বার্ষিকী উদযাপিত হচ্ছে।

কারাগারে মধ্যে আবদ্ধ আমরা তাঁর ভক্ত অনুসারীরা ভাবগম্ভীর পরিবেশে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী পালন করলাম। কয়েদীদের নিয়ে আমরা তাঁর আত্মার মঙ্গল কামনা করে মিলাদ পাঠ করলাম। সেদিন মিজান ভাইয়ের আরও একটি গুণ প্রকাশিত হল। মিলাদের মাওলানার দায়িত্ব তিনি সুচারুভাবে পালন করলেন। কয়েদীরা বিশ্বাসই করতে চায় না, তিনি পাশ করা মাওলানা নন।

এদিনে বাইরে দরিদ্র ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। জেলের মধ্যে আমরা ছোকরা ফাইলের কয়েক শত হাজতীদের মধ্যে সামান্য মিষ্টি বিতরণ করে ঐতিহ্য বজায় রাখলাম।

নেতার মৃত্যু বার্ষিকী কর্মীদের নিকট শপথের দিন। তাঁর অসমাপ্ত কাজ স্কন্ধে তুলে নিয়ে তাঁর স্বপ্ন ও সাধনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার প্রতিজ্ঞার দিন এটি। জানি, যতদিন দেশের বুক থেকে স্বৈরাচারের পতন ঘটিয়ে পূর্ণ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা না হবে, যতদিন এ দেশের নিপীড়িত জনগণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি না আসবে ততদিন নেতার আত্মা তৃপ্তি লাভ করবে না। পাকিস্তানের প্রতিটি গণতন্ত্রমনা সংগ্রামী কর্মীর দ্বারে নেতার অতৃপ্ত আত্মা ঘুরে বেড়াবে। তাঁর উত্তরসূরীদের ডেকে ডেকে বলবে, সংগ্রামের পথে দীক্ষা নাও, দেশের মানুষের অধিকার আদায় কর। শহীদ-আত্মার সে বাণী কান পেতে শুনতে পাই। তাই এই সংগ্রাম, তাই এই লৌহ শৃঙ্খল। সান্ত্বনা এই, নেতার বিদেহী আত্মার নিকট নিষ্ক্রিয়তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। তাঁর আশীর্বাণী স্বর্গ থেকে ঝরে পড়বে। জয় আমাদের অবশ্যাম্ভাবী।

www.pathagar.com

আর এক দফা মুক্তির নির্দেশ এসে গেল। লৌহকপাটের পাল্লা আর একবার উন্মোচিত হল। এবারের ভাগ্যবান ব্যক্তিদের মধ্যে দশ সেল থেকে রয়েছেন শামসুল হক, বজলুর রহমান এবং হারুন-অর-রশিদ। এদের মুক্তির ফলে দশ সেল ঝিমিয়ে পড়ল। হারুন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ভলিবল খেলতো। ওর অবর্তমানে খেলা বন্ধ হয়ে গেল। বজলুর রহমান এবং হক সাহেবের মুক্তির নির্দেশ অভাবিত ভাবেই এসে গেল। এদের অনুপস্থিতি দশ সেলের আনন্দ ঘন পরিবেশকে অনেকটা ম্লান করে দিল।

কয়েকদিনের মধ্যে ছাব্বিশ সেল থেকে ধীরেন দাস মুক্তি পেলেন। ধীরেনদাকে জানি বাষট্টি সাল থেকে। বাষট্টি-তেষট্টিতে আমরা একাসাথে পুরানো বিশ সেলে কাটিয়েছি। ছাত্রাবস্থায় তখন নিরাপত্তা আইনে আটক ছিলাম। বাংলাদেশের অগ্নিযুগের অন্যতম ত্যাগী কর্মী ধীরেনদাকে বেশ কয়েক বৎসর ফেরার থাকার পর গ্রেফতার করে আনা হয়েছিল। তাই তাঁকে অন্যান্য কমরেডদের সংগে এসোসিয়েশন ওয়ার্ডে না রেখে ডিগ্রী এলাকায় আলাদা করে রাখা হয়েছিল। ছাত্র বলে আমার অবস্থাও তথৈবচ।

একত্র কারাবাসের সে দিনগুলিতে ধীরেনদাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগ পাই। তার চরিত্রের শিশুর সারল্য আর অন্তরের স্নিগ্ধতা আমাকে মুগ্ধ করে। সহজ সরল প্রাণবন্ত ধীরেনদা অচিরেই আমাকে গভীর ভালবাসায় জড়িয়ে ফেলেন। সেবার তাঁকে ফেলে যখন বিদায় নিয়ে যাই তখন তাকে ছোট ছেলের মত কাঁদতে দেখে নিজেও কেঁদে ফেলেছিলাম। মুক্তির সবটুকু আনন্দ চোখের জলে ধুয়ে গিয়েছিল।

চট্টগ্রামের বাসিন্দা ধীরেন দাস চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক সশস্ত্র উত্থানের একজন সহযোগী কর্মী ছিলেন। সে সময় তিনি ছাত্র। পরবর্তীকালে মাষ্টারদা সূর্যসেন, প্রীতিলতার সুযোগ্য উত্তরসুরী রূপে স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বার্থক অবদান রেখেছেন। ইংরেজকে দেশ থেকে বিতাড়িত করার সংগ্রামে ধীরেনদাকে গভীর বন-জঙ্গল পায়ে হেঁটে পার হতে হয়েছে, বহু দিবস-রজনী অনাহারে অনিদ্রায় পালিয়ে কাটাতে হয়েছে, কত দুঃখ-দুর্দশা হাসি- মুখে বরণ করে নিতে হয়েছে, দীর্ঘ সময় কারাগারে অতিবাহিত করতে হয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও ধীরেন দাসের মত আদর্শবাদী ত্যাগী কর্মীদের অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। আজও তাদের পালিয়ে পালিয়ে বনে জঙ্গলে ফিরতে হয়। অবাঞ্ছিত গ্রেফতার এড়াবার প্রচেষ্টায় আজও তাঁকে বৎসরের পর বৎসর ফেরার জীবন যাপন করতে হয়।

www.pathagar.com

প্রায় ষাট বৎসর পার হতে চললেন ধীরেনদা কিন্তু এখনো অত্যন্ত সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী। নিয়মিত ব্যায়ামের ফলে শরীরটাকে অটুট রেখেছেন। অতি প্রত্যুষে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস ছিল ধীরেনদার। আমার ছিল দেরী করে ওঠা ওঠার বদ অভ্যাস। ব্যায়াম স্নান এবং প্রাতঃক্রিয়াদি সম্পন্ন করে ধীরেনদা আমার সেলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রভাতী সঙ্গীত গাইতে থাকতেন। তাঁর কণ্ঠে খুব একটা মানানসই না হলেও গানের কলি এবং শব্দের অনুরণনে প্রভাতের আবহাওয়া মধুর হয়ে উঠত। শীতের সকালে উষ্ণশয্যার গাঢ় আলিঙ্গন ত্যাগ করে উঠে আসতে ইচ্ছা হত না। কিন্তু না ওঠা পর্যন্ত দাদার সঙ্গীতও বন্ধ হত না। লজ্জা পেয়ে উঠে বসতাম।

ধীরেনদার সবচাইতে বড় সখ বাগান করা। জেলের মধ্যে যত্রতত্র প্রচুর ফুলের চারা রোপিত আছে। সেলের বাইরে এসে ধীরেনদার দৃষ্টি থাকত কেবল ফুলের চারার দিকে, এদিক ওদিক তাকিয়ে তাড়াতাড়ি একটি চারা তুলে নিয়ে নিজের ব্লকে চলে যেতেন। তাঁর ব্লকের কয়েক হাত জায়গায় ধীরেনদা যে সুন্দর উদ্যান রচনা করেছিলেন তা সকলেরই প্রশংসা লাভ করেছিল।

এবার এসে দেখি ধীরেনদা ছাব্বিশ সেলে আছেন। এবং সমস্ত জেল খানায় বাগানী বাবু নামে পরিচিত। ছাব্বিশ সেলের চারিপার্শ্বে প্রচুর জায়গা পেয়ে ধীরেন দা মেতে উঠছেন সখের বাগান তৈরি করতে। জেল খানার নিরবিচ্ছিন্ন অবসরের প্রতিটি মুহূর্ত তিনি বাগান করার কাজে ব্যয় করেছেন। স্বহস্তে খুরপী কোদাল, জলের বালতী নিয়ে সমস্ত দিন পরিশ্রম করেছেন। নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে বীজ, চারা ক্রয় করছেন। বিড়ি, সিগারেটে পরিতুষ্ট করে কয়েদীদের বাগানে কাজ করিয়েছেন, ফলে ছাব্বিশ সেলের রূপই পাল্টে গেছে। ছাব্বিশ সেল একটি পুষ্প উদ্যানে পরিণত হয়েছে। চারদিকে রং রেবং-এর অজস্র প্রস্ফুটিত ফুলের মনোমুগ্ধকর রং আর প্রাণ মাতানো ঘ্রাণে সমস্ত পরিবেশটা একটা প্রদর্শনীর রূপ লাভ করেছে। এর একক কৃতিত্ব ধীরেনদার।

পুষ্পোদ্যান বিলাসী ধীরেনদা ফুল এবং বাগানের প্রশ্নে বাহ্যজ্ঞান রহিত। বাগানের একটি ফুলও কাউকে ছিঁড়তে দেন না। কিন্তু আমি ছাব্বিশ সেলে গেলেই এক গুচ্ছ ফুল আমাকে উপহার দেন। তোড়া বানিয়ে দশ সেলেও মাঝে মাঝে পাঠান। সুন্দর সুবাসিত পুষ্পরাজির মধ্যে ধীরেনদার শুভ্র সুন্দর অন্তরের নির্মল প্রতিচ্ছবিই ফুটে উঠত।

www.pathagar.com

ধীরেনদার মুক্তিও তাঁর পুষ্পপ্রীতির সঙ্গে জড়িত।

নিরাপত্তা বন্দীদের আটকাদেশ প্রতি তিনমাস অন্তর পর্যালোচনার জন্য হাই কোর্টের একজন বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত একটি বোর্ড আছে। বোর্ডের অধিবেশেনে বন্দীদের উপস্থিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। বোর্ডের সুপারিশে অনেকে মুক্তি পান। বেশ কিছুদিন যাবৎ কেউ মুক্তি না পাওয়ার নিরাপত্তা বন্দীরা বোর্ডে উপস্থিত হওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন।

এবার বোর্ড বসলে ধীরেনদা যেতে রাজী হলেন। মুক্তির প্রশ্ন তাঁর বিবেচ্য নয় – তাঁর ইচ্ছে এই সুযোগে হাই কোর্টের বাগানটি দেখে আসবেন। লোকের মুখে শুনেছেন হাই কোর্টের বাগান দেখবার মত হয়েছে। বোর্ডের সামনে হাজিরা দিয়েই তিনি বাগান দেখতে ছুটলেন। দীর্ঘদিন ধরে আটক এই বাগান-পাগল বন্দীর নির্দোষ আগ্রহকে আই, বি এবং পুলশের লোকেরাও প্রশ্রয় না নিয়ে পারলেন না। তারা তাঁকে অদূরবর্তী বিশ্ববিদ্যালয় বোটানিক্যাল গার্ডেনেও নিয়ে গেলেন। ধীরেনদার আনন্দ ধরে না। ঘুরে ঘুরে তিনি বাগান পরিদর্শন করতে লাগলেন। বাগানের পরিচর্যকের সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়ে গেল। তাঁর পরিচয় এবং বাগানপ্রিয়তা জানতে পেরে ভদ্রলোক তাঁকে একটি ফুলের চারা উপহার দিতে চাইলেন। ছাব্বিশ সেলে ধীরেনদার বাগানে অভাব ছিল শুধু ব্ল্যাক ডালিয়ার। তিনি তাই চাইলেন। ভদ্রলোকে সানন্দে একটি ব্ল্যাকডালিয়ার টব ধীরেন দার হাতে তুলে দিলেন। আনন্দে আত্মহারা ধীরেনদা টবটি বুকে করে জেলগেটে নামালেন। কোন কথা না বলে কারো প্রশ্নের জাবাব না দিয়ে, জামা কাপড় না ছেড়ে সর্বাগ্রে চারাটি রোপন করতে গেলেন। চারাটির রোপণকার্য নির্বিঘ্নে সমাধা হয়ে গেলে নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি তখন সকলের সব প্রশ্নের জবাব দিলেন।

অনেকদিন পর বোর্ডে উপস্থিত হয়ে তাদের সম্মানিত করার জন্য হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক, ধীরেনদার মুক্তির নির্দেশ এসে গেল। প্রতিবারই তিনি আশ্রুধারার মধ্যে আমায় বিদায় দেন – এবার তাকে হাসি মুখে বিদায় দেওয়ার সুযোগ পেলাম।

তার সাধের বাগানের পরিচর্যার ভার দীর্ঘদিনের সহবন্দীদের উপর ন্যস্ত করে ধীরেনদা বাইরের মুক্ত আলোতে পা বাড়ালেন – তার হাতে তুলে দিলাম তারই স্বহস্তে রোপিত সযত্নে বর্দ্ধিত বৃক্ষগুলি থেকে আহরিত সব রকম ফুলের সমাবেশে তৈরি দুটি সুবৃহৎ পুষ্প গুচ্ছ।

www.pathagar.com

হাসপাতালে ভর্তি হলাম। কিছুদিন থেকে গ্যাসট্রিকের যন্ত্রণায় ভুগছি, তাছাড়া রয়েছে মুজিব ভাইয়ের তাগিদ। পুরানো বিশ সেলে থেকে নূরে আলমও চলে এল আমার সংবাদ পেয়ে। আরও পেলাম ছাব্বিশ সেলের কমরেড্ বাসুদা এবং তেজগাঁও আওয়ামী লীগের কর্মী এক দুই খাতার মোহাম্মদ শহীদুল্লাহকে। অনেকদিন পর মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হল। হাসপাতাল ও ডিগ্রী এলাকার মধ্যবর্তী গেটে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টির আওতার বাইরে আমাদের দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থা। মুজিব ভাইয়ের বাসস্থান সিভিল ওয়ার্ড বা দেওয়ানী এবং দশ সেলের ব্যবধান মাত্র কয়েক হাত – কিন্তু কয়েদখানার সুউচ্চ একটি দেওয়াল মাঝখানে অনন্ত দূরত্ব সৃষ্টি করে রেখেছে। এ দূরত্ব অতিক্রম করে আমাদের যোগোযোগ সম্ভব নয়। সদাশয় সরকারের বিশেষ আদেশ বলে তাঁকে কেবল অন্য রাজবন্দীদের নিকট থেকেই দূরে রাখা হয়নি, তাঁর নিজ প্রতিষ্ঠানের সহকর্মী বন্ধুদের নিকটে থেকেও পৃথক করে রাখা হয়েছে। জেলখানার দুঃসহ একাকীত্ব তাঁকে একটুও দুর্বল করতে পারেনি, তবুও সামাজিক প্রাণী মানুষের স্বাভাবিক মানসিকতায় তিনি বন্ধুদের সঙ্গ লাভের জন্য ব্যাকুল থাকেন। আমরা হাসপাতালে এলে কিছুটা সময় তাঁর কাটে আমাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে। অনেক দিনের না বলা জমানো কথা বলতে পেরে ভারমুক্ত হতে পারেন।

আমাকে পেয়ে আনন্দ বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, তোর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছে, বেশ কিছুদিন তোকে হাসপাতালে থাকতে হবে।

বুঝলাম সঙ্গীহীন মুজিব ভাই দু'চার দিনে আমাকে ছাড়ছেন না। স্বাস্থ্য পরীক্ষা জন্য পুরনো হাজত থেকে শেখ ফজলুল হক মণিকে হাসপাতালে আনা হলে ওর সাথেও দেখা হল। আরও দেখা হল নুরুল ইসলামের সঙ্গে, ভাল পোষ্টার লেখক নুরুল ইসলাম। আওয়ামী লীগের সমুদয় পোস্টার স্বহস্তে লিখে থাকে–পোষ্টার ইসলাম বলেই সে সমধিক পরিচিত।

ছাত্রলীগের অন্যতম সহ-সভাপতি খুলনার কামরুজ্জামানের সঙ্গেও দেখা হল এখানে এসে। স্বল্পবাক ও চিন্তশীল এই ছাত্র কর্মীটিকে আমি স্নেহ করি। নির্বিরোধী শান্ত চরিত্রের জন্য সে কেবল ছাত্র সমাজের মধ্যেই নয়,

www.pathagar.com

জেলখানার মধ্যেও সকলের প্রিয় হয়ে উঠেছে।

হাসপাতালের সিকিউরিটি ব্রাঞ্চের মেট গিয়াস উদ্দিনের খালাসের দিন সমাগত। সাত বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড ভোগের পর মুক্তির আস্বাদ ভুক্তভোগী ছাড়া উপলব্ধি করতে পারবে না। হৃদয়ের আনন্দ সহস্র ধারায় ঝড়ে পড়েছে গিয়াস উদ্দিনের সর্ব অবয়বে। ওর মুখের হাসিটি মুহূর্তের জন্যও বিলীন হচ্ছে না।

সাধারণত দীর্ঘ কারাভোগের পর মুক্তির প্রাক্কালে কয়েদীদের স্বাস্থ্য হানি ঘটে। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভাবনা এবং ছিন্নমূল পরিবার পরিজনদের দুঃশ্চিন্তায় অচিরেই ওরা ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু গিয়াস উদ্দিন এর ব্যতিক্রম। ঢাকা শহরের অদূরে একটি গ্রামের অবস্থাপন্ন পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান গিয়াস উদ্দিন। সুন্দর একহারা গড়নের সুপুরুষ গিয়াস উদ্দিন জ্ঞাতি শত্রুতার শিকারে পরিণত হয়ে সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করে একটি খুনের মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে।

ভদ্র ব্যবহার, অমায়িক হাসি এবং শুদ্ধ চরিত্রের বলে অল্পদিনের মধ্যেই গিয়াস উদ্দিন সকলের প্রিয় হয়ে ওঠে। কয়েদীদের মধ্যে বেশ শিক্ষিত হওয়ায় অচিরেই ওকে হাসপাতালের কাজে ভর্তি করে দেওয়া হয়। রুগীদের শুশ্রুষা থেকে শুরু করে ইন্‌জেকশন দেওয়া, ব্যান্ডেজ করা, মলমূত্র, রক্ত ইত্যাদির পরীক্ষার কাজও ওকে করতে হয়। অনেকটা মেলনার্স-কাম-প্যাথলজিস্টের দায়িত্ব পালন করে গিয়াস উদ্দিন। সকলেই ওর কাজ এবং সেবায় প্রীত। গিয়াষ উদ্দিনের মুক্তির খবরে আনন্দ প্রকাশ করলেও ওর অনুপস্থিতিতে নিজেদের অসুবিধার চিন্তা অত্যন্ত স্বার্থপরের মত মনের কোণায় উঁকি মেরে যায়।

গিয়াসউদ্দিনের সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয়। কারাভ্যন্তরে বহুবার রোগশয্যায় গিয়াস উদ্দিনের সেবাপরায়ণ দুটি হাত আর হাসিভরা মুখের সান্ত্বনায় উপশম খুঁজেছি।

গিয়াসউদ্দিনকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, এবার জেলে এসে ত প্রায় হাফ ডাক্তার বনে গেছে, বাইরে গিয়ে কি করবে?

এক গাল হেসে গিয়াস উদ্দিন জবাবা দিল, স্যার ডাক্তারীই করব। আমাদের দেশে এখানো পাশ করা ডাক্তারের অভাব। গ্রামের হাতুড়ে

www.pathagar.com

ডাক্তারদের চাইতে কয়েক বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমি অনেক বেশি শিখেছি। আপনি কি বলেন?

গিয়াস উদ্দিনকে সমর্থন না করার কারণ ছিল না। জাক্তারী করার যুক্তিই দিলাম। একটা ডিস্পেন্সারির লাইসেন্স করে নিয়ে ডাক্তারী আরম্ভ করলে উপার্জন ভালই করবে বলে মনে হল। গিয়াস উদ্দিনকে কাছে বসিয়ে ওর বাড়ি ঘরের খবর নিলাম। ওর বাবা মা উভয়ই জীবিত আছেন। ওরা তিন ভাই। ছোট দুই ভাই গ্রামের বাজারে মনোহারী ও মুদী দ্রব্যের দোকান করে। বাজারে ওদেরই সেরা দোকান। গিয়াস উদ্দিন ছোট খাট সাব-কন্ট্রাক্টরি করে ভালই উপার্জন করত। একটি বোন, বিয়ে হয়ে সুখেই আছে। সাজা প্রাপ্তির বৎসর খানেক পূর্বে গিয়াস উদ্দিনও বিয়ে করেছে। অন্য দুই ভাই এখনও অবিবাহিত। স্ত্রীর কথা বলতে বলতে গিয়াস উদ্দিন উল্লাসিত হয়ে ওঠে – ওর বৌ অত্যন্ত সুন্দরী। বিয়ের দিন দু'জনকে এক পিঁড়িতে বসিয়ে দেখার সময় গ্রামের সকলেই বলাবলি করছিল, দু'জনকে মানিয়েছে কি সুন্দর, চোখ জুড়িয়ে যায়।

যেমনি গিয়াস উদ্দিনের সুন্দর চেহারা তেমনি ওর বউয়ের অপরিসীম রূপ। দুজন দুজনকে পেয়ে সব কিছু ভুলে গেল। স্বপ্নের চাইতেও মধুর, কল্পনার চাইতেও আনন্দ-ঘন একটি বৎসর একটি নিমেষের মত কেটে গেল। পরিপূর্ণ সুখ ও সৌভাগ্যের মধ্যে থেকে নিয়তি গিয়াস উদ্দিনকে সাত বছরের জন্য ছিনিয়ে নিয়ে এল – পশ্চাতে পড়ে রইল জনক-জননী ও ভাইদের নিয়ে সুখের সংসার, আর পরমা সুন্দরী যুবতী ভার্যা।

সাজা হয়ে যাওয়ার পর অনেকে ভেবেছিল গিয়াস উদ্দিনের বৌ হয়ত ওকে ত্যাগ করে চলে যাবে। মাত্র এক বছরের বিবাহিত জীবনে কোন সন্তান আসেনি। ভরা যৌবন আর সৌন্দর্যের ডালি সাজিয়ে সাত বৎসর অপেক্ষা করা হয়ত সম্ভব হবে না। স্বামীর দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে স্ত্রীর বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার ধর্মেও স্বীকৃত।

কিন্তু স্বামী প্রেমে মশগুল ফিরোজা সে সব চিন্তাকে কাছেই ঘেঁষতে দিল না। অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে গিয়াস উদ্দিনকে আশ্বাস দিল, আমি তোমারই জন্য অপেক্ষা করে থাকব। নির্ভাবনায় তুমি মেয়াদ উত্তীর্ণ করে ফিরে এস, আবার আমরা সুখের সংসার গড়ব।

স্ত্রীর আশ্বাস বাণী শুনে গর্বে আনন্দে গিয়াস উদ্দিনের বুক স্ফীত হয়ে

www.pathagar.com

উঠেছিল। ওর মনে দৃঢ়তা ফিরে এল। হাসিমুখে জেলের মেয়াদ কাটিয়ে দেওয়ার মানসিক শক্তি আহরণ করল। গিয়াস উদ্দিনের স্ত্রী ওকে আরও বলল, কোন মানুষের প্ররোচনা যাতে আমাকে স্পর্শ করতে না পারে, তার জন্য তুমি বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত আমি তোমাদের বাড়ির বাইরে পা রাখব না, বাপের বাড়িও যাব না।

স্ত্রীর একনিষ্ঠ সংকল্পের কথা শুনে গিয়াস উদ্দিন আরও চমৎকৃত হয়ে গেল। এতখানি স্বার্থ ত্যাগ সে আশা করতে পারেনি। মেয়েদের পিতৃগৃহে যাওয়ার লোভ সম্বরণ সাধারণ কথা নয়। স্ত্রী-গর্বে গর্বিত গিয়াস উদ্দিন ওর ভাইদের ডেকে এনে বৌয়ের দায়িত্ব দিল। ভাইরা সহজেই ভাবীর যত্ন আত্তির প্রতিশ্রুতি দিল। গিয়াস উদ্দিন ওর পরম বন্ধু খালেদকেও অনুরোধ জানাল ওর স্ত্রীকে দেখাশুনা করার। খালেদ প্রিয়তম সুহৃদের পত্নীর প্রতি যথাযোগ্য কর্তব্য পালনের প্রতিশ্রুতি দিল।

বন্ধু এবং ভাইদের প্রতিশ্রুতি আর স্ত্রীর আশ্বাসে বিশ্বাস রেখে আগামীদিনের সুখী জীবনের স্বপ্ন দেখেই গিয়াস উদ্দিন সাতটি বৎসর কাটিয়ে দিল। বাড়িঘরের সংবাদ নিয়মিত পেয়েছে। ইতিমধ্যে ওর দুই ভাইই বিয়ে করে সংসারী হয়েছে। শ্বশুর-শাশুড়ী, দেবর-জা এবং তাদের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ওর ফিরোজা আনন্দেই দিন কাটাচ্ছে। স্বামীর বিরহ যাতনা ব্যতিরেকে অন্য কোন দুঃখ ফিরোজা অনুভব করেনি। বৎসরে দু একবার ওর সাথে দেখা করে গিয়েছে পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে।

আসন্ন মুক্তির আনন্দে মাতোয়ারা গিয়াস উদ্দিন জানতেও পারেনি নিয়তির আর এক নিষ্ঠুর খেলায় ওর সকল সুখ স্বপ্ন এবং প্রিয়া-মিলনের সম্ভাবনা চিরতরে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। ওর মুক্তির পূর্বদিন ওর মামলার অন্যতম আসামী ইউনুস ইন্টারভিউতে খবর পেয়েছে গিয়াস উদ্দিনের স্ত্রী ফিরোজা মাত্র দুদিন পূর্বে বাড়ি থেকে চলে গিয়ে স্বামীর বন্ধু খালেদকে পতিত্বে বরণ করেছে। ইউনুস এই মর্মান্তিক খবর গিয়াস উদ্দিনকে প্রকাশ করার সাহস পায়নি। ওদের দুজনেরই সুহৃদ পাসপাতালের অপর মেট হেলালকে জানিয়েছে। হেলাল সে কথা আমাকে জানায়।

খবরের আকস্মিকতায় বাকহারা হয়ে পড়লাম। ফিরোজা বা খালেদকে চিনি না, কিন্তু তারা যে হতভাগ্যের জীবনে নিষ্ঠুরতম আঘাত হানলো তাকে ত ভাল করেই চিনি। জানি, কি অসীম আগ্রহে গিয়াস প্রতিটি মুহূর্তে গুণছে

www.pathagar.com

প্রিয়ার সান্নিধ্যে পৌছার জন্য। প্রেয়সীর সুকোমল আলিঙ্গনের আশায় ও উম্মাদ হয়ে রয়েছে।

হেলাল এবং ইউনুসের সঙ্গে পরামর্শ করলাম এ খবর গিয়াস উদ্দিনকে ব্যক্ত করা যাবে না। যা আমাদের নিকটই অসহ্য মনে হচ্ছে সে খবরে গিয়াস উদ্দিনের মানসিক অবস্থা কি দাঁড়াবে কল্পনা করা যায় না।

মানুষের এক একটি কাজ পরবর্তীকালে তার জন্য যে ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনে তা যদি সে পূর্বাহ্নে জানতে পারত তা হলে হয়ত পৃথিবীর অর্ধেক সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। প্রাণাধিকা স্ত্রীর সুখসুবিধার ব্যবস্থা করার অতি আগ্রহে যে বন্ধুকে ডেকে এনে প্রতিশ্রুতি আদায় করছিল গিয়াস – সে বন্ধুই শেষ পর্যায়ে বিষবৃক্ষে পরিণত হল। বন্ধুর প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা স্ত্রীকে আত্মসাৎ করে নিজের প্রতিশ্রুতি পালনের উজ্জ্বল পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করল গিয়াসের আবাল্য সুহৃদ খালেদ।

বোধগম্য হল না, কি ধাতু দিয়ে সৃষ্টিকর্তা নারীর মনকে গড়েছেন। দীর্ঘ সাত বছরের মধ্যে যেভাবে গিয়াসের বাড়ির কেউ কিছু ঘুণাক্ষরে অবগত হল না সেখানে আমার পক্ষে কিছু কল্পনা করা সম্ভব নয়। গিয়াসের বাল্য সহচর হিসেবে ওদের বাড়িতে খালেদের অবাধ গতি। তদুপরি সে পেয়েছিল বন্ধুর বিদায়কালীন ছাড়পত্র, তারপর কোন দেবতার অমোঘ ইঙ্গিতে এ দুটি যুবক-যুবতী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং কবে কোন মূহূর্তে তারা বন্ধু ও স্বামীকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হয়ে যৌবনের উন্মত্ত স্রোতে নীতিবোধ হারিয়ে ফেলে তা দূর থেকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। দীর্ঘদিন ধরেই চলছিল ওদের পাপলীলা। সকলের চোখে ধুলা দিয়ে সে অবৈধ প্রেম হয়ত অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল, গিয়াস উদ্দিনের আশুমুক্তির সংবাদে দিশাহারা খালেদ ও ফিরোজা উপায়ান্তর না দেখে শেষ মূহূর্তে পরিণয়ের পথই বেছে নিল।

অকুল অন্ধকারে গিয়াস উদ্দিনের জীবনতরী ভাসিয়ে দিয়ে এই দুটি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী নর-নারী নিজেদের শান্তির নীড় রচনার প্রয়াস পেল। জানি না ওদের জীবনে সার্থকতার স্বর্ণচ্ছটা স্পর্শ করবে কি না। গিয়াসের জীবন যে বার্থতার পর্যবসিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার ভরপুর, সেটুকু উপলব্ধি করতে পারি।

পরদিন গিয়াস হাসিমুখে আমাদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে গেল।

www.pathagar.com

প্রিয়ামিলনের সুখ চিন্তায় বিভোর গিয়াসের চোখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ওকে বিদায় দিলাম। সমস্ত অন্তর মথিত করে আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, পণ্ডিতেরা ঠিক বলেছিলেন, স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম দেবা না জানন্তি, কুতোঃ মনুষ্যাঃ।

সকাল বেলা হাসপাতালের দ্বিতলের বারান্দায় রৌদ্রে বসে আছি। একজন কয়েদী কি কাজে বারান্দায় ঢুকেই আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি আত্ম-গোপন করার চেষ্টা করল। কিন্তু ততক্ষণে আমি তাকে দেখে ফেলেছি। এ যে কালু। ওর এক আত্মীয় আমার সম্পর্কে আত্মীয় লাগে। কালুর বড় ভাই লালুকেও চিনতাম। ঢাকা শহরের অনেক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তার কণ্ঠ সঙ্গীতও শুনেছি। এখন সে লন্ডনে কি একটা চাকরি করছে। কালুর আর এক ভগ্নিপতি সিলেটের এক চা বাগানের ম্যানেজার – তাকেও চিনি। অবস্থানপন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবারের কনিষ্ঠ সন্তান কালু তার গান বাজনা নিয়ে মেতে থাকে বলেই জানতাম। শুনেছিলাম ইদানীং সে মেয়েদের গান বাজনার শিক্ষকতা করে।

অনেকদিন পর কালুকে লৌহকপাটের অন্তরালে কয়েদীর পোষাকে দেখে একটু আশ্চর্যই হয়ে গেলাম। এর মধ্যে কালুর জীবনে আবার কোন অদৃষ্টের খেলা জমে উঠল জানার আগ্রহ হল।

কালুকে কাছে ডাকলাম। নতমস্তকে কুণ্ঠিত পায়ে সে এগিয়ে এল। পরিচিত জনের সম্মুখে কয়েদীর বেশে উপস্থিত হওয়ার প্রাথমিক লজ্জা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার, আপনি এখানে?

কালু জবাব দিল, ছ'মাস হল – আমার চার বৎসরের জেল হয়েছে।

কি মামলা? কত ধারা?

কালু আমার মুখের পানে চেয়ে সহজ হওয়ার চেষ্টা করল। বলল, ৩৬৬ ধারার মামলা। ধারা শুনেই বুঝতে পারলাম কালু মিয়ার পেটে কিঞ্চিত রহস্য জমা হয়ে আছে। সেটুকু জানা দরকার। কালুকে সরাসরি বললাম, আপনার কাহিনী খুলে বলুন। কালু কিছুক্ষণ কি চিন্তা করল, তারপর শান্ত কণ্ঠে বলল,

www.pathagar.com

আত্মীয় স্বজনের নিকট মুখ দেখবার আমার উপায় নেই। ঘনিষ্ঠতম কয়েকজন ছাড়া আর কেউ আমার জেল খাটার কথা জানে না। আত্মীয় হিসেবে নয় আইনজীবী হিসেবেই আপনাকে সব বলব। কিন্তু এখন নয়, বিকেলে অবসর মত সব কথা জানাব।

দ্বিপ্রহরের আহারের পর জেল খানার কর্মচাঞ্চল্য স্তিমিত হয়ে পড়ে। কয়েদীরা তাদের স্বস্তির ক্ষণটুকুতে সিয়েস্তায় ঢলে পড়ে। বিকাল চারটা থেকে আবার সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত জেল খানা সরগরম হয়ে ওঠে।

সারা জেলখানা এখন বৈকালিক তন্দ্রায় আচ্ছন্ন, ডিউটিরত মিয়াসাবদের বুটের খট্‌খট্ আওয়াজ ছাড়া অন্য কোন শব্দ শুনা যাচ্ছিল না। একটি চেয়ার টেনে নিয়ে বারান্দায় এসে বসলাম। কালু বারান্দার রোলিং এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার যে কাহিনী বর্ণনা করল তা ঘটনা বিন্যাসের দিক থেকে নতুনত্বের দাবী করতে পারে না। প্রেমের বিস্তৃত রাজত্বে প্রায়ই এরূপ ঘটনা সংঘটিত হতে দেখা যায়। আইন ব্যবসায়ে যোগদান করার পর এমনি অনেক ঘটনা স্বচক্ষে দেখতে পেয়েছি। কিন্তু ঘটনা সংঘাতকে বাদ দিলেও কালুর কাহিনীর মধ্যে যে উপসংহার রয়েছে তা কেবল অনবদ্যই নয় অভূতপূর্বও বটে।

দু তিনটি বাসায় মেয়েদের গানের শিক্ষক নিয়োজিত হয়েছিল কালু। শহরের অনেক অভিভাবকেরই প্রবণতা রয়েছে মেয়েদের গানবাজনায় খানিকটা পারদর্শী করে তোলার। উদ্দেশ্য, বিয়ের বাজারে তাদের উচ্চ মূল্যায়ন। এমনি এক পিতা মাতার জৈষ্ঠা কন্যা পিনু স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। সুশ্রী তন্বী পিনুর পিতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের একজন কর্মচারী। গুটি কয়েক সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে শহরের একটি মধ্যবিত্ত এলাকায় সাধারণ ভাবে বাস করেন ভদ্রলোক। প্রথম সন্তান আদরের কন্যাটিকে গীত বিদ্যায় কিছুটা পারদর্শী করে তোলার মানসে তিনি গানের শিক্ষক মোতায়েন করেন। আমাদের কালুই পিনুর শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করে। গান শিখতে এসে শিক্ষক যে শেষ পর্যন্ত ছাত্রীটিরই ভার গ্রহণে অগ্রসর হবে এ কথা ভদ্রলোক সেদিন কল্পনা করেননি।

নিভৃত কক্ষে গান বাজনায় চর্চার মধ্য দিয়ে অচিরেই দুটি তরুণ প্রাণ কাছাকাছি চলে আসে। প্রবীণেরা বলেন, মোম আর আগুন পাশাপাশি কাছাকাছি রাখলে মোম গলতে বাধ্য। আগুনের উত্তাপের চাইতে হৃদয়ের

www.pathagar.com

উত্তাপ কম নয়। কালু ও পিনুর হৃদয় দুটিও পরস্পরের উত্তাপে তরল হয়ে একীভূত হয়ে গেল। গুরু শিষ্যের প্রেম অন্যদের অলক্ষ্যে ঘনীভূত হয়ে উঠল। ওরা হাতে হাত রেখে পরস্পরের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল – যত বাধা বিপত্তিই ওদের পথে আসুক না কেন ওরা দুজন ঘর বাঁধবেই।

সংসার অনভিজ্ঞ পিনু ভাবত প্রেমের পথ কুসুমাস্তীর্ণ, শুধুই প্রিয়তমের সান্নিধ্য সুধায় ভরা, সে জানতনা এ পথের বাঁকে বাঁকে কন্টক সংকুল দুরূহতাও বিরাজমান। বালিকার দুর্দমনীয় হৃদয়াবেগে আর প্রথম প্রেমের আনন্দের উষ্ণতায় পিনু পিতামাতার মনোভাব বা কালুর সংগে বিবাহের সম্ভাব্যতা বিচার করে দেখেনি। কালুর ক্ষেত্রে সে কথা প্রযোজ্য ছিল না। অনেক ঘাটে নৌকা বেয়ে সে পোড় খাওয়া মাঝি। সে জানত পিনুর পিতা তাকে কখনই কন্যা সম্প্রদান করবে না। পিনুর পিতার ধারনায় সে অল্প শিক্ষিত বয়ে যাওয়া এক গানের মাষ্টার ছাড়া আর কিছু নয়। এ হেন পাত্রের নিকট পিনুর মত সুন্দরী সর্বগুণান্বিতা মেয়েকে অর্পণের কথা তিনি কোনদিন চিন্তায়ও প্রশয় দেবেন না।

কিন্ত পিনুর ভালবাসায় এতটুকু খাঁদ ছিল না। ওর পেমের অকৃত্রিমতার উপর নির্ভর করেই কালু সংকল্প আটল – পিনুকে সে সহধর্মিনী করবেই।

এদিকে কালুর পিতামাতা ওর বিয়ের জন্য সক্রিয় হয়ে উঠলেন। বাউণ্ডুলে স্বভাবের কালু গান-বাজনা ও ছাত্রীদের নিয়েই মেতে থাকে। স্বভাবতই পিতা মাতা ওকে নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকতেন। তারা অচিরেই কালুর জন্য পাত্রী মনোনীত করে বিয়ের কথাবার্তা পাকা করে ফেললেন। সব শুনে সে দূর্ভাবনায় পড়ে গেল। বাবা-মার পছন্দ করা পাত্রীকে নাকচ করে দেওয়ার সাহস বা যুক্তিসংগত কারণ নেই। কিন্তু পিনু ছাড়া কালুর জীবন যে অর্থহীন।

পিনুর বাসায় কালু সেদিন বার বার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। বলবে বলবে করেও প্রকাশ করতে পারছিল না। পিনু ওর মাথার এলামেলো চুলগুলির মধ্যে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, তোমার আজ কি হয়েছে বল ত? এত মনমরা হয়ে আছ কেন?

কালু পিনুর সুডোল হাত দুটি নিজ হাতে ধারণ করে বলল, পিনু, বাবা মা আমার বিয়ে ঠিক করেছেন। অত্যন্ত চাপ দিচ্ছেন, বিয়ে করে তাদের প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করার জন্য।

www.pathagar.com

পিনু ওর বড় বড় চোখ দুটির শান্ত দৃষ্টি কালুর মুখের উপর ফেলে ধীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল, পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্যের কথা ভাবছ, আমার প্রতি যে কর্তব্য আছে তার সম্বন্ধে কি ভাবছ?

কালু জবাব দিল, তোমার প্রতি কর্তব্য ভাবনা চিন্তার ঊর্ধ্বে, সে ঠিক করেই রেখেছি। প্রয়োজন শুধু তোমার সহযোগিতা।

প্রণয় স্রোতে ভাসমান দুটি প্রাণ চির-মিলনের পন্থা নিরুপণে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। উভয় পরিবারের প্রতিবন্ধকতা অনুধাবন করে ওরা মরিয়া হয়ে উঠল। সকল অন্তরায়কে অবহেলা করে উভয় উভয়কে বরণ করে নেবার জন্য ওরা কৃতসংকল্প। অন্য কোন সুগম পন্থা আবিষ্কার করতে না পেরে কালু প্রস্তাব করল, চল পিনু আমরা পালিয়ে যাই। পিতামাতার চোখের আড়ালে গিয়ে আমরা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হব। আমাদের বিবাহিত দেখে শেষ পর্যন্ত উভয় পরিবারই স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হবে।

কালু-অন্তঃপ্রাণ পিনু ওর প্রেমাষ্পদের নির্দেশিত পথকেই বেছে নিল। এক সন্ধ্যায় প্রেমিক-প্রেমিকা যুগল সকলের অলক্ষ্যে সিলেট-গামী ট্রেনে চেপে বসল। উদ্দেশ্য কালুর চা বাগানের ভগ্নিপতির ওখানে গিয়ে ওঠা। পিনু সামান্য দু'একখানা শাড়ি, ব্লাউজ ছাড়া ওর নিজস্ব অলংকারাদিও সঙ্গে নিয়ে এসেছিল।

বোন-ভগ্নিপতির ওখানে পৌছে কালু তাদের সব খুলে বলল। অনুরোধ জানাল ধর্মমতে ওদের বিবাহের ব্যবসস্থা করে দেওয়ার জন্য। বোন-ভগ্নিপতি প্রারম্ভে অস্বস্তি অনুভব করলেও ওদের বিবাহ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে দিলেন। ওদের বিয়ে দেওয়া ব্যতিরেকে তখন গত্যন্তরও ছিল না। বিয়ের পর প্রায় এক মাস ওরা ওখানে কাটাল।

এই একটি মাসের স্মৃতি কালু কোনদিন ভূলতে পারবে না। পরিপূর্ণ প্রাপ্তির আনন্দ কাকে বলে ওরা এ সময় জানতে পারল। দুজন দুজনার মধ্যে সমস্ত বিশ্ব সংসার হারিয়ে ফেল্‌ল। স্বল্পস্থায়ী দাম্পত্য জীবনের সেই সুমধুর দিনগুলিকে ওরা ওদের কামনা কাসনার সহস্র সফলতায় সার্থক করে তুল্‌ল। মাটির পাহাড়ের সুউচ্চ টিলায় অবস্থিত ম্যানেজারের বাংলোর মনোমুগ্ধকর পরিবেশে এ দুটি প্রেমিক-প্রেমিকা স্বর্গের আনন্দ-মিলনকে ধরার ধুলায় নামিয়ে এনেছিল।

www.pathagar.com

কিন্তু দীর্ঘদিন লুকিয়ে থেকে দাম্পত্য সুখ ভোগ করা সম্ভব নয়। এরা ওদের বিবাহের স্বীকৃতি আদায় করে স্বাভাবিক সংসার ধর্ম পালনের জন্য আহান্বিত হয়ে উঠল। বোনের বাসায়ও স্ত্রীকে নিয়ে আর বেশীদিন অবস্থান করা সম্ভব নয়।

কালু এবং পিনু ঠিক কলল, ওরা ঢাকা ফিরে আসবে। নিজ নিজ পরিবারে ফিরে গিয়ে ওরা ওদের বিয়ের কথা প্রকাশ করবে। এরপর বাবা মা আর অভিভাবকেদের হাতে-পায়ে ধরে ওরা ক্ষমা চেয়ে নেবে। বিয়ে যখন হয়েই গিয়েছে তখন ক্ষমা করে ওদের স্বীকৃতিও তারা না দিয়ে পারবে না। এমনি চিন্তার বশবর্তী হয়ে একমাস পর ওরা ঢাকার ট্রেনে চেপে বসল।

ঢাকা স্টেশনে পা দিতেই পুলিশ উভয়কে গ্রেফতার করে গারদে নিয়ে পূরল। অসহায় কালু ও পিনু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল।

কালুদের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে ওর বিরুদ্ধে নারীহরণ মামলা দায়ের করেছিলেন পিনুর পিতা। পুলিশ কর্মচারীর মেয়ে হরণের অভিযোগে অভিযুক্ত কালুর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে কালু ও পিনুর ফটো সংগ্রহ করে সমস্ত পুলিশ বিভাগ ওদের গ্রেফতার করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিল। ঢাকায় পদার্পণ করা মাত্রই ওরা দুজনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হল।

তারপরের ইতিহাস যতাবিধি। কালু এবং পিনুকে ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা হলে উভয়েই ওদের স্বেচ্ছায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কথা প্রকাশ করল। কিন্তু পিনুর বয়সের সার্টিফিকেট প্রমাণ করল, সে নাবালিকা, বিবাহে সম্মতি দিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। ম্যাজিস্ট্রেট কালুকে হাজতে পাঠলেন আর পিনুকে পিতা-মাতার হস্তে প্রত্যপর্ণ করলেন। পিনুর ডাক্তারী পরীক্ষারও ব্যবস্থা হল।

অচিরেই কালুকে নারী হরণ এবং ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত করে কারাগারে সোপর্দ করা হল। কালুর ভরসা ছিল পিনু নিম্ন আদালতে যেমনি করে নিজ ইচ্ছায় ভালবাসার পাত্রের সঙ্গে গৃহে ত্যাগ এবং স্বেচ্ছায় তাকে স্বামীত্বে বরণের সাক্ষ্য দিয়েছে তেমনি করে দায়রা আদালতেরও সাক্ষ্য দিবে। কিন্তু পিতা-মাতার পক্ষপুটে আশ্রিতা পিনু কালুর সকল আশার মূলে ছাই নিক্ষেপ করে তোতাপাখীর মত সাক্ষ্য দিয়ে গেল, কালু ওকে ফুসলিয়ে পিতৃগৃহ থেকে বের করে নিয়ে গিয়েছে এবং ওর সম্পূর্ণ অমতে বিয়ের প্রহসন

www.pathagar.com

করে একমাস ধরে ওর দেহভোগ করেছে – সে কালুর সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করেছে।

আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অপলক চোখে কালু তাকিয়েছিল বিপরীত দিক অবস্থিত সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো ওর মানসীর ভাবলেশহীন মুখটির দিকে। বার বার কালু ওর দৃষ্টির সাথে দৃষ্টি মিলাতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু পিনু একটি বারের জন্যও ওর দিকে তাকায়নি। হয়ত তাকাতে পারেনি, বিচারকের আসনের দিকে একভাবে তাকিয়ে থেকেই বক্তব্য শেষ করেছে। কালুর কৌশুলীর শত জেরার মুখেও অবিচলিত থেকেছে। সাক্ষ্য শেষ হলে কোনদিকে দৃষ্টিপাত না করে সোজা আদালত কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গিয়োছে। বক্ষ বিদীর্ণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে কালু ওর অপসৃশয়মান প্রেয়সীর নির্গমনের পথের দিকে তাকিয়ে থেকেছে। ব্যথায় সারা বুক মোচড় দিয়ে উঠেছে। অতি কষ্টে চোখের জল রোধ করে শূন্যে তাকিয়ে থেকেছে।

কালুর এডভোকেট ওকে বাঁচাবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। ওর অভিবাকরাও সে সময় ওর পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু পিনুর সাক্ষ্যই ওর কাল হল। ওর পক্ষ থেকে যুক্তি দেখান হয়েছিল, নিম্ন আদালতে এক কথা বলে এখন ভিন্ন কথা বলার পশ্চাতে নিশ্চয়ই অভিভাবকদের অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাব কাজ করেছে। হয়ত বা অকথ্য নির্যাতন আর দৈহিক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরেই শেষ মুহূর্তে পিনু একরোখা পিতার অভিমত মেনে নিয়েছে। ওকে নিউট্রাল হোমে পাঠিয়ে সাক্ষ্য গ্রহণ না করলে বিচারের চাইতে অবিচারই বেশি করা হবে।

কিন্তু কোন যুক্তিই কার্যকরী হল না। বিচারে কালুর চার বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হল। আত্মীয়-স্বজন আপীল করার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু কালু নীরবে তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখান করল। ওর পিনুর হাত দিয়ে যে শাস্তি নেমে এসছে সেটুকু ওর প্রাপ্য। প্রিয়ার নিজ হস্তে দেওয়া শাস্তি আপীলের মাধ্যমে খন্ডন করে বা কমিয়ে প্রিয়ার দানকে সে ম্লান করতে প্রস্তুত নয়। অত্যন্ত নাটুকে ভাবে কালু তার কাহিনী আমাকে শোনাল। চুপ চাপ এতক্ষণ ওর ঘটনার মধ্যে মগ্ন হয়ে পড়েছিলাম। সে নীরব হতেই জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর পিনুর আর কোন খবর জনেন?

মুচকি হেসে কালু ওর ঝুলির শেষ ঝরতি পরিবেশন করল। মাস কয়েক পূর্বে ওর দেখা আসে। আত্মীয়-পরিজনদের কেউ হবে ভেবে ও দেখা

www.pathagar.com

করতে গিয়েই স্তম্ভিত হয়ে যায়, মুখ দিয়ে কোন কথা সরে না। দেখার নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে আছে পিনু, ওর মা এবং ভাইবোনেরা। একটু দূরে অধোবদনে দাঁড়িয়ে পিনুর পিতা। লোহার শিক আঁকড়ে ধরে কালু অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে ওদের দিকে। অন্যপ্রান্তে পিনুও শিক আঁকড়ে রয়েছে, চোখে অশ্রুর বন্যা। পিনুর মা-ই প্রথম কথা বললেন। জিজ্ঞেস করলেন কেমন আছ বাবা?

কালু শান্ত কণ্ঠে উত্তর করল, ভাল আছি। আপনারা ভাল আছেন?

পিনুর মা শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে জবাব দিলেন, কোথায় আর ভাল আছি বাবা? তুমি ক্ষমা না করলে আমার পিনুকে বাঁচাতে পারবো না। ও দানাপানি ছেড়ে দিয়েছে।

কালু পিনুর দিকে তাকিয়ে দেখল, সত্যিই ওকে যেন অনেকটা রোগা মনে হচ্ছে। পূর্বের সে লাবণ্য আর স্বাস্থ্যশ্রী আজ হতমলিন। ওর সাথে দৃষ্টি বিনিময় হতেই পিনুর চোখ থেকে আরও প্রবল বেগে অশ্রুবর্ষণ হতে লাগল। কিছুক্ষণ নীরবে অশ্রুপাত করে পিনু ধরা গলায় বলল, তুমি আমার স্বামী, শত অপরাধ করলেও আমি তোমার স্ত্রী। কি কারণে তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছিলাম কোনদিন সুযোগ পেলে সে কথা খুলে বলব। আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও। ওগো তুমি আমায় ক্ষমা কর। বলতে বলতে আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল পিনু। ওর মা বললেন, বাবা তোমার আমানত আমার নিকট জমা রইল। তুমি বাইরে এসেই পিনুকে পাবে।

এতক্ষণ পর্যন্ত পিনুর বাবা একটি কথাও বলেননি, নত মস্তকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবার এগিয়ে এসে স্ত্রীর কথার প্রতিধ্বনি করে বললেন, সবই আমার ভুল। যাই হোক তুমি ভালয় ভালয় বের হয়ে এস। পিনু তোমারই আছে।

কালু তাকে হাত তুলে সালাম করে কলল, আমার দূর্ভাগ্য আপনার পদস্পর্শ করে সালাম করতে পারলাম না। তাই হাত তুলেই সালাম জানাচ্ছি। যদি দিন আসে তখন আজকের অক্ষমতার ঋণ শোধ করব।

কালুর মনে হল এর চেয়ে চপেটাগাত করলেও তার মুখমণ্ডল এতখানি কালো হয়ে যেত না।

বার বার ক্ষমা চেয়ে পিনুরা সেদিন বিদায় নিয়েছিল। কালু বিদায় মুহূর্তে শুধু বলেছিল, দয়া করে জেলখানায় আপনারা আর আসবেন না। এই

www.pathagar.com

পরিবেশে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ অত্যন্ত বিসদৃশ্য। চার বৎসর পর আমিই গিয়ে আপনাদের সঙ্গে দেখা করব। পিনুর জন্য আপনারা ভাববেন না। আমি আছি।

তারা আশ্বস্ত হয়েই চলে গেলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে পিনু আবার আপনার জীবনে ফিরে আসছে? মনে হল কালুর চোখ দুটি একবার জ্বলে উঠল। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই হেসে জবাব দিল, তাইত মনে হচ্ছে। 'আমি যদি যাই বঙ্গে, কপাল যাবে সঙ্গে'।

কালুর কাহিনীর উপসংহারের নাটকীয়তা অত্যন্ত উপভোগ করছিলাম। শেষ হতেই হেসে ফেললাম। কালুও হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, শ্বশুর সাহেবকে আমার কি বলতে ইচ্ছা হয় জানেন? বলার ইচ্ছা জাগে, আব্বাজান, সেই নাচ ত নাচলেন, তবে কেন লোক হাসালেন?

আমাদের সম্মিলিত হাসিতে জেল হাসপাতলের নীরবতা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পড়ল।

হাসপাতালেই দেখা হয়ে গেল আমার তেষট্টি সালের ফালতু হাশেমের সঙ্গে দ্বিতল থেকে নীচ নামছিলাম। সিঁড়ির গোড়ায় সার্ট-লুঙ্গী পরিহিত একটি লোক সালাম করে স্মিত মুখে দাঁড়াল। এক মুখ কাঁচা দাড়ি গোঁফের আড়ালে হাসিটি অপরিস্ফুট। চিনতে না পেরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই সে বলে উঠল, চিনতে পারলেন না স্যার? আমি হাশেম। সেবার বিশ সেলে আপনার কাছে ছিলাম। তখন দাড়ি-গোঁফ ছিল না, তাই হয়ত .....।

তৎক্ষণাৎ চিনে ফেললাম। সেবার পুরান বিশ সেলে হাশেম অনেকদিন আমার কাছে ছিল। নিঃসঙ্গ করাবাসের সে দিনগুলিতে হাশেমই ছিল সর্বক্ষণের সঙ্গী।

ওর চুলের গুছি ধরে টেনে সামনে দাঁড় করিয়ে বললাম, হতভাগা চুল-দাড়ির যে জঙ্গল বানিয়ে রেখেছিস, চিনব কি করে? এতদিনে মেয়াদ শেষ করে তোর ত খালাস পাওয়ার কথা।

www.pathagar.com

ও মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, স্যার আপনার নিকট মিথ্যা বলব না। ছ'মাস পূর্বে খালাস নিয়েছিলাম ঠিকই, কিছুদিন হল আবার নিয়ে এসেছে।

বললাম, তুই প্রতিজ্ঞা করেছিলি আর ডাকাতি করবি না, সৎ জীবন-যাপন করবি। ডাকাতি না করলে তোকে অনর্থক গ্রেফতার করার গরজ পড়েনি কারো, নিশ্চয়ই আবার ডাকাতি করেছিস।

হাশেম প্রতি-উত্তর বলল, স্যার মিথ্যা বলব না ডাকাতি করেছি সত্য। কিন্তু তার জন্য আমি দায়ী নই। ডাকাতি করতে আমাকে বাধ্য করা হয়েছে।

বললাম, দূরাত্মার ছলের অভাব হয় না। কে তোকে মাথার দিব্যি দিয়ে আবার ডাকাতি করতে বাধ্য করেছিল? কেউ যদি সৎ জীবন-যাপন করতে চায়, কেউ তার প্রতিবন্ধক হয় না।

হাশেম বলে উঠল, হয় স্যার হয়। প্রতিবন্ধক হওয়ার লোকের অভাব নেই। দাগী অপরাধীর কি জ্বালা আপনারা অনুধাবন করতে পারবেন না। দুনিয়ার সকলেরই ভাল হওয়ার অধিকার আছে, সুখ-শান্তিতে বসবাস করার সুযোগ আছে। নেই কেবল হতভাগ্য দাগী আসামীদের। আমাদের দুঃখ কেউ বুঝবে না।

হাশেমের বক্তব্যের মধ্যে সার আছে একথা অস্বীকার করা যায় না। অদৃষ্টের পরিহাসে, ঘটনাচক্রে বা দূষিত সমাজ-ব্যবস্থার ফলে অনেকে অনেক ক্ষেত্রে একটা অপরাধ সংঘটিত করে ফেলে। সে পাপের প্রায়শ্চিত্তে করতে এসে সেই যে পুলিশের শ্যেন দৃষ্টিতে পড়ে যায়, সেই হতে বাকী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ তাড়া করে বেড়ায়। অনেক অপরাধীর নিকট থেকে প্রায় একই অভিযোগ বার বার শুনে এবং উপলব্ধিগত প্রজ্ঞার আলোকে সিদ্ধান্তে এসেছি, ওদের অভিযোগের সত্যতা সন্দেহাতীত। কথায় বলে 'বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা, পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা'। হয়ত পুলিশেরও সবটুবকু দোষ নয়। সমাজ-ব্যবস্থা এবং প্রচলিত আইনই হয়ত তাদের কর্মের সহায়ক।

প্রথমবার অপরাধ করে সাজা খেটে সৎ জীবন-যাপনের দৃঢ় শপথ নিয়ে কারাগারের বাইরে পা রেখে দুটি দিনও স্বস্তিতে বসবাস করতে পারে নি, এমন ঘটনায় অভাব নেই। সম্পূর্ণ নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও কেবল দাগী হওয়ার অপরাধে তাদেরকে আশপাশের প্রতিটি অপরাধ ও দুষ্কৃতির জন্য দায়ী করা

www.pathagar.com

হয়। শেষ পর্যন্ত সেসব অভিযোগ প্রমাণিত হয় না, কিন্তু টানা হেঁচড়ার ফলে হতভাগ্যের জীবন দূর্বিষহ হয়ে উঠে। অনেক খোসারত দিয়ে, অনেক হস্তকে সন্তুষ্ট করে হয়ত সে সাময়িক মুক্তি পায়। দু'দিন পর পুনরায় একই অংক অভিনীত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে অতিলোভী অর্থলোলুপ পশুরা ওদেরকে চুরি-ডাকাতি করার জন্য রীতিমত উস্কানি দেয়। এদের প্রভাব, দারিদ্র্যের চাপ এবং সর্বোপরি সৎ জীবন-যাপনের পরিপূর্ণ প্রতিকুল পরিবেশ ওদের বাধ্য করে চুরি ডাকাতি-রাহাজানিকেই পেশা হিসেবেই গ্রহণ করে নিতে। পিঠে পড়বে, পেটে পড়বে না – এ ব্যবস্থা ওরা মেনে নিতে পারে না।

এইসব সমাজ-বিরোধীদের দষ্কৃতির সমালোচনায় যখন মুখর হয়ে উঠি তখন একটি বারও ওদের এ পরিনতির পশ্চাতে নিজেদের বা সামগ্রিকভাবে সমাজের দায়িত্ব বিশ্লেষণ করে দেখি না। ভেবে দেখি না এদেরকে ধিক্কার দেওয়া আত্মপ্রবঞ্চনারই নামান্তর।

অল্প বয়সেই হাশেম বেশ নামকরা ডাকাত বনে গিয়েছিল। ভয়-ভীতি বলতে সে কোন কিছু জানে না। দুঃসাহসিক অভিযানের কৃতকার্যতায় হাশেম ছিল অপ্রতিন্দ্বন্দ্বী। ওর উস্তাদ এবং শ্বশুর রহিম গাজী ওর জন্য গর্বানুভব করত এবং এক একটি বিপদসংকুল অভিযানে হাশেমের শক্তি-সাহস এবং বুদ্ধির পরিচয় লাভ করে গাজী তার অনুচরদের ডেকে বলত, আমার অবর্তমানে হাশেম মিয়ার হাতে আমার দলের খ্যাতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করবে।

গৃহস্তের সন্তান হাশেম ডাকাত ছিল না। এদের বংশেও কেউ কোনদিন চুরি ডাকাতি করে নি। কিন্তু রহিম হাজীর সোমত্ত মেয়ে সাইফুনকে যে দিন প্রথম হাশেম দেখল সেদিন ওর ভাগ্যকাশে শনির দৃষ্টি পড়ল। সাইফুনের রূপ যৌবন ওকে পাগল করে তুলল। ডকাতের মেয়ে জেনেও হাশেম ওকে বিয়ে করতে দ্বিধা করল না। বাপ-ভাইদের অনুরোধ-উপদেশ অবহেলা করে, তাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে এসে দাঁড়াল রহিম গাজীর বাড়িতে। সাইফুনের মুখের একটুকরো হাসিতে ওর সব দুঃখ দুর হয়ে গেল। অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী বলিষ্ঠ হাশেমকে জামাই করতে পেরে রহিম গাজী যার পর নেই আনন্দিত। এত দিনে মনের মত এক জন আপন লোক পাওয়া গিয়াছে, সে তার সহকর্মী হওয়ার সম্পূর্ণ যোগ্য।

হাশেম ভেবেছিল, বিয়ের পর সাইফুনকে নিয়ে সে কোন দূর শহরে চলে

www.pathagar.com

যাবে। সেখানে সারাদিনের কায়িক পরিশ্রমের সে যা রোজগার করবে তাই দিয়ে তাদের দু'জনের সুখে-দুঃখে চলে যাবে। দু'জনের প্রেম-প্রীতি দিয়ে মাটির ঘরে স্বর্গ গড়ে তুলবে।

কিন্তু প্রখ্যাত ডাকাত রহিম গাজীর মেয়েকে সে চিনত না। তার বাইরের রূপ দেখে হাশেম ভুলেছিল। বিষকন্যা সাইফুন আস্তে আস্তে হাশেমকে সম্মোহিত করে ফেলল। সাইফুনের ইচ্ছার দাস হাশেম অচিরেই শ্বশুরের কুল পেশায় যোগ দিল। বাইশ বৎসর বয়সে গুরুর যোগ্য শিষ্য রূপে ডাকাত সমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করল।

পুরুষের জীবনের নারীর প্রভাব অপরিমিত। নারী প্রেয়সী, নারী প্রেমময়ী স্ত্রী, মমতাময়ী মা ও স্নেহময়ী ভগ্নি বা কন্যা। রমণীর গুণে সংসার সুখের হয় আবার তারই কারণে শুধু সংসার কেন একটা পরিবার, একটা জাতি বা রাজ্যের পতন ঘটে। ইতিহাসে এরূপ ঘটনার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। নারীর সুষমামণ্ডিত মংগলময় দুটি হস্তে যেমন পুরুষের জীবনকে স্বর্গীয় আনন্দ সুধায় ভরে তুলে তেমনি সে দুটি হস্তের পরিবেশিত গরলে নরের জীবন-যৌবন চির তমসায় বিলীন হয়ে যায়। একদিকে স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, করুণা ও দক্ষিণ্যের স্বর্গীয় প্রতিমূর্তি, অন্যদিকে হিংসাদ্বেষ, জিঘাংসা ও কুটিলতার নিষ্ঠুর নায়িকা।

যে সাইফুনের জন্য হাশেমের জীবন সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্ধকারময় চোরাপথে চালিত হল দশ বৎসর ওর সাজা হয়ে গেলে সেই সাইফুনই ওকে পরিত্যাগ করে অন্য একজন ডাকাতকে জীবন সঙ্গীরূপে গ্রহণ করল। কারাভ্যন্তরে বন্দী হাশেম সে খবর পেয়ে দু'একদিন মুষড়ে থাকলেও সহজেই নিজেকে সামলে নিল। দুষ্ট গরুর চাইতে শূন্য গোয়াল ভাল, একথা মেনে নিয়ে হাশেম প্রতিজ্ঞা করল জীবনে আর কোনদিন সে ডাকাতি করবে না। সাইফুনের সাথেই এ অধ্যায়ের সমাপ্তি হয়ে যাক।

সাইফুনও নারী আর কেরামতের মত দুর্ধর্ষ ডাকাত সর্দারকে যে সৎ পথে নিয়ে এসেছে সেও নারী।

কেরামত দশ সেলে হের্ড বাবুর্চি। ঢাকা জেলার এক নিভৃত পল্লীতে ওর

www.pathagar.com

বাড়ি। পিতা-মাতার একই সন্তান কেরামত অত্যন্ত আদর-যত্নে পালিত। তাই লেখাপড়ায় 'গদাধর চন্দ্র'। কেরামতের বাবা বেঁচে নেই। একমাত্র পুত্রের জন্য বসতবাটী, বাগান পুকুর প্রচুর আবাদী জমি ও সিন্দুকে মোটা টাকার ব্যবস্থা রেখে ওর পিতা নিশ্চিত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে কেরামতকে বিয়ে দিয়ে একটি সুন্দরী উদ্ভিন্ন যৌবনা বধু ঘরে এনে ওকে সংসারে সুখী করে যাওয়ার প্রচেষ্টা করে গিয়েছিল ওর মঙ্গলকাঙ্ক্ষী জন্মদাতা।

কিন্তু সংসারের সুখ সচ্ছলতা, মায়ের বুক ভরা স্নেহমমতা ও সুন্দরী স্ত্রীর হৃদয় নিংড়ানো প্রেম-ভালবাসা কিছুই কেরামতকে স্বাভাবিক জীবনের চক্রে আবদ্ধ করতে পারল না। শৈশব থেকেই ওর চরিত্রে কিছুটা অস্বাভাবিকতার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তার সঙ্গে যুক্ত হল গুটি কয়েক বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খল বন্ধুর সঙ্গদোষ। তার পরে কি করে কি হয়ে গেল, কেরামতও সঠিক করে বলে উঠতে পারে না। একদিন সে একটি ছোট ডাকাতের দল গঠন করে ফেলল। অর্থের লোভে, দারিদ্রের কষাঘাতে বা ঘটনাচক্রে নয় বরং দুরূহ মানসিকতার প্রভাবেই কেরামত রাতারাতি ডাকাত সর্দারে পরিনত হেয় গেল।

জগতের মধ্যে সবচাইতে এই কাজটিতেই সে বেশি আনন্দ পায়। জোর কর মানুষের বহুদিনের সযত্ন সঞ্চিত কষ্টার্জিত ধন-সম্পদকে দুহাতে লুটে আনার সময় সেইসব হৃতসর্বস্ব নর-নারীর হতমলিন সর্বহারা মুখচ্ছবি দেখে কেরামত এক অপার্থিব আনন্দ লাভ করে। এ এক অদ্ভুত মানসিকতা। লুটের ধন-দৌলতে কেরামতের বিশেষ লোভ নেই। আগ্নেয়াস্ত্র ক্রয় বা সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রেখে সে প্রায় সবটুকুই সহচরদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়। ডাকাতির অর্থ ভোগের মধ্যে নয় – ডাকাতি করার মধ্যেই কেমরামতের আনন্দ।

অল্পদিনের মধ্যেই সে বন্দুক নির্মাণ করতে শিখে ফেলে এর্বং অচিরেই স্বহস্ত নির্মিত বন্দুকে কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। ইতোমধ্যে পুলিশ ওর দলের গন্ধ পেয়ে গেছে। তারাও হন্যে হয়ে পশ্চাতে লেগে যায়।

বহুদিন পর্যন্ত কেরামতের মা, স্ত্রী বা গ্রামবাসী জানতে পারে নি কেরামত ডাকাত। স্ত্রী এবং মা পরে জানতে পারলেও ধরা দেওয়ার পূর্বদিন পর্যন্ত গ্রামবাসী জানতে পারে নি। জানলেও হয়ত বিশ্বাস করত না। মাঝে মাঝেই

www.pathagar.com

কেরামত বেশ কয়েক দিনের জন্য উধাও হয়ে যেত। মায়ের অনুরোধে ও স্ত্রীর চোখের জল ওকে আটকে রাখতে পারত না। দূরে দূরে ডাকাতি করত, নিজ এলাকায় কখনো প্রবেশ করত না। ওর আরও একটা গুণ ছিল সহজে কারো গায়ে হাত তুলত না। অত্যন্ত প্রয়োজন না হলে ডাকাতি করতে গিয়ে কখনই গৃহস্বামীকে প্রহার করতে অনুমতি দিত না। দলের উপর কড়া নির্দেশ ছিল কোন অবস্থাতেই নারী স্পর্শ করা যাবে না, শূন্য হস্তে ফিরতে হলেও না।

ডাকাত কেরামতের চরিত্রে বৈশিষ্ট্য ছিল। অন্যদের মত মদ, গাঁজা, ভাঙ বা বারবনিতার নেশা ছিল না কেরামতের। ডাকাতিই ছিল ওর একমাত্র নেশা।

সাধারণতঃ ডাকাতির সরঞ্জাম বা সহচরদের কেরামত কখনো ওর বাড়িতে নিয়ে আসত না। সে দিন হয়ত বা বিপদে পড়েই দুইটা বন্দুক ও জনকয়েক সহচর নিয়ে রাত্রির দ্বিপ্রহরে বাড়ি এসে উপস্থিত হল। এমনি সময়ে সে আর কোনদিন ফিরে আস নি। সদ্যনিদ্রাউত্থিতা মাতা ও স্ত্রী কেরামতের চেহারা, বন্দুক ও সহচরদের দেখে ঘাবড়ে গেল। হয়ত কিছুটা অনুমানও করতে পারল। একটি কথাও না বলে তারা নীরবে সে রাত্রে ওদের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করে দিল। প্রায় পক্ষকাল পরে গৃহে প্রত্যাগত স্বামীকে পেয়ে কেরামতের স্ত্রী এবার উৎফুল্লা হয়ে উঠতে পারল না। এক অজানা আশংকায় বার বার ওর শরীর কাটা দিয়ে উঠতে লাগল। কেরামতও এক নীরব যাতনায় এপাশ ওপাশ করে রাত্রির প্রহরটুকু কাটিয়ে দিল।

প্রত্যুষেই কেরামত তার সঙ্গীদের নিয়ে প্রস্থানের উদ্যোগ করল। কিন্তু কেরামতের বউ এবার নীরবে বসে থাকল না। এগিয়ে এসে ওর দুটি হাত চেপে ধরল। বলল, না কিছুতেই তুমি এখন চলে যেতে পারবে না। যদি আমার অনুরোধ অবহেলা করে চলে যাও, তাহলে ফিরে এসে আমার মুখ দেখতে পাবে না। পাঁচ পুকুরের পানি এখনও শুকিয়ে যায় নি।

স্বভাবত শান্ত প্রকৃতির স্ত্রীর কণ্ঠে দৃঢ়তা দেখে কেরামত স্তম্ভিত হয়ে গেল। স্ত্রীর চোখ দুটির মধ্যে এমন কিছু ছিল যা অবহেলা করা যায়না।

সহকারীদের বিদায় করে সে বাড়ীতের রয়ে গেল। দিনের বেলাটা নির্বিঘ্নেই কাটল, কিন্তু রাত্রিতে শয্যায় গিয়েই শুরু হল বোঝাপাড়া। বউ সব কথা জানতে চাইল। কেরামত বুঝতে পারল আর অস্বীকার করে লাভ নেই। স্ত্রী

www.pathagar.com

নিকট তখন ওর গোপন ডাকাত জীবনের বৃত্তান্ত খুলে বলল। সবু শুনে বউ একটি কথাও বলল না। পাশ ফিরে নিশ্চুপ হয়ে শুয়ে রইল। শত প্রশ্ন করেও কেরামত একটা উত্তরও পেল না। অনেক বিলম্বে কেরামতের যখন ঘুমের কোলে ঢলে পড়ার উপক্রম হল, তখন কান্নার শব্দে ওর তন্দ্রা ছুটে গেল। ওর স্ত্রী কাঁদছে। অস্ফুটে ক্রন্দনের আবেগে তার সর্বদেহ কেঁপে উঠল। কেরামত একটি কথাও বলতে পারল না, একটি সান্তনার বাণীও বধূকে শোনাতে পারল না। অসীম সাহসী পুরুষ কেরামত পার্শ্ববর্তিনী স্ত্রীর গায়ে হাত বুলিয়ে একটি প্রবোধবাণী শুনাতেও সাহস করল না।

বধূ সকালে ঘুম থেকে উঠে শাশুড়ীকে সব বলল। কেরামতের বৃদ্ধা মা বিলাপ করে উঠতেই বধূ তাকে নিবৃত্ত করল। বলল, আম্মা, চীৎকার করে সকলকে জানিয়ে দেবেন না, আপনার সুযোগ্য ছেলে ডাকাতে পরিণত হয়েছে। গাঁয়ের লোক কিছু জানে না। আমাকে চেষ্টা করতে দিন, দেখি সে পথ থেকে ফিরাতে পারি কিনা। শাশুড়ী বধূর অগ্নিদীপ্ত চোখ দুটির দিকে বারেক তাকিয়ে ওর হাত দুটি নিজের হাতে টেনে নিয়ে বলল, মা তোর চেষ্টা বৃথা হবে না, আমি দোয়া করছি তুই স্বামীকে সৎ পথে ফিরিয়ে আনতে পারবি।

সেদিন থেকে শুরু হল নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম। স্বামীর উদ্ভট মানসিকতা পরিবর্তনে স্ত্রীর নিরলস প্রচেষ্টা। যুক্তি-তর্ক, মান-অভিমান, অনুরোধ, উপরোধ, চোখের জল, হাতে-পায়ে ধরা প্রভৃতি যতগুলো অস্ত্র বধূর তূণে সংরক্ষিত ছিল সব সে একে একে প্রয়োগ করল। কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল, কেরামতকে টলাতে পারল না।

তখন ধীরে ধীরে বধূ নিজেকে গুটিয়ে ফেলল। একটা সূক্ষ্ম উদাসীনতার ধুম্রে নিজেকে সর্বদা আচ্ছন্ন করে রাখল। হাসে না, সাজসজ্জার ধার ধারে না, জিজ্ঞাসিত না হলে কথা বলে না। কেবল নীরবে ঘর-সংসারের কাজ করে যায় না। উচ্ছলতা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে দৈহিক কমনীয়তাও হ্রাস পেতে থাকল। কেরামতের সুন্দরী স্ত্রী দিন দিন মলিন হয়ে যেতে লাগল।

দাম্পত্য জীবনে উদাসীন স্ত্রীর চাইতে অস্বস্তিকর কিছু নেই। স্বামী সম্ভাষণে অনাকাঙ্ক্ষিত স্ত্রীকে দিয়ে দৈহিক প্রয়োজনীয়তা হয়ত মেটান যেতে পারে কিন্তু পরিপূর্ণ মিলনের সুখভোগ করা যায় না।

এবার কেরামতের টনক নড়ল। স্ত্রীর মুখে হাসি ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা

www.pathagar.com

করল। নিত্য নতুন প্রসাধন সামগ্রী ও শাড়ি-ব্লাউজ কিনে আনতে লাগল, কিন্তু স্ত্রী ভ্রুক্ষেপও করে না। রাত্রির অভিযানে আহরিত প্রচুর স্বর্ণালংকার স্ত্রীকে উপহার দিল। কিন্তু স্পর্শ করা দূরের কথা নীরব ঘৃণার দৃষ্টিতে সেগুলির দিকে তাকিয়ে ওর বউ ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কেরামতের আর সহ্য হয় না। বিবাহিতা স্ত্রীর ঘৃণা ও অবহেলা কোন স্বামীই বরদাস্ত করতে পারে না। একদিন কেরামত বজ্রমুষ্টিতে ওর স্ত্রীর হাত চেপে ধরল। জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি চাও? কি করলে তোমার সন্তুষ্টি ফিরে আসবে বল?

ওর চোখে চোখ রেখে বধূ জবাব দিল, তুমি যেদিন ডাকাতি করা ছাড়বে সে দিনই আমার হাসি ফিরে আসবে, তার পূর্বে কিছুতেই নয়।

কেরামত বলল, প্রয়োজন হলে তোমাকে ছাড়তে পারি, কিন্তু আমার কাজ ছাড়তে পারব না। ওর বউ হাত ছাড়িয়ে নিতে নিতে বলল, তবে তাই কর, ডাকাতের বউ হয়ে ঘর করার সাধ আমার নেই। বলেই স্বামীর সম্মুখে থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

রোষ কষায়িত লোচনে বধূর গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইল কেরামত। বুঝে উঠতে পারল না কোন অলৌকিক শক্তির বলে ওর নিরীহ বধূটির প্রকৃতিতে এত দ্রুত এত আশ্চর্য্য পরিবর্তন সাধিত হল।

কেরামতও প্রায়ই মেজাজ হারাতে লাগল। ফলে বধূর উপর দৈহিক নির্যাতনও নেমে আসল। কিন্তু গায়ের জোরে বা নির্যাতন-নিপীড়নের মাধ্যমে স্ত্রীর ভালবাসা বা সহযোগিতা লাভ করা যায় না।

এমনি করে তিনটি বৎসর কেটে গেল। ইতোমধ্যে কেরামতের বউ একটি পুত্র সন্তানের মা হল। কিন্তু না ছাড়ল কেরামত তার সাধের ডাকাতি, না ছাড়ল ওর বউ তার অবজ্ঞা ও উদসীনতার বর্ম।

কেরামত শেষ বারের মত বউকে শাসাল, ভালয় ভালয় যদি পথে না এসো তাহলে আমি দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করতে দ্বিধা করব না। বউ তার শ্রান্ত চোখ দুটির উদাস দৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর তুলে ধরে বলল, আমাকে দিয়ে তৃপ্তি না হলে একটা কেন আরও দশটা বিয়ে করতে পার, কিন্তু তোমার পাপ কার্য বন্ধ না করলে কোনদিন সুখ বা শান্তির মুখ দেখতে পাবে না।

কেরামত বৃথা আস্ফালন করে নি। মাস কয়েক পর এক রাত্রে একটি তরুণী

www.pathagar.com

মেয়েকে বাড়ি নিয়ে এল। মেয়েটি ওরই একজন সহযোগীর বোন। সর্দার বন্ধুর নিকট বোনকে বিয়ে দিতে পেরে সহযোগী কৃতার্থ। কেরামতের মা কান্না-কাটা করলেও ওর বউ স্বাভাবিক সহজতার মধ্য সপত্নীকে গ্রহণ করল।

নতুন বধূটি ডাকাতের বোন হলেও মনের দিক থেকে অত্যন্ত ধর্মভীরু ছিল। তাই স্বামীর কার্যকে সে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করত। শৈশব থেকে ডাকাতের ঘরে পালিত হয়েও হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে সে বিসর্জন দিতে পারে নি।

অল্প সময়ের মধ্যেই দুই সতীনের মনের মিল হয়ে গেল। প্রথমা ও দ্বিতীয়া ধ্যানে ও কর্মে একত্রিত হয়ে গেল। দুজনা মিলে একই সংগ্রাম পদ্ধতি গ্রহণ করল। উভয়ের একই প্রচেষ্টা, স্বামীকে পাপের পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে। কেরামতের প্রথমা স্ত্রী এযাবৎকাল একাকিনী যুদ্ধ করেছে, এখন থেকে সে একজন সঙ্গিনী পেল স্বামী দেবতার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য।

যৌথ আক্রমণে কেরামতের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে উঠল। এবার এক সার্থক অভিযান থেকে ফিরে এসেই কেরামত চরম ধাক্কা খেল। নবীনার প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণে সে দ্বিতীয়া স্ত্রীর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হল। লুণ্ঠিত দ্রব্যগুলির মধ্যে থেকে একটি বহুমূল্য স্বর্ণের হার সে নিয়ে এসেছিল। সেটি দ্বিতীয়া স্ত্রীকে উপহার দিতেই সে প্রথমার মত ঘৃণাভরে তা ছুঁড়ে ফেলে দিল। বলল, ডাকাতি করা জিনিস আমি আর স্পর্শ করব না। লজ্জা করে না, বউকে সৎপথে উপার্জন করে অলংকার দিতে পারেন না? পরের জিনিস লুণ্ঠন করে নিজের বউর কণ্ঠে চড়াতে চান! ছি!

বিস্মিত কেরামত হতবাক। ডাকাতের মেয়ে, ডাকাতের বোনের একি কথা। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে কাষ্ঠ হাসি হেসে বলল, এ কথা বড় বউর মুখে শোভা পেলেও তোমার মুখে শোভা পায় না। তোমার রক্ত-মাংসে ডাকাতির দান রয়েছে।

বউ সমভাবে জবাব দিল, ডাকাতের ঘরে জন্ম গ্রহণ করার অপরাধ আমার নয়। কিন্তু স্বেচ্ছায় ডাকাত স্বামীর ঘর করা অপরাধ। সে অপরাধ আর বাড়াব না।

কেরামতের মুখে রা নেই। বেশ কিছুক্ষণ পরে সে জিজ্ঞাসা করল, তা হলে

www.pathagar.com

তুমি কি আমার ঘর করবে না?

বউ এসে ওর দুটি পা জড়িয়ে ধরল। বলল, আপনি ডাকাতি করা ছেড়ে দিন, আমাদের কোন অভাব নেই। তবে কেন এ জঘন্য পাপে নিজে ডুবছেন, আমাদের সকলকে ডোবাচ্ছেন।

কেরামত রাগ করে উঠে বড় বউর ঘরে চলে গেল। সে ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছিল। স্বামীকে দেখে মাথার কাপড় টেনে দেওয়া ছাড়া আর কোন ভাবান্তর দেখাল না। পর পর প্রত্যাখ্যান ও উদাসীনতার কেরামত ক্ষেপে গিয়েছিল। উম্মত্তের মত সে স্ত্রীকে চেপে ধরে চীৎকারে করতে লাগল, বল ডাকাতি ছেড়ে দিলে তোমরা আমায় রেহাই দেবে? তোমাদের কথাই মেনে নিলাম – ডাকাতি আর করব না। বল, তোমরা আর আমায় নিশিদিন তুষের আগুনে পুড়িয়ে মারবে না?

ওর চীৎকার শুনে ছোট বউ এবং মা দৌড়ে এসে উপস্থিত হল। বউকে ছেড়ে দিয়ে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে কান্নায় ভেঙ্গে পরল কেরামত। ওর বউরা নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল। কেবল বৃদ্ধা জননী ওর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে তার অন্তর-মথিত আশীর্বাণী উচ্চারণ করতে লাগল।

পরের অধ্যায় সংক্ষিপ্ত। বেশ কয়েকটি ডাকাতি মামলার এক নম্বর আসামী কেরামত আত্মসমর্পণ করল। সি, আই, ডি-কে বাড়িতে আমন্ত্রণ করে এনে সে ধরা দিল। দুটো বন্দুকও সে সমর্পণ করল। ওর দুই স্ত্রী এবং মা সি, আই, ডি-র সম্মুখে উপস্থিত হয়ে ওর ডাকাতি ত্যাগের ইতিবৃত্তান্ত খুলে বলল। অনুরোধ জানাল, কেরামতের উপর যেন দৈহিক নির্যাতন করা না হয়। কিছুমাত্র শ্রম ব্যাতিরেকে এত বড় ডাকাতকে হাতে পেয়ে উৎফুল্ল সি, আই, ডি তাদেরকে কথা দিল কেরামতের উপর কোন উৎপীড়ন হবে না।

থানা বা হাজতে কেরামতের উপর দূর্ব্যবহার করা হয়নি, বরং সম্মানিত অতিথির আদর-যত্নই ওকে করা হয়েছে। সি, আই, ডি কেরামতের সঙ্গে অনেক ঝুলাঝুলি করেছিল অন্য সমস্ত আসামীদের নাম প্রকাশ করে দেওয়ার জন্য। লোভ দেখিয়েছিল রাজসাক্ষী বানিয়ে ওকে খালাস দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। কিন্তু কেরামত কোন চাপ বা প্রলোভনের নিকট নতি স্বীকার করে নি। সি, আই, ডির মন্ত্রনায় ভুলে অন্য কাউকেই সে তার মামলায় জড়িত করে নি। নিজে স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব বরণ করেছে। সুদীর্ঘ কারাবাসের ঝুঁকি নিয়েছে, তবুও নিজের অপরাধ অন্যের স্কন্ধে চাপিয়ে দোষ স্থালনের কিছু মাত্র

www.pathagar.com

প্রচেষ্টা করে নি। কেরামতের অনমনীয় মনোভাবের ফলে ওর প্রতি পুলিশ বিভাগ অসন্তুষ্ট হল। ফলে, ওর মামালাগুলোর অবস্থা সংকটজনক হয়ে দাঁড়াল।

সর্বমোট ওর পঁচিশ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হল। সাজার মেয়াদ একই সঙ্গে চলবে বলে বৎসর সাতেক পরই কেরামত মুক্তি পাওয়ার আশা রাখে।

কেরামত ওর কথা শেষ করে বলল, স্যার শেষ পর্যন্ত আমার বউদেরই জয় হল। স্ত্রী ভাগ্যে আমি ভাগ্যবান। এমন স্ত্রী না হলে জীবনে আমি ডাকাতি ছাড়তে পারতাম না। ডাকাতদের যা পরিণতি আমারও তাই হত। হয়ত ডাকাতি করতে গিয়েই কোন দিন গুলী খেয়ে মরে থাকতাম, নয়ত সারা জীবনই আমাকে কারাগারের ঘানী টানতে হত।

ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, বাড়ি-ঘরের খবরাখবর ঠিকমত পাচ্ছ ত? কেরামত বেশ সপ্রতিভ ভাবেই জবাব দিল, সব খবর পাই স্যার। দুই বউ মিলে সংসার আমার সুন্দরভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। আমি বাইরে থাকলেও হয়ত এত ভাল পারতাম না। ওদের দুজনকে দেখলে সতীন বলে মনে হবে না। মনে হবে ওরা দুটি বোন, একই মায়ের সন্তান। বলতে বলতে স্ত্রী গর্বে ওর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একটু থেমে নিজেই আবার বলতে শুরু করল, ছেলেটাকে নিয়ে প্রায়ই ওরা এসে দেখা করে যায়। ওরা আসলে আনন্দের চাইতে কষ্টই বেশি পাই। দুই দিকে শিক আর লোহার বেড়ার ব্যবধান ডিংগিয়ে ছেলেটাকে একটিবার কোলে টেনে নিতে পারি না, এ টুকুই দুঃখ।

ওকে বলি, জেল থেকে বের হয়ে যাই কর না কেন, ছেলেকে লেখাপড়া শিখাতে যেন ভুল না।

ওর চোখে-মুখে দৃঢ় প্রত্যয়ের ছাপ ফুটে ওঠে। বলে, আমাকে যদি না খেয়ে থাকতে হয়, ঘর-বাড়ি জায়গা-জমি যদি বিক্রয়ও করে দিতে হয় তবু আমি ছেলেকে লেখাপড়া শিখাতে কার্পণ্য করব না। মূর্খপুত্র দেশের শত্রু, এ কথা নিজেকে দিয়েই আমি সার বুঝেছি। শিক্ষার অভাবে নিজে কুপথে গিয়েছি, আমার ছেলের জীবনে যাতে সে সম্ভাবনা না আসে, পিতা হিসাবে এটাই হবে আমার বাকী জীবনের সাধনা।

অশিক্ষিত ডাকাত কেরামতের মুখ-নিঃসৃত কথাগুলি শুনে এক অনাবিল আনন্দে সারা মন ছেয়ে গেল।

www.pathagar.com

মনে পড়ে খুব শৈশবে মা আমাদের ঘুম পাড়াতে ব্যর্থ হয়ে ভয় দেখাতেন, তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে এক্ষুণি খোয়াইজ্জা আসবে।

খোয়াইজ্জা সম্মানার্থে খোয়াজ আলী সেই সময় আমাদের এলাকার ডাকসাইটে চোর। গুন্ডা-বদমাইশ নয়, ডাকাত হারমাদ নয়, ভূতপ্রেতও নয়-সামান্য একটা সিঁদেল চোরের আগমন আশঙ্কায় শৈশবের ভীতি-প্রবণ মন আতংকিত হয়ে পড়ত। চোখ বুঝলেই খোয়াজের একটা বীভৎস দানবিক রূপ কল্পনায় মূর্ত হয়ে উঠত। ভয়ে গায়ে কাঁটা দিত। নিদ্রা-দেবীকে ফাঁকি দিতে শত দুষ্টামি আর অত্যাচারে মাকে যখন অস্থির করে তুলতাম, বিছানায় শুইয়ে অচিন দেশের রাজপুত্র ও রাজকন্যার কেচ্ছা শোনাবার পরও যখন আমাদের চোখে ঘুমের লক্ষণ দেখা যেত না, ছোট ছোট চোখ গুলিকে পিট্ পিট্ করে জ্বলতে দেখা যেত, তখন বাধ্য হয়েই মা খোয়াজের নাম করে আমাদের ভয় দেখাতেন। সঙ্গে সঙ্গে ফললাভ হত। আমরা ক ভাইবোন চোখ বন্ধ করে চুপ করে পড়ে থাকতাম। চুপ কর শুয়ে থাকলে খোয়াজের আক্রমণের আপাতত আশঙ্কাহীনতার আশ্বাসে আমাদের বিশ্বাস ছিল। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকার ফলে আস্তে আস্তে আমরা ঘুমের কোলে ঢলে পড়তাম। মা হাঁফ ছেড়ে জায়নামাজ বিছিয়ে বসার ফুরসৎ পেতেন। শুধু আমরা নই, প্রতি বাড়িতেই রাত-জাগা দুষ্ট ছেলে-মেয়েদের ঘুম পাড়াবার অব্যর্থ মহৌষধ হিসেবে খোয়াজের নাম ব্যবহৃত হত।

বড় হয়ে খোয়াজকে দেখতে ইচ্ছা হল। শৈশবে যার নাম শুনে ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়তাম, যার কাল্পনিক আক্রমণের দুশ্চিন্তায় দুষ্টামি ভুলে লেপ-কাঁথার নীচে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকতাম, তাকে একবার চোখে দেখার আগ্রহ হল।

সে ইচ্ছা পূরণ হয় তেষট্টি সালের কারাবাসের সময়। পুরানো বিশ সেলের সংলগ্ন সুন্দর এক ফালি সবুজ জমি আছে। চারদিকে সাদা দেয়াল আর কালো লোহার আবদ্ধতার মধ্যে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলাম। বাইরের সবুজ মখনলে ঘেরা স্থানটুকুতে বিচরণ করার জন্য অন্তর ব্যাকুল হয়ে পড়ত। দীর্ঘদিন আবেদন-নিবেদন করে শেষ পর্যায়ে কর্তৃপক্ষের অনুমতি পেলাম।

বৈকালিক রৌদ্রের প্রখরতা হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা মাঠে নেমে

www.pathagar.com

পড়তাম। কিছুক্ষণ পায়চারী করে শ্যামল দুর্বাচ্ছাদিত একটি কোণ বেছে নিয়ে বসে পড়তাম। সেলের বাইরে মুক্ত আকাশের নীচে ক্ষণিকের জন্য বসতে পেরে মন প্রফুল্ল হয়ে উঠত।

বিকেলে মাঠে বসার অল্পক্ষণ পরই দেখতে পেতাম এক প্রায়-বৃদ্ধ কয়েদী একথাল ভাত নিয়ে আমাদের নিকট থেকে কিঞ্চিত দূরে বসে অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে রাত্রির আহার শেষ করছে। জেলখানায় দিনের আলো থাকতে থাকতেই রাত্রির খাওয়া সমাধা করতে হয়। খাওয়ার পর লক আপ। রোজই নিয়মিতভাবে কয়েদীটিকে একই স্থানে বসে আহার করতে দেখে আমার কৌতূহল হল। কৌতূহলের আরও কারণ দেখা দিল। চৌকার কয়েদীরা ভাত নিয়ে ডিগ্রী এলাকায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই উল্লিখিত লোকটি পূর্ণ একথালা ভাত সংগ্রহ করে খেতে বসে যেত। বিভিন্ন সেলে পরিবেশন করে ফিরে যাওয়ার সময় ওরা আর এক কাঠা ভাত লোকটির পাতে ফেলে দিত। সঙ্গে একটু ভাল বা তরকারি। লোকটি মাথার টুপির অভ্যন্তর থেকে দুটি বিড়ি বের করে ওদের হাতে তুলে দিত।

লেনদেনের গূঢ় তত্ত্বটি সম্যক উপলব্ধি করতে না পেরে খাওয়া হয়ে যেতেই লোকটিকে কাছে ডেকে কার্যকারণ বিশ্লেষণ করার অনুরোধ করলাম। সে যা বলল তার মর্মার্থ এই, সাধারণ কয়েদীদের জন্য বরাদ্দকৃত ভাতের পরিমাণ তার ক্ষুণ্নিবৃত্তির জন্য যথেষ্ট নয়, তাই পেটের দায়েই কষ্টার্জিত জেল কারেন্সি ব্যয় করে তাকে উদ্বৃত্ত ভাত-ডাল ক্রয় করতে হয়।

লোকটির দেহ আর পাঁচজন বাঙালীর দৈহিক মাপকাঠির ঊর্ধ্বে নয়। স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছে। তবুও ঐ দেহটির মধ্যে কোথায় এতটা ভাতের স্থান সংকুলান হয় ভেবে পেলাম না। লোকটিকে বেশ প্রতিভাধর বলেই মনে হল।

নাম-ধাম জিজ্ঞেস করতেই লোকটির পরিচয় বেরিয়ে পড়ল। সে আর কেউ নয়, আমাদের শৈশবের বিভীষিকা, সেদিনের প্রখ্যাত নিশিকুটুম্ব, স্বনামধন্য খোয়াজ আলী, বকলমে খোয়াইজ্জা চোরা।

আমি অনিমেষ নয়নে তার দিকে তাকিয়ে আছি দেখে সে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করল, স্যার আমার দিকে এত করে কি দেখছেন?

বললাম, তোমাকেই দেখছি। বহু রাত তোমার মূর্তি কল্পনা করে ভয়

www.pathagar.com

পেয়েছি। তোমার নাম শুনে সেদিন শিউরে উঠতাম, ঘুম পাড়াতে না পেরে মাকেও তোমার দোহাই দিতে হয়েছে। বড় হয়ে তোমাকে স্বচক্ষে দেখার প্রচুর আগ্রহ ছিল, আজ তার নিবৃত্তি হল।

খোয়াজ আলী আমার কথা শুনে একটু লজ্জিত হল। বলল, শুনেছিলাম দোগাছির একজন রাজবন্দী আছেন। আপনিই যে সে বন্দী তা বুঝতে পারিনি। বহুবার মনে করেছি, দেশের ছেলে, একবার দেখা করব। কিন্তু নিদারুণ লজ্জায় আমার গতিরোধ হয়ে যেত। আপনাদের গ্রামে আপনাদের বাড়িতেও আমি চুরি করেছি। আমি দ্বিধাবোধ করতাম।

ওর কথা শুনে হেসে উঠেছিলাম। ওকে বললাম, তোমার চৌর্যবৃত্তিতে যোগদানের কারণ এবং পরবর্থী জীবনের ইতিহাস খুলে বল, আমার জানার আগ্রহ হচ্ছে।

ও একটু হেসে বলল, কোন ইতিহাস নেই স্যার। খুব ছোট বেলা থেকেই চুরি করতাম। সংসারে অভাব ছিল। তাই পছন্দ না করলেও কেউ তেমন জোর করে বাধা দেয়নি। তারপর বলল, বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে পাকা চোর বনে গেলাম। বিক্রমপুরের প্রায় প্রতি গ্রামে চুরি করার কৃতিত্ব আমি দাবী করতে পারি। বহুবার ধরা পড়েছি, মার খেয়ে অর্ধমৃত হয়ে পড়েছি। জেল কতবার খেটেছি, তার সঠিক হিসাব জানা নেই। মেয়াদ শেষ হলে কয়েক দিনের জন্য বাইরে যাই, চুরি করি, আবার নূতন মেয়াদ নিয়ে নিশ্চিন্তে চলে আসি। মাঝখানে বাইরের কটা দিন কষ্ট হয়। জেলখানায় দিব্যি থাকি। পাকা দালান, দুবেলা ভরপেট খাবার আর সারা রাত্রি নাক ডাকিয়ে ঘুম। তাই এবার হাকিমকে বলছিলাম, হুজুর আমার চিরদিনের পেশা এ জীবনে আর ছাড়া সম্ভব নয়। দয়া করে বাকী জীবনের জন্য আমাকে জেল দিয়ে দিন। বার বার টানা-পোড়ন আর সহ্য হয় না।

সহজ-সরল বক্তব্যে কোন ফাঁক ছিল না। ওর কথা শুনে দুঃখেও হাসি পেল। জিজ্ঞেস করলাম, তা হাকিম কি বলল?

খোয়াজ জবাব দিল, হাকিম আর বলবে কি? কেস্ আমার চুরি। দু'বছরের বেশি সাজার ব্যবস্থা আইনেই নেই, সে কি করবে? আমার কথা শুনে কেবল কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। সত্য যুগের মত এ যুগেও যদি দৃষ্টি শক্তির বলে মানুষকে ভস্ম করা যেত, তা হলে তক্ষুণি আমি পুড়ে ছারখার হয়ে যেতাম। আজ আর আপনার সাথে আমার দেখা হত না। মনে মনে

www.pathagar.com

আওড়ালাম, তা হলে আমার দুর্ভাগ্যের আর সীমা-পরিসীমা থাকত না।

জিজ্ঞেস করলাম, খোয়াজ মিয়া তোমার বাড়িঘরের কি সংবাদ?

সে উত্তর করল, বাড়িঘরের? চোরের আবার বাড়িঘর হয় নাকি? চোরের মূল বাসস্থান এই জেলখানা। পিতৃপিতামহের যে বাড়ি ছিল তা ভাই-বেরাদররা বেচে খেয়েছে। একটা কানাকড়িও আমার ভাগ্যে জোটেনি।

বললাম তুমি ঘর-সংসার করনি? স্ত্রী-পুত্র নেই?

ম্লান হেসে খোয়াজ জবাব দিল, বার দুই বিয়ে করেছিলাম স্যার। সাজা হলেই বউ অন্তর্ধান, তারপর আর বিয়ের ঝঞ্ঝাটে যাইনি। জৈবিক কারণে মেয়ে মানুষের প্রয়োজন হলে সহজলভ্য স্থানেই তাদের খুঁজে নিয়েছি। আমার মত বি-ক্লাশ চোরের স্ত্রী-পুত্র পরিবার হয় না, হলেও টেকে না।

ওর বলার ধরনে একটা দুঃখের রেশ ছিল। কোন সহানুভূতি খোয়াজ দাবী করতে পারে না। তবুও মনটা সাময়িক বেদনায় ছেয়ে গেল। চোর, জোচ্চোর সকলেরই এই পৃথিবীতে দারা-পুত্র-পরিবার নিয়ে সংসার ধর্ম পালন করার অধিকার আছে। দুঃখানুভূতিও হয়ত আনন্দানুভূতির মতই সংক্রামক। তাই খোয়াজের শেষের কথাগুলি আমাকে বিমর্ষ করে দিল।

জেলখানায় ওর কোন দফায় কমপাস জিজ্ঞেস করতেই পার্শ্বে দাঁড়ান অন্য একজন কয়েদী ব্যাঙ্গোক্তি করে উঠল, খুব সম্মানের কাজ স্যার। যেনতেন দফা নয়, একেবারে বন্দুক দফা।

খোয়াজ ওকে খেঁকিয়ে উঠল, মেলা বকিস্ না, আমি বন্দুক দফায় যাই কি কামান দফায় যাই তোর ঠাকুদার কি?

খোয়াজের চটার কারণ বুঝলাম। বন্দুক দফার সদস্যরা অন্য কয়েদীদের অচ্ছুত। অপরাধের মধ্যে গুরুচুরি আর কাজের মধ্যে বন্দুক দফার কাজই কয়েদীদের সর্বসম্মত অভিমতে নিকৃষ্টতম। গরু চোরদের মনে প্রাণে ঘৃণা করলেও তাদের সাথে ওঠা-বসা, বিড়িটা-খৈনীটা চলে। কিন্তু বন্দুক দফার সদস্যদের স্পর্শও ওরা মাড়ায় না। এমনকি তাদের স্পর্শদুষ্ট কোন জিনিসও ওরা স্পর্শ করতে চায় না। জেলখানার মধ্যে এরাই সব চাইতে অপাংতেয়।

বন্দুক দফার আর এক নাম বাবুচালি। কিন্তু এর সত্যিকার অর্থবোধক নাম হল ছাফাইয়া বা মেথর। বাবুচালি, বন্দুক দফা, ছাফাইয়া ইত্যাদি গলাভরা

www.pathagar.com

নাম আবিষ্কারের ন্যায্য কারণ রয়েছে। সরাসরি মেথরের কাজ বললে কোন কয়েদীই চট করে রাজী হবে না। জোর করে এ কাজ স্কন্ধে চাপান যাবে না, – জেল কোডে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অন্য কয়েদীরা তাদের ঘৃণা প্রদর্শনের যুক্তি দেখিয়ে বলে, ওরা যদি মেথরের কাজ করতে সম্মত না হত তাহলে কর্তৃপক্ষকে বাইরে থেকে পূর্ণ বেতন দিয়ে মেথর নিযুক্ত করতে হত। কিন্তু জেলখানায় কখনো বাইরে থেকে মেথর নিযুক্ত করতে হয়নি। এই দফায় আভ্যন্তরীণ সরবরাহের অভাব আজও কর্তৃপক্ষ অনুভব করেনি। সে কি কেবল মাসিক দুটাকা বেতন, দৈনিক আটটা বিড়ি, একটু গুড়, একদিন অন্তর অন্তর সামান্য দুধ ও মাছ-মাংসের প্রলোভনে?

কোন কোন ক্ষেত্রে এ সবের লোভ কাজ করেনি একথা বলা সম্ভব নয়। অতি দরিদ্র দু-একটি কয়েদী বিড়ি-তামাকের ব্যবস্থা করতে অপারগ হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ কাজ গ্রহণ করেছে।

তাছাড়া রয়েছে মাছ, মাংস, দুধ ও মাসে দুটি করে টাকার লোভ। এদের প্রথম যুক্তি শ্রমের হেরফের নেই। সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীকে কাজ করতেই হবে। সকল কাজই সমান মর্যাদা বহন করে। শ্রমের মর্যাদার উপর এদের নিজস্ব থিওরি রয়েছে। দ্বিতীয় যুক্তি, পেটে খেলে পিঠে সয়। ওরা বলে, জেল খাটতে এসে বাড়ি থেকে টাকা এনে নবাবী করার মধ্যে বাহাদুরী নেই। সেটা অপুরুষোচিত। ওরা কর্মী পুরুষ, কয়েদখানার অভ্যন্তরেও ওরা অর্থ উপার্জনে সক্ষম।

কিন্তু লোভ-প্রলোভনের প্রশ্নটা বড় নয়। বাবুচালিতে লোক ভর্তির ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। একাজে অভিজ্ঞ প্রবীণ কয়েদী বা ওস্তাগরদেরই প্রধান ভূমিকা পালন করতে হয়। পোষা বাজ ছাড়া বনের বাজ ধরা যায় না – একথা সর্বজনবিদিত। হেড ওয়ার্ডার ও চীফ ওয়ার্ডের টাউট এই সব দালাল শ্রেণীর ওস্তাগররা বাজ পাখীর দৃষ্টি নিয়ে নূতন শিকারের সন্ধানে ওত পেতে থাকে। সদ্য সাজাপ্রাপ্ত একজন কয়েদী কারাভ্যন্তরে পা রাখলেই ওস্তাগররা তাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করে। বন্দুক দফা, বাবুচালি প্রভৃতি গালভরা নাম, অতিরিক্ত মার্কার আশ্বাস এবং মাইনে, বিড়ি ও স্পেশাল ডায়েটের লোভ দেখিয়ে কারাবাসে অনভিজ্ঞ দু-একজন হাবাগোবা লোককে ওরা বাগিয়ে নেয়। কিন্তু মেথরদের মূল রিক্রুটটা ঘটে গমচাক্কী থেকে। সে দফার প্রাথমিক সদস্যরা ত রয়েছেই। তাছাড়া ছাফাইয়ার কাজে যোগদানে অনিচ্ছুক এমনি অনেককেও ওরা গমচাক্কীতে

www.pathagar.com

কামপাস করে দেয়। অনভ্যস্ত হস্তে বিরাট পাথরের যাঁতা ঘুরিয়ে গম পিষতে গিয়ে এদের নাভিশ্বাস বেরিয়ে পড়ে। দু-একদিনেই হাতে বড় বড় ফোস্কা পড়ে যায়। তবুও রেহাই নেই। বরাদ্দ গম পিষতেই হবে। গমচাক্কীর এই সব হতভাগ্যের সে সময়ের দুঃখ বর্ণাতীত। ফোস্কার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে যদি কেউ কাজ করতে অস্বীকার করে তাহলে তার ভাগ্যে কিছু উপরি পাওনা জুটে যায়। কম্বল ধোলাই, বাঁশডলা ইত্যাদি অমোঘ ঔষধ সেবন করিয়ে তাদের গমচাক্কীতেই ফেরত পাঠান হয়। অশ্রুজলে যখন ওরা দুচোখে কিছু দেখতে পায় না, তখনই বন্দুক দফার ধূর্ত ওস্তাগররা এসে টোপ ফেলে। গমচাক্কীর সুবৃহৎ চাকা দুটির মধ্যে নিজেদেরকে নিঃশেষে পিষে ফেলে অসহ্য যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি প্রত্যাশী হতভাগ্যের দল সহজেই সে টোপ গিলে ফেলে। তারপর কিছুদিন আরাম আয়েসে রেখে ওদের উপস্থিত করা হয় জেল সুপারের দরবারে। সুপার সুস্পষ্ট ভাবে ওদের বুঝিয়ে দেন কি কাজ ওদের করতে হবে। তারপর আবার তিনি ওদের মত জিজ্ঞাসা করেন। একবার অসম্মতি জানালেও তাকে আর বন্দুক দফায় নিয়োগ করা হয় না, জেল কোডে এ সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। শেষ মুহূর্তে কেউ কেউ সুপারের ঘর থেকে ফিরেও আসে কিন্তু অধিকাংশই দফায় ভর্তি হয়ে যায়। বেতন আর ডায়েট-এর সঙ্গে সহযোগী বন্ধুদের অকৃত্রিম ঘৃণা আর উপহাসও সেদিন থেকে ওদের নৈমিত্তিক বরাদ্দ হয়ে দাঁড়ায়।

বেশ অর্থশালী প্রতিষ্ঠাবান দু-একজন তৃতীয় শ্রেণরি কয়েদীকেও ওরা এ দফায় ঢুকিয়ে ফেলে। তারপর বহু অর্থ ব্যয়ে তাকে নিষ্কৃতি পেতে হয়। চৌষট্টি সালে এক দুই খাতায় থাকাকালীন একজন শাসাল বি, ডি, মেম্বারকে আমাদের ছাফাইয়া রূপে পেয়েছিলাম। নগদ নারায়ণের কৃপায় অচিরেই সে ছাফাইয়ার দফা থেকে নেমে যেতে সমর্থ হয়।

খোয়াজকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কেন এ কাজ করতে গেলে? জোর করে ত এ দফায় কামপাস করা যায় না। খোয়াজ উত্তর করল, কোন লোভের বশবর্তী হয়ে আমি ছাফাইয়ার কাজ নেইনি। গমচাক্কীর দুঃসহ যাতনা সহ্য করতে না পেরেই বাধ্য হয়ে এ কাজ নিয়েছিলাম। জীবনের প্রথম কারাবাসে গমচাক্কীতে নিয়ে আমাকে যে কষ্ট দেওয়া হয়েছে সে কথা স্মরণ হলে আজও আমার দুটি হাতের তালু ব্যথায় টনটন করে ওঠে। তারপর যতবার এসেছি ছাফাইয়ার কাজ ইচ্ছে করেই নিয়েছি। চোরের প্রাপ্য মনুষের নিবিড় ঘৃণাই চিরদিন পেয়ে এসেছি। আমার আবার লাজ লজ্জা কি? তাছাড়া আজ যদি

www.pathagar.com

ছাফাইয়ার কাজ না করতাম, অতিরিক্ত ভাত ডাল কি দিয়ে খরিদ করতাম? নগদ কড়ি না ফেললে এক কাঠাত দূরের কথা এক মুষ্টি ভাতও কেউ আমাকে দিত না।

ভেবে দেখলাম, খোয়াজ ঠিকই বলেছে। অন্তত ওর ক্ষেত্রে বন্দুক দফার কাজই সমীচীন হয়েছে। বন্দুক দফার গুলি গোলা পাচারের চাকুরীটি না থাকলে ক্রমাগত অর্ধাহারেই হয়ত খোয়াজ আলীকে ইহলীলা সংবরণ করতে হত।

মহিউদ্দিনের বৃদ্ধ পিতা গুরুতর রোগে শয্যাশায়ী। বহুদিন থেকেই দৃষ্টি স্বল্পতায় ভুগছিলেন। অতি স্নেহের জ্যেষ্ঠ সন্তানের গ্রেপ্তারের পর থেকে তাঁর অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। নীরব ক্রন্দনের ফলেই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক আস্তে আস্তে তাঁর উভয় চোখেই অন্ধত্ব নেমে আসে। ডাক্তাররা চোখে অপারেশন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাকে অনেক কষ্টে সম্মত করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কিছুতেই আসতে চান না, বার বার শুধু বলেন, আমার খোকা ফিরে আসুক তারপরে সে যা ভাল মনে করে তাই হবে।

বৃদ্ধবয়সে উপযুক্ত পুত্রের প্রতি নির্ভরতা অত্যন্ত স্বাভাবিক, কিন্তু বৃদ্ধ পিতার রোগ শয্যার কাতর ফরিয়াদও সরকারের সহানুভূতি আকর্ষণে ব্যর্থ হয়। পিতার এ অবস্থার মধ্যেই মহিউদ্দিনের দ্বিতীয় পুত্রটি গুরুতর রোগাক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে। তাকে নিয়েও যমে-মানুষে টানাটানি চলতে থাকে।

কারাগারের অভ্যন্তরে আটক অসহায় বন্দীর নিকট যুগপৎ পিতা ও সন্তানের জীবন-মরণ রোগের সংবাদ যখন পৌছে, তখন তার যে মানসিক অবস্থা হয় তা শুধু হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা যায়, ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

শুনলাম বাইরে থেকে মহিউদ্দিনের মুক্তির জন্য সরকারের প্রতি অত্যন্ত চাপ প্রয়োগ হচেছ এবং কোন কোন মহল তার মুক্তির প্রশ্নে আশাবাদী। দুরপনেয় মানসিক অশান্তির মধ্যেও ব্যক্তিত্বশীল রাজনৈতিক কর্মী মহিউদ্দিন এতটুকু ভারসাম্য হারায়নি। সরকারের নিকট নতিস্বীকার করতে সে প্রস্তুত নয়। ওরা ভেবেছিল দুঃসময়ের সুযোগ নিয়ে তাকে পর্যদস্ত করতে সক্ষম হবে কিন্তু দৃঢ়

www.pathagar.com

মনোবলের অধিকারী মহিউদ্দিন ওদের প্রত্যেকটি সন্ধি প্রস্তাব বিনা দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করেছে।

রোগাক্রান্ত পিতা ও পুত্রের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হওয়ার জন্য প্যারোলের প্রার্থনা করা হল। সদাশয় সরকার সে প্রার্থনাও বিবেচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন না। এতদসত্ত্বেও বাইরে জোর গুজব রটে গেল, সরকার মহিউদ্দিনকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সে কথা ভিতরে বসে আমরাও শুনলাম এবং বিশ্বাস করার দিকেই সকলের প্রবণতা লক্ষিত হল। কারণও ছিল, একদিকে বাইরের চাপ এবং অন্যদিকে ঘনঘন সাদা পুলিশের আগমন।

এমনি অবস্থায় মহিউদ্দিন একদিন ইন্টারভিউতে গেল। সেখানে যেতেই আমাদের ব্রাঞ্চের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি জেলর 'ছর্ব্বনাছ' সাহেব মহিউদ্দিনকে আনন্দের সঙ্গে অভিনন্দন জানালেন। পশ্চিম বাংলা থেকে আগত এই ভদ্রলোক ছ উচ্চারণে সর্বনাশ শব্দটির বহুল ব্যবহার করেন বলে তার প্রতি অপেক্ষাকৃত অসন্তুষ্ট বন্দীরা নিজেদের মধ্যে তাকে 'ছর্ব্বনাছ' সাহেব বলে সম্বেধন করে থাকে। তিনি সুসংবাদ পরিবেশন করলেন, মহিউদ্দিনের মুক্তির আদেশ এসে গেছে। শীঘ্র সাক্ষাৎকারীদের বিদায় দিয়ে দশ সেলে এসে তৈরি হওয়ার জন্য তিনি অনুরোধ জানালেন।

পারিবারিক সংকটের এই সন্ধিক্ষণে মুক্তির বার্তা শুনে মহিউদ্দিন আকাশের চাঁদ হাতে পেল। দৌড়ে গিয়ে সাক্ষাৎকারীদের শুভ সংবাদ দিল। আত্মীয়-পরিজনেরা এক মিনিট সময় নষ্ট না করে ছুটলেন সকলকে তার মুক্তির খবর দেওয়ার জন্য। একদল চলে গেল হাসপাতালে তার শয্যাগত পিতাকে শুভসংবাদ দেওয়ার জন্য। অন্যদল গাড়ি নিয়ে ছুটল নারায়ণগঞ্জে খবর পৌঁছানোর জন্য। নারায়ণগঞ্জ শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, নিজ এলকার বি, ডি, মেম্বার এবং শহরের একজন প্রতিপত্তিশালী নাগরিক মহিউদ্দিন।

তার মুক্তির সংবাদ মুহূর্তে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল, বন্ধু বান্ধবরা, ভক্ত ও অনুসারীরা ব্যান্ডপার্টি, বাজি, পটকা সহযোগে তাকে সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য নারায়ণগঞ্জের প্রবেশদ্বার চাষাড়ায় জমায়েত হল।

সাক্ষাৎপ্রার্থীদের বিদায় দিয়ে মহিউদ্দিনও দৌড়ে দশ সেলে এসে উপস্থিত। দূর থেকেই চীৎকার করে ঘোষণা করল, আমার রিলিজ অর্ডার এসে

www.pathagar.com

গিয়েছে। আমরা আনন্দে হৈচৈ করে উঠলাম। মহিউদ্দিনকে নিয়ে কোলাকুলি, হুটোপুটি শুরু হয়ে গেল। পরম আনন্দানুভূতির মধ্যে আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। তার মুক্তির নিদারুণ প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সকলেই একমত ছিলেন। দশ সেলের প্রায়োরিটি লিস্টে মহিউদ্দিনের নাম শীর্ষে স্থান পেয়েছিল।

অত্যান্ত অল্প সময়ের মধ্যে আমরা হাতে হাতে মহিউদ্দিনের জিনিসপত্র গোছগাছ করে দিলাম। জমাদার এসে তার সব লটবহর বুঝে নিল। অবস্থাপন্ন ঘরের সন্তান মহিউদ্দিন অধিকাংশ সময় উচ্চ মূল্যের সিগারেট সেবন করত। বিদায়ের আনন্দে স্টকের সমস্ত সিগারেট বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ করে দিল।

বিদায় মুহূর্তে মহিউদ্দিন চোখের জল আটকে রাখতে পারল না। আমাদের আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। সবাই মিলে শকুন্তলার গেট পর্যন্ত তাকে পৌঁছে দিলাম। রুমালে চোখ মুছতে মুছতে মহিউদ্দিন এগিয়ে গেল, পশ্চাতে লোহার গেটের সুবৃহৎ পাল্লা দুটি আমাদেরকে আড়াল করে দাঁড়াল।

বিমর্ষ চিত্তে আমরা সেলের সম্মুখে এসে বসলাম। হারাধনের দশটি ছেলের একটির মুক্তিতে আমাদের প্রতিদিনের মুখর সান্ধ্য আসর সেদিন প্রায় মৌনতায় পর্যবসতি হল।

মিনিট দশেক কেটেছে, আমরা স্তিমিত আসরে ভূতগ্রস্তের মত বসে। আমরা হঠাৎ দেখতে পেলাম মহিউদ্দিন অধোবদনে ফিরে আসছে। আমরা অবাক হয়ে এগিয়ে যেতেই সে করুণ হেসে ব্যাখ্যা করল, আমার মুক্তির আদেশ আসেনি। ডেপুটি সাহেব ভুল করে রিলিজের স্লিপ ইস্যু করেছেন।

আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। দীর্ঘদিন ধরে বন্দী একজন মানুষের মুক্তির প্রশ্নে এত বড় ভুল হতে পারে চিন্তাই করতে পারলাম না। আকস্মিক আঘাতে আমরা বাকহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। মহিউদ্দিনের পিছু পিছু জমাদারও জিনিসপত্রগুলো নিয়ে উপস্থিত হল। জমাদারকে দেখে সকলের রক্তে আগুন ধরে গেল। তাকে এই মারে ত সেই মারে। শ্রান্ত কণ্ঠে মহিউদ্দিন সকলকে থামিয়ে দিল। বলল, জমাদারের কোন হাত নেই, ভুল করেছেন ডেপুটি, সে ভ্রান্তির প্রায়শ্চিত্ত আমাদের করতে হচ্ছে। একটু থেমে নিজের মনেই বলে উঠল, নিজের কথা ভাবছি না, ভাবছি হাসপাতালে শয্যাশায়ী রুগ্ন

www.pathagar.com

পিতার কথা আর ভাবছি ছেলেটার কথা। আমার মুক্তির সংবাদে উল্লসিত হয়ে তারা রোগ যন্ত্রণা ভুলে যাবে, কিন্তু যখন তাদের কাছে প্রকৃত খবর পৌঁছবে তখন তারা কি সে আঘাত সামলে উঠতে পারবে?

বলতে বলতে, মহিউদ্দিনের চোখ ছলছল করে উঠল। আমাদের প্রতিনিধি রফিক ভাই ডেপুটিকে অবিলম্বে দশ সেলে আসার জন্য স্লিপ পাঠালেন। খবর পেয়ে আমাদের এখানে আসা দূরের কথা ডেপুটি সাহেব অফিস পরিত্যাগ করে সেদিনের মত বাসায় চলে গেলেন। তার সামান্য ভুলে কত মানুষকে কি গভীর দুঃখ ভোগ করতে হবে, বিভিন্ন স্থানে ভুলের কি মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ঘটবে তা অনুধাবন করেই হয়ত লজ্জাবশত আত্মগোপন করেছেন।

রুগ্ন পিতা, মৃত্যু শয্যায় শায়িত পুত্র, পরিবার-পরিজন ও সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য সমাগত অপেক্ষমান জনতার কথা চিন্তা করে মহিউদ্দিনের মানসিক অবস্থা তখন কোন স্তরে, তা সহজেই অনুমেয়। মুক্তির আদেশ পেয়ে গেট থেকে ফিরে আসার মধ্যে যে অসহনীয় দুঃখ এবং স্বপ্ন ভঙ্গের হতাশা জড়িয়ে থাকে, তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ উপলব্ধি করতে পারে না। আমার জীবনে এমনি একবার ঘটেছিল। মহিউদ্দিনের মানসিক যাতনা বিলক্ষণ অনুধাবন করতে পারি। এতখানি আঘাতেও সে মুষড়ে পড়েনি। কিছুক্ষণ উদাস চোখে নীরবে বসে থেকে ঘরে ঢুকল। ভগ্নহৃদয়ে নুতন করে পুরান সংসার গুছাবার কাজে হাত দিল।

সে রাতে মহিউদ্দিনকে বন্ধুদের নিকট থেকে সিগারেট চেয়ে খেতে হল। পরদিন 'ছর্ব্বনাছ' সাহেব এসে তার ভুলের জন্য ক্ষমা চাইলেন। বার বার দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, যদিও আমার কৈফিয়ং দেওয়ার ধৃষ্টতা নেই, তবু বলছি পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চই আমাকে বিভ্রান্ত করেছে। টেলিফোন করে তারা জানায় মহিউদ্দিন সাহেবের রিলিজ অর্ডার নিয়ে আসছে। সব সময় তাদের টেলিফোন বার্তায় অভ্যস্ত আমিও সঙ্গে সঙ্গে রিলিজের ব্যবস্থা করে ফেলি। কিন্তু আই, বি-র লোক যখন এসে পৌঁছল, তখন দেখলাম মুক্তির নির্দেশ নয়, তারা নিয়ে এসেছে মহিউদ্দিনের আরও তিনমাস মেয়াদের আদেশ। গতকাল সে অর্ডার সার্ভ করতে পারিনি কিন্তু আজ করতে হবে।

সরকারী কর্মচারীদের এ হেন অমার্জনীয় অপরাধকেও আমাদের সহ্য করে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এদের অক্ষমতা ও অযোগ্যতা নিয়ে আলোচনা

www.pathagar.com

করতেও আমাদের প্রবৃত্তি হল না। মহিউদ্দিন নীরবে নূতন আটকাদেশে সই করে দিল। ছর্ব্বনাছ সহেব মহিউদ্দিনের সর্বনাশ ঘটিয়ে তার নামকরণের যৌক্তিকতা আর একবার সপ্রমাণ করলেন।

বিকালে উর্দ্দু রোডের মসজিদের মিনারে উঠে নারায়ণগঞ্জের কর্মীরা জানিয়ে গেল রাত বারটা পর্যন্ত এক বিরাট জনতা মহিউদ্দিনকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য চাষাড়ায় অপেক্ষা করছিল। বারটার সময় খবর পৌছল মুক্তি নয়, নূতন আটকাদেশ। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সম্বর্ধনা-কারীরা একে-একে বিদায় নিল।

হাসপাতালে মহিউদ্দিনের বাবা সব কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে যান, একটি কথাও উচ্চারণ করেননি। দুটি অন্ধ চোখ বেয়ে শুধু জলের ধারা ঝরতে থাকে। অনেকক্ষন পর বৃদ্ধ পিতা তার অন্ধ চোখ দুটি উর্ধ্বমুখে তুলে ধরে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠেন, আল্লাহ এর বিচার করবে।

নারায়ণগঞ্জের বাসায় মহিউদ্দিনের পীড়িত পুত্র তার মাকে অতিষ্ট করে তুলছিল, মা, আব্বা কখন আসবে? এত দেরী করছে কেন? আব্বাটা ভীষণ পাজী, তাড়াতাড়ি আসছে না। আব্বা আমার জন্য কি নিয়ে আসবে মা?

রুগ্ন সন্তানের শত প্রশ্নে জর্জরিতা মা অনেক দিন পর আজ হাসিমুখে জবাব দেয়, এক্ষুণি তোমার আব্বা আসবেন। চুপ করে লক্ষী ছেলের মত শুয়ে থাকলে তোমার আব্বা তোমাকে খুব ভাল বলবেন, খুব আদর করবেন।

ছেলে কান পেতে একটা গাড়ি আসার আওয়াজ শুনে দুর্বল হাতটি উঠিয়ে বলে ওঠে, মা, ঐ আব্বা এসেছে গাড়ি করে। আমাকে একটু বসিয়ে দাও মা, আমি শুয়ে থাকলে আব্বা বকবে।

পুত্রের আশংকাজনক অসুস্থতার মধ্যে স্বামীর উপস্থিতির সান্ত্বনায় ভীরু নারীমন মনোবল ফিরে পাচ্ছিল। এমনি সময় খবর পৌছল, মুক্তির আদেশ নয় – নূতন আটকাদেশ। স্ত্রীর স্বপ্নসৌধ ভেঙ্গে গেল। পীড়িত শিশুর শত আবদার আর কাকলিভরা কণ্ঠও স্তিমিত হয়ে এল। অবুঝ সন্তান পিতার উপর অভিমান করে বলল, আব্বা এল না? আমি আর কোন দিন আব্বার কোলে যাব না। আমি এমন জায়গায় লুকাব, আব্বা কিছুতেই আমাকে খুঁজে পাবে না।

অভিমানী অবোধ শিশুর প্রতিটি কথা যে সত্যে পরিণত হবে, সেদিন কেউ তা বুঝতে পারেনি। নিষ্পাপ শিশুদেবতার কণ্ঠ-নিঃসৃত প্রতিটি বাক্য স্রষ্টার

www.pathagar.com

দরবারে অনুমোদিত হয়ে গেল। কয়েকদিন পরেই মহিউদ্দিন তার জীবনের চরমতম আঘাত পেল। তার বক্ষের একটি পাঁজর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। স্বল্পায়ু জীবনের সকল হাসি খেলা সাঙ্গ করে মহিউদ্দিনের ঘরের আনন্দ প্রদীপ চিরদিনের জন্য নির্বাপিত হয়ে গেল। দশ সেলে বসেই মহিউদ্দিন প্রাণপ্রতিম পুত্রের মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাত হল। অসহায় বন্দী পিতার মর্মস্পর্শী শোকার্তনাদে দশ সেলের বাতাসও ভারী হয়ে উঠেছিল। সমবেদনা জানানোর ভাষা হারিয়ে গিয়েছিল। গভীর শোকাচ্ছন্নতার দৃশ্য আমাদের বেশীক্ষন সহ্য করতে হয়নি। একটু পরেই মহিউদ্দিনের দু-ঘণ্টার প্যারোলের অনুমতি এসে পৌঁছল-পুত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদানের জন্য।

মহিউদ্দিন মাথা নেড়ে বলল, আমি যাব না, গিয়ে কি দেখব? আমি যেতে পারব না। সবাই মিলে অনেক বুঝিয়ে তাকে সম্মত করানো গেল। শেষবারের মত পুত্রের মুখটি ত দেখতে পাবে!

পুলিশ প্রহরায় মহিউদ্দিন নারায়ণগঞ্জের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হল। ওকে দেখেই ওর স্ত্রী চীৎকার করে উঠল, ওগো এখন আর কি দেখতে এসেছ। বাছা আমার রাগ করে চলে গেছে। বলতে বলতেই মেঝের উপর মূর্ছিতা হয়ে পড়ে গেল।

সাদা চাদরে ঢাকা ছোট দেহটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল মহিউদ্দিন। কণ্ঠে ভাষা নেই, চোখের জল পূর্বেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। সেখানে আগুন ছাড়া আর কিছু নেই। মৃতের দেহ থেকে চাদরটি সরিয়ে নিতেই একটি শুভ্র শিশু-মুখ বেরিয়ে এল। ঝরা শিউলির মত পড়ে আছে। চোখ দুটি মুদ্রিত। পিতার উপর অভিমান করেই সে চোখ বন্ধ করেছে, আর খুলবে না। সে তার কথা রেখেছে। দুষ্ট পিতা সময় মত আসেনি যে! তাই সে তাকে দেখা দেবে না। চোখ বুজে সে পালিয়েছে। অভিমান তার কম নয়। এমন জগতে সে পালিয়েছে, যেখান থেকে শত চেষ্টা করেও হতভাগ্য পিতা তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না।

পিতার কণ্ঠ জড়িয়ে ধরার জন্য চির-চঞ্চল দুটি ক্ষুদ্র হাত আর গণ্ডে চুম্বন করার জন্য ব্যাকুল ওষ্ঠ দুটির ছোট পাপড়ির দিকে তাকিয়ে থেকে মহিউদ্দিনের অগ্নিঝরা চোখের দৃষ্টি অচিরেই অশ্রু প্লাবনে ছেয়ে গেল। দুটি চোখ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা তপ্ত অশ্রু শিশুর মুখ ও কপোলে বৃষ্টি ধারার মত ঝরে পড়তে লাগল। দীর্ঘদিন পরে অশুধারার মধ্যে পিতা পুত্রকে শেষ

www.pathagar.com

আশীর্বাণী রেখে এল।

খদ্দরের ধূতি বা সেলাই ছাড়া লুঙ্গী, খদ্দরের নিমা এবং খন্দরের জামা ও চাদর শোভিত যে ছোটখাট মানুষটিকে সকাল বিকাল সমস্ত মেন্টাল এলাকায় পায়চারী করতে দেখা যায়, তাকে ঢাকা জেলের সর্বাপেক্ষা কুলীন রাজবন্দী বলা যেতে পারে। বন্দীত্বের কৌলীন্যের কথা চারুদা কৌতুকছলে নিজেই বলেন : তোমরা হচ্ছ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের বন্দী, তোমাদের ধরা বা ছাড়ার প্রশ্ন পূর্বে পাক সরকারের এখতিয়ারভুক্ত। পকক্ষান্তরে আমি কেন্দ্রীয় সরকারের বন্দী, আমার আটকাদেশ পাকিস্তান সরকারের আওতাধীন।

আমরাও হেসে জবাব দেই, দাদা, আপনি হিন্দু ধর্মের বর্ণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতম গোত্রভুক্ত। একথা জানতে পেরেই খোদ কেন্দ্রীয় সরকার আপনার দায়িত্ব নিয়েছে।

চারুদা হেসে বলেন, আমি কি তোমাদের মত চুনোপুঁটি যে প্রাদেশিক সরকার আমার নিয়ন্তা হবে? আমি ভীম, আমি ভাসমান মাইন। তাই মহাশক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার আমার হেফাজতকারী।

চারুদা বা শ্রীচারু চন্দ্র চৌধুরীকে পাকিস্তান নিরাপত্তা আইন বলে ১৯৬৩ থেকে আটক করে রাখা হয়েছে। পাকিস্তান নিরাপত্তা আইন বহাল থাকার পরও পূর্ব পাকিস্তান নিরাপত্তা আইন নামে আর একটি নিবর্তনমূলক আইন এদেশে চালু রয়েছে। একই দেশে একই সংগে দুটি নিরাপত্তা আইনের প্রয়োগ বাহুল্য হলেও তা রয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনে কিছু লোক আটক আছেন। আবার একই সঙ্গে পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনেও কেউ কেউ বন্দী আছেন। চারু দাকে ১৯৫৫ সালে পূর্ব পকিস্তান নিরাপত্তা আইনে আটক করে কুমিল্লা জেলে রাখা হয়েছিল। এবার উভয়তঃ প্রমোশন দিয়ে পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনে তাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অতিথি বলে তাকে অন্যান্য বন্দীদের থেকে পৃথক করে সাতাশ সেলের একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে স্থান দেওয়া হয়েছে।

আমরা বলি, চারু দা আপনি ত ভাগ্যবান ব্যক্তি। প্রতি ছয় মাস অন্তর

www.pathagar.com

হাওয়াই জাহাজে চড়ে ঢাকা-করাচী করতে পারেন সিকিউরিটি বোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার জন্য। সরকারের পয়সায় এমনি আকাশ ভ্রমণের সুযোগ ভাগ্যবান ব্যক্তি ছাড়া আর কে পেতে পারে।

চারু বাবু তার স্বভাবসুলভ হাসিমাখা মুখে উত্তর দেন, হ্যাঁ ছ মাস অন্তর পশ্চিম পাকিস্তান সফরে যেতে পারি ঠিকই কিন্তু একবার গিয়েই আমি ক্ষান্ত দিয়েছি। সরকারকে বলে দিয়েছি, আমার কাগজপত্র বিবেচনা করেই যেন তারা সিদ্ধান্তে পৌঁছেন। দরিদ্র দেশের দরিদ্রতম মানুষের রক্তজলকরা অর্থ আমার বার বার যাওয়া আসায় ব্যয় করে কোন লাভ নেই। জীবনে মানুষের উপকার করতে পারব কি না জানি না, তাদের পয়সা না-হক খরচ করার আমার অধিকার নেই।

চারু দার কথা শুনে আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। কণ্ঠে কোন প্রতি উত্তর জোগায় না। নিজেদের সহস্র স্বার্থ আর সুখের চিন্তায় নিয়ত নিমগ্ন আমাদের নিকট তার সহজ সরল বক্তব্যই অত্যাশ্চর্য হয়ে দেখা দেয়।

নির্লোভ, নিরহংকার, নিষ্কাম শুদ্ধ চরিত্রের অধিকারী, সৌম্য ও আনন্দের প্রতিমূর্তি চারু বাবুকে সে যুগের আশ্রম-গুরুদের সঙ্গেই সম্যক তুলনা করা যায়।

দীর্ঘ কর্মবহুল জীবনে তিনি পাক-ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন মনীষী, দেশনায়ক ও মহামানবের সংস্পর্শে এসেছেন। মহাত্মা গান্ধী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, সুভাষ চন্দ্র বসু, শেরে বাঙলা এ, কে, ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আচার্য বিনোবাজীর, প্রফুল্ল চন্দ্র রায় প্রমুখ মানব-সেবী দেশনায়কদের সঙ্গে তার ছিল ঘনিষ্ঠ সহযোগ। এই সব প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের সাহচর্যে এসে চারু বাবুর চরিত্রে দুষ্প্রাপ্য গুণাবলীর সমাবেশ ঘটে।

যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতৃবর্গের সংস্পর্শে আসেন। ১৯২১ সালে প্রথম কারাবরণকালে আলীপুর সেন্ট্রাল জেলেই বিভিন্ন জননায়কের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় হয়। সুভাষ চন্দ্র বসু, দেশ-বন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের পুত্র চিররঞ্জন দাস, মহাত্মা গান্ধীর পুত্র হীরালাল প্রভৃতির সঙ্গে সে সময় তার সখ্যতা জন্মে।

রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে দেশমাতৃকার স্বাধীনতার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে

www.pathagar.com

পড়লেও শেষ পর্যন্ত তাকে রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার ক্ষেত্র থেকে বিদায় নিয়ে মহাত্মা গান্ধীর খাদি আন্দোলনের সাংগঠনিক কার্যে আত্মনিয়োগ করতে হয়। মহাত্মার নির্দেশেই তিনি রাজনীতির আবর্ত থেকে সরে গিয়ে খাদি প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই শুভক্ষণ থেকেই গ্রাম সংগঠন, আশ্রম, খাদি আন্দোলন আর চরকা তার সারাজীবনের ধ্যান জ্ঞানে রূপলাভ করে। গান্ধী ও বিনোবাজীর ভাবশিষ্য চারু চৌধুরী সেই হতে আজ পর্যন্ত ধর্মে-কর্মে ও চিন্তায় তাদের আদর্শ ও কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করার জন্য আজীবন সাধনা করে যাচ্ছেন।

গান্ধীজীর পরামর্শক্রমে তিনি কিছুদিন মহাত্মা প্রতিষ্ঠিত আহমেদাবাদের সবরমতি আশ্রমে কাল যাপন করেন। সে সময় গান্ধীজীর সঙ্গে তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন এবং মহাত্মার অনুপ্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন আশ্রমের কার্যপদ্ধতি সাগ্রহে পর্যবেক্ষণ করেন। স্বল্পকাল পরই তাকে কলকাতার উপকণ্ঠে প্রতিষ্ঠিত সোদপুর আশ্রমের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ১৯২২ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তিনি এই আশ্রমের কর্মাধ্যক্ষ রূপে কাজ করেন।

দেশবিভাগের অব্যবহিত পরে বিহার ও নোয়াখালীর বুকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার যে দাবানল জ্বলে উঠেছিল, তাকে নির্বাপিত করার মানসে মহাত্মা গান্ধী এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দী শান্তি মিশন নিয়ে বিধ্বস্ত এলাকা সফরে বের হন, তাদের নোয়াখালী সফরে চারু বাবুও গান্ধীজীর সঙ্গী হন। দাঙ্গা-হাঙ্গামা বন্ধ হয়ে গেলে গান্ধীজীর বিদায় মুহূর্তে চারু বাবু নিবেদন করলেন, বাপুজী, পূর্ব পাকিস্তান আমার জন্মভূমি; আমি কি সোদপুরে ফিরে যাব না, এখানেই থাকব? আমার প্রতি কি নির্দেশ?

মহাত্মা একটি মুহূর্তও চিন্তা না করে জবাব দিলেন, বেটা, তুমি এখানেই থেকে যাও। আশ্রম তৈরি করে এখানকার দরিদ্র মানুষের মধ্যে কাজ কর। সব দেশের মানুষই এক আর মানব সেবাই নারায়ণের সেবা। তুমি মানুষের মঙ্গলার্থে কাজ করে যাও। তুমি হিন্দু নও, মুসলমান নও, তুমি মানুষ।

খদ্দর ব্যবহারে উৎসাহিত করা, নিজ হস্তে সূতা কেটে কাপড় তৈরি করা, গ্রামের বেকার কিশোর ও যুবকদের বিভিন্ন কুটির শিল্পে নিয়োগ করে গ্রামীণ শ্রমকে কাজে লাগান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং সর্বোপরি গ্রামের মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলে এক আদর্শ ও সুখী গ্রাম জীবনের

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাই তার আশ্রমের কার্যক্রম। গ্রামে গ্রামে তিনি এবং তার আশ্রম কর্মীরা গ্রাম সংগঠনের কাজে নেমে পড়েন। গ্রামবাসীদের মধ্যে চরকা বিলিয়ে দেন, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদেরকে স্বাবলম্বী হওয়ার সাধনায় সক্রিয় সাহায্য দান করেন। এমনি করেই ব্রহ্মচারী সমাজ সেবক চারু বাবুর জীবন বার্ধক্যের সীমায় এসে উপস্থিত হয়। দরিদ্র গ্রামবাসীদের সেবাকার্যে নিবেদিত আশ্রমের কার্যক্রমের প্রতি সরকারের সহযোগিতা এবং সক্রিয় সাহায্যই তিনি আশা করেছিরেন। কিন্তু পরিবর্তে রাজনীতির সঙ্গে বিন্দুমাত্র সম্পর্কহীন এই আশ্রম ও তার কর্মীদের উপর বার বার সরকারের কোপদৃষ্টি নিপতিত হয়। ফলে ১৯৫৪ সালে চারু বাবু ও তার সহকর্মীদের গ্রেফতার করে আশ্রমে তালাবদ্ধ করে দেওয়া হয়। এবার আবার তাকে গ্রেফতার করে আশ্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

সামরিক আইন জারী হলে কতিপয় অত্যুৎসাহী সরকারী কর্মচারীর হস্তে তিনি এবং তার আশ্রম আর একবার হয়রান হওয়ার ব্যবস্থা প্রায় সম্পন্ন হয়ে এসেছিল, শুধু চারু বাবুর সাহস এবং অনমনীয় মনোভাবের ফলে সে যাত্রা রক্ষা পায়। পূর্বাহ্নে আঁচ পেয়ে চারু বাবু সোজা ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এসে প্রাদেশিক সামরিক শাসনকর্তা জেনারেল ওমরাও খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আশ্রমের কার্যক্রম ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে তিনি জেনারেলকে অনুরোধ করেন অহেতুক সরকারী হস্তক্ষেপ থেকে আশ্রম রক্ষা করার জন্য। সর্বদেহে খদ্দর পরিহিত, পরার্থে আত্মনিবেদিত ক্ষীণদেহী ব্রাহ্মণের সৎসাহস এবং চারিত্রিক বলিষ্ঠতার পরিচয় পেয়ে ওমরাও খান খুশী হন। তার সময়োচিত হস্তক্ষেপের ফলে সে যাত্রায় চারু বাবুর আশ্রম রক্ষা পায় এবং তিনিও লৌহকপাটের বহির্দেশে থাকার সুযোগ লাভ করেন।

চারু দা আক্ষেপ করে বলেন, কত সরকার এল, কত সরকার গেল। কেউ বাংলার গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের গোড়ায় হস্তক্ষেপ করল না। মুখে পল্লী উন্নয়ন ও গ্রামীণ অর্থনীতির সুষ্ঠু রূপায়নের কথা বললেও কর্মক্ষেত্রে তারা কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে এল না। যে দেশের শতকরা নব্বই জন অধিবাসী গ্রামে বাস করে সে দেশে সুপরিকল্পিত গ্রাম সংগঠন গড়ে না তুললে, গ্রামীণ শ্রমের অপব্যয় রোধ করে তাকে সত্যিকারের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে না পারলে, দরিদ্র কৃষকদের অর্থনৈতিক কাঠামো জোরদার করতে না পারল এবং তাদের সন্তান-সন্ততির স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সুব্যবস্থা না হলে, তাকে আর যাই বলা যাক, উন্নয়নকামী প্রগতিশীল দেশ বলা যেতে

www.pathagar.com

পারে না। দুঃখের বিষয় এ ব্যাপারে সরকারী কর্তৃপক্ষের দরবারে বেসরকারী প্রচেষ্টায় প্রণীত কোন পরিকল্পনা পেশ হলে, তা অনাদার অবহেলায় দূরে সরিয়ে রাখা হয়।

কিছুক্ষণ থেমে চারু দা পুনরায় বললেন, অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই তা বলা চলে না। জেনারেল আজম খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর থাকাকালীন আমাদের আশ্রমের ব্যাপারে বেশ উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। আশ্রমের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম অবহিত হয়ে তিনি আমাদেরকে গ্রাম সংগঠন, গ্রামীণ কুটির শিল্প প্রভৃতির উপর স্কীম প্রণয়ন করে তাঁর নিকট পেশ করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। বিভিন্ন আশ্রমের কাজে লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু পরিকল্পনা তৈরি করে তাঁর নিকট আমরা পাঠিয়েছিলাম। হয়তো সে সব তেমন কিছু ছিল না। কেননা আমাদের অভিজ্ঞতাইবা কতটুকু। কিন্তু সে সব বিবেচিত হওয়ার পূর্বেই তিনি এখানকার কার্যভার পরিত্যাগ করে বিদায় নিয়ে চলে যান। সরকারী দফতরের পর্বত-প্রমাণ নথিপত্রের মধ্যে আমাদের অপরিপক্ব হস্তের প্রণীত সে সব পরিকল্পনার খসড়াগুলোও চিরকালের জন্য চাপা পড়ে যায়।

চারু দার কথা শুনতেই আমাদের বেশি ভাল লাগে। বিতর্ক করি না। তার অপরিসীম প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্লেষিত প্রতিটি কথাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি, কয়েদখানার রুক্ষ পরিবেশকে তার আশ্রমের আবহাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে প্রয়াস পাই। প্রায়ই বলেন, এই শকুন্তলাটাই একটা আশ্রম। একদিকে বন্দীদের ব্যারাক, পার্শ্বে কয়েকশত কিশোরের আস্তানা – অনেকটা আশ্রম স্কুলের মত। তেমনি হৈ চৈ, চীৎকার আর কলকাকলি-মুখরিত, অন্য প্রান্তে জেলখানার সুবৃহৎ গোশালা। আশ্রমেও গো দেবতার লালন পালনের সুবন্দোবস্ত রয়েছে। এছাড়া এখানে রয়েছে শাক-সব্জীর ক্ষেত আর ফুলের বাগান। আশ্রমে এ দুটি জিনিসের অপ্রতুলতা কোনদিন ঘটে না। আশ্রমের ছেলেমেয়েরাই স্বহস্তে ক্ষেত, বাগান করে থাকে।

তাকে বলি, তা হলে এখানটায় থাকতে আপনার অসুবিধা কি? শীঘ্র মুক্তি নিয়ে আর হবে কি? সরকারের তৈরি এই আশ্রমেই কিছুকাল অবস্থান করুন। চারু দা মুচকি হেসে জবাব দেন, বাবুই পাখীর সে উক্তি মনে নেই? নিজ হাতে পড়া মোর কাঁচা ঘর খাসা।

জেলখানার সময় তার রুটিন বাঁধা। সকাল-বিকাল দু'ঘণ্টা করে পায়চারী

www.pathagar.com

করেন। এ সময়ই তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাহেন্দ্রক্ষণ। বাকী সময় পর্যায়ক্রমে লেখাপড়া, বিশ্রাম ও চরকায় সূতা কেটে অতিবাহিত করেন। চরকা তার সারা জীবনের সাথী। জেলখানায়ও এই একান্ত বিশ্বস্ত এবং প্রিয় বন্ধু তার সঙ্গ ত্যাগ করেনি। নিজের চরকায় নিজ হস্তে সূতা কেটে সেই সূতার তৈরি তার পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরি হয়ে থাকে।

সাতাশ সেলের বারান্দায় বসে অত্যন্ত ফর্সা খদ্দরের জামা-কাপড় পরে এই শুভ্র সৌম্য বৃদ্ধ যখন চরকায় সূতা কাটেন, তখন সে দৃশ্য অবলোকন করে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করি। প্রায়ই তার সূতা কাটার সময় পাশে বসে গল্প করি, নিরবচ্ছিন্ন একাগ্রতায় তিনি কখনোই লেখাপড়া, বিশ্রাম বা চরকায় বসতে পারেন না। মাঝে মাঝে তাকে উঠে যেতে হয় ছোকরা ফাইলের দুর্দমনীয় মানব সন্তানদের বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাতে বা তাদের ঝগড়া ফ্যাসাদের আপোষ-নিষ্পত্তি করে দেওয়ার দুরূহ কাজে। সকলেরই তিনি স্নেহময় দাদু, ছেলেগুলিও তাকে দাদুর মত ভালবাসে। ওদের সব আবদার ও আরজি তারই কাছে। ওদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য খানিকটা ঔষধও তিনি সবসময় মজুত রাখেন। বলা ত যায় না, কখন কোন শ্রীমানের কি প্রয়োজন হয়ে পড়বে। জেলখানার মধ্যে তখন কোথায় ডাক্তার, কোথায় বদ্যি!

গৃহচিকিৎসার উপর চারু দা একখানা উৎকৃষ্ট বই লিখেছেন। ভারতের সর্বোদয় আন্দোলনের নেতা মহাত্মা গান্ধীর যোগ্যতম উত্তরসূরী, বিশ্বের চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী ভূদানযজ্ঞের পুরোহিত আচার্য বিনোবাভাবের পূর্ব পাকিস্তান সফরের উপর ভিত্তি করে 'বিনোবাজীর প্রেম-যাত্রা' নাম দিয়ে একটি গ্রন্থও তিনি রচনা করেছেন। বিনোবাজীর প্রেম যাত্রা পড়ে মহাত্মা ও বিনোবার জীবনাদর্শ, তার রূপায়ন, সর্বোদয় আন্দোলনের মূলকথা, ভূদানযজ্ঞের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষন প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করা যায়। বইটি পড়েই বুঝা যায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ ছোপ তার গায়ে বিশেষ না লাগলও চারু দা গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী। জ্ঞান তার বহুমুখী, প্রায় সমস্ত বিষয়ের উপরই প্রচুর পড়াশুনা রয়েছে।

সে কথা বললেই চারুদা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেন, আরে রেখে দাও পাণ্ডিত্য, আমার বিদ্যে তো কাঠ ঠোকরান বিদ্যে। সবটারই আমি জ্যাক? মাষ্টার কেবল চরকা ঘোরান আর চা খাওয়ার বেলায়। নিরামিষাশী চারুদা চা একটু বেশিই খান। তা নিয়ে নিজেই কৌতুক করেন, বলেন, 'চ' এর প্রাধান্য

www.pathagar.com

আমার মধ্যে সর্বাধিক, নাম চারু চন্দ্র চৌধুরী, খাই চা, ঘুরাই চরকা।

আওয়ামী লীগ কর্তৃক পেশকৃত ছয় দফা দাবী আদায়ের সংগ্রাম করে এবার আমরা কারাবরণ করেছি।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরের যুদ্ধের সতের দিনের অভিজ্ঞতায় দেখা গেল, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন। দেশের দুই অংশের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করাও সম্ভব নয়। তাছাড়া বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলেও এ সত্য প্রতীয়মান হয় – যেহেতু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অস্বাভাবিক ভৌগোলিক দূরত্ব বিরাজমান এবং মধ্যস্থলে অমৈত্রীসুলভ মনোভাবাপন্ন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অবস্থান, সেই হেতু পাকিস্তানের উভয় অংশ আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে না তুললে মূলেই এটি দুর্বল থেকে যায়। দ্বিতীয়তঃ গত দেড় যুগ এক অংশের অর্থ ও সম্পদ দ্বারা অন্য অংশকে গড়তে গিয়ে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে অনতিবিলম্বে সে সব অন্যায়ের প্রতিকার করে পূর্ব পকিস্তানের মানুষকে অর্থনৈতিক দিক থেকে শোষণমুক্ত করতে না পারলে অচিরেই দেশের ভিত্তিমূলে ব্যাপক আঘাত নেমে আসবে।

তাই দেশের উভয় অংশকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে প্রদেশকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার মানসে এবং রাষ্ট্রের চিরস্থায়ী মঙ্গল ও সংহতির প্রশ্ন বিবেচনা করে আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের সার্বজনীন দাবীকে সুনির্দিষ্ট ধারায় গেঁথে ছয় দফা দাবী পেশ করেন। এই ফরমূলা পার্টির ঘোষণাপত্র নয়, একে পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর প্রস্তাবনা আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

ছয় দফা প্রস্তাবনা ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থান্বেষী শোষকবৃন্দের নিকট থেকে যে বিরূপ সমালোচনার ঝড় বইবে, তা পূর্বাহ্নেই অনুমান করা গিয়েছিল, কিন্তু তারা এবং পশ্চিমা ধনবাদীদের ক্রীড়নকরা ছয় দফা দেখে যে এতটা বেসামাল হয়ে পড়বে তা ভাবা যায়নি। বিভেদ বৃষ্টিকারী, বিদেশের দালাল, বিচ্ছিন্নতাবাদী ইত্যাদি গালাগাল দিয়েই তারা ক্ষান্ত হয়নি – গৃহ

www.pathagar.com

যুদ্ধের হুমকী দিতেও দ্বিধাবোধ করেনি। প্রকাশ্যে ধমক দিয়েছে, এরপর অস্ত্রের ভাষায় তারা কথা বলবে।

কোন আদর্শই রক্তদান ছাড়া সফলতা লাভ করতে পারে না। সংগ্রাম ব্যতিরেকেও কোন দাবী অর্জন করা যায় না। তাই শাসককূলের ভ্রূকুটি কুটিল অগ্নিদৃষ্টি অবহেলা করে আমরা দাবী আদায়ের সক্রিয় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লাম পরিপূর্ণ শান্তিপূর্ণ অবস্থায় কিন্তু আমাদের শান্তি মিছিল সরকারের রক্তলোলুপ বেয়নেটের সামনে পর্যদস্ত হয়ে গেল। এ দেশের মানুষের ন্যায্য দাবী আদায়ের সংগ্রামে আর একবার রাজপথের ধূলি-ধূসরতা রক্তস্রোতে ভেসে গেল। মনু মিয়াদের রক্তে ঢাকার রাজপথ আর একবার লাল হয় গেল। কটি তাজা প্রাণ আত্মহূতি দিয়ে ছয় দফা দাবীকে রক্তের অক্ষরে লিখে দিল।

কর্মীদেরকেও একে একে কারাগারে নিক্ষেপ করা হল। এ দেশের গণমানসের মুখপত্র ইত্তেফাক পত্রিকাকেও বাজেয়াপ্ত করা হল। আর একবার শুরু হল নির্যাতন আর নিপীড়নের অধ্যায়। কয়েদখানায় পুরেও ওরা তৃপ্তি পেল না, আমাদের বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা দায়ের করা হল।

তাই বসে ভাবি, এবার আর শীঘ্র মুক্তি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। মিথ্যা অপবাদে কারাগারে বন্দী করে রেখে ওরা ফায়দা লুটতে চায়। সাম্রাজ্যবাদীদের পরিতুষ্ট রাখার মানসে কয়েকজন সাম্যবাদী কর্মীকে ওরা সব সময় কারাগারে আবদ্ধ করে রাখে। দেখাতে চায় – দেখ, আমরা কমিউনিস্টদের আটকে রেখেছি। কমিউনিজমের বিস্তার রোধে আমরা বদ্ধ-পরিকর। আমাদেরকে সাহায্য করতে ভুলো না যেন। তেমনিভাবে পশ্চিমাংসের ধনবাদী ও স্বার্থান্বেষী ব্যুরোক্রাটদের তুষ্ট রাখার মানসে বিচ্ছিন্নতাবাদের অপবাদ দিয়ে আমাদেরকে ওরা দীর্ঘকাল আটকে রাখতে পারে।

এমনি সব চিন্তার বশবর্তী হয়ে মুক্তির আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুরা বার বার অনুরোধ করেছেন হেবিয়াস কর্পাস করার জন্য, কিন্তু কোন ফল লাভের আশা নেই ভেবে রাজী হইনি। শেষ পর্যন্ত বড়দা. এবং এডভোকেট রব সাহেব প্রায় জবরদস্তি করেই মামলা করতে আমাকে সম্মত করালেন। সাধারণ কর্মীদের রীট আবেদন নাকচ হয়ে যেতে দেখে একেবারেই আশাবাদী ছিলাম না। বহুবার জেল খাটার দাগী আমি, আমাকে

www.pathagar.com

ছাড়বে না – সকলেই এক বাক্যে রায় দিয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু মানুষ কতটুকুই বা অনুমান করতে পারে – ওবায়েদ কোর্টে গিয়েছি, সেখানেই খবর পেয়েছে হাইকোর্ট আমার আটকাদেশ অবৈধ ঘোষণা করে অবিলম্বে মুক্তির নির্দেশ দিয়েছে। দশ সেলের মোড়ে পৌঁছেই সে চীৎকার করে উঠল, মোয়াজ্জেম ভাই খালাস। সবাই যার যার ঘর থেকে দৌড়ে বের হলেন। ওর কাছ থেকে সব শুনে একযোগে আমার ঘরে চড়াও হলেন। দশ সেলের সর্ব পশ্চিম প্রান্তের ঘরে থাকতাম বলে পূর্ব প্রান্তের চীৎকার কোলাহল শুনতে পাইনি। সকলের উল্লাস ধ্বনি, কোলাকুলি আর হৈ চৈ-এর মধ্যে বুঝতে পারলাম আমার বন্দরের কাল শেস হয়েছে। এবার নোংগর গুটাতে হবে। অভাবিত মুক্তির আনন্দে সারা মন নেচে উঠলো।

উল্লাসের প্রথম ধাক্কা স্তিমিত হয়ে আসতেই চিন্তা ঢুকল, মুক্তি পেয়েও কারাগার থেকে বের হতে পারব না। তিন নম্বর মামলা রয়েছে আমার নামে। মাত্র একটি মামলার জামিন রয়েছে, হাজত বাস সুনিশ্চিত। তবুও ভাবলাম মূল বন্দীত্ব থেকে ত মুক্তি পেলাম। বড় জোর সপ্তাহ খানেক লাগতে পারে বাকী মামলা দুটির জামিনের ব্যবস্থা হতে।

পরদিন মুক্তির ছাড়পত্র এসে গেল। মেন্টাল এলাকার সকলের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে দশ সেলের বন্ধুদের সঙ্গে আলিঙ্গন করে শকুন্তলার গেট পার হয়ে এলাম। মনকে ধমকে তৈরি করেছিলাম, বিদায় মুহূর্তে চোখের পানি ফেলব না। কিন্তু পেছনে ফেলে আসা দীর্ঘদিনের সুখ-দুঃখের অংশীদার বন্ধুদের চোখের দিকে তাকিয়ে চোখকে শুকনো রাখতে পারলাম না। চোখের পানি মুছতে-মুছতেই অফিসে এসে উপস্থিত হলাম।

কাগজে পত্রে আমাকে এক ব্রাঞ্চ থেকে রিলিজ করে অন্য ব্রাঞ্চে ভর্তি করে নেওয়া হল। স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে খরচ হয়ে আমদানী ব্রাঞ্চে জমা হলাম। হস্তান্তর পর্ব সমাধা হয়ে গেলে হাজতী হিসেবে আমাকে পুরানো বিশ সেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। বাষট্টি, তেষট্টি এবং চৌষট্টি সালে নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে এখানটায় দীর্ঘদিন কাটিয়ে গিয়েছি। জায়গাটা আমার নিকট নূতন নয়। নূরে আলম এবং নূরুল ইসলামও রয়েছে এখানে। সর্বোপরি কাছেই দেওয়ানী, মুজিব ভাইয়ের আবাস।

তিন কম্বল সম্বল করে মেঝেতেই বিছানা পাতলাম, জেলের ডায়েট অবশ্য আমাকে নিতে হয়নি। মুজিব ভাই তার চৌকা থেকেই সব ব্যবস্থা করলেন।

www.pathagar.com

ভেবেছিলাম জামিন পেতে দেরী হবে না। কিন্তু মানুষের অনুমান কত অনিশ্চিত। ডাকাতি, রাহাজানি বা হত্যার মামলা নয় – রাজনৈতিক মামলা। সরকারের অভিমতে পল্টনের জনসভায় আপত্তিকর বক্তৃতার অপরাধ। ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা জজ দুজনাই জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য করলেন। একজন আইনজীবীকে বক্তৃতার মামলায় জামিন দেওয়া হল না দেখে সকলে ক্ষুব্ধ হলেন। অগত্য হাইকোর্টে জামিনের আবেদন পেশ করা হল।

কপাল মন্দ, হাইকোর্টে ত্বরিৎ ফল লাভ হল না। জামিনের আবেদনে স্বাস্থ্যগত কারণ প্রদর্শনের ফলে সিভিল সার্জেনের রিপোর্ট তলব করা হল। আদর্শের জন্য কারা ভোগ করছি। তাই দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতে নিষেধ করে দিলাম। ফলে স্বাস্থ্যের রিপোর্টও অনুকূলে গেল না।

কয়েক দফা শুনানী হল। সরকারী কৌশুলী শীঘ্র মামলা নিষ্পত্তি করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় জামিনের প্রশ্ন স্থগিত রাখা হল। সেই থেকে অনিশ্চিত হাজত বাসে দিন কাটাচ্ছি। হাইকোর্টের নির্দেশে সরকার হাজতী হিসেবে প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা দেওয়ায় প্রায় পূর্বের মতই দিন কেটে যাচ্ছে।

এখানে এসে সব চাইতে বড় লাভ হয়েছে, সারা দিনমান মুজিব ভাইয়ের সঙ্গ পাচ্ছি। দীর্ঘদিনের বন্দী জীবনের একাকীত্বে সঙ্গী পেয়ে মুজিব ভাইও উল্লসিত হয়ে উঠেছেন।

প্রায়ই বলেন, তোর জামিন হচ্ছে না এটা যদিও অতীব দুঃখজনক তবুও আমার জন্য আশীর্বাদই হয়েছে। এখন সারাদিনই গল্পে হাসিতে মেতে থাকি। রাত্রে আরামে ঘুমাতে পারি, সঙ্গীহীন বন্দী জীবনের অসহনীয় যাতনা উপলব্ধি করতে পারলেও মুজিব ভাই-এর কথা শুনে রেগে উঠি। মুজিব ভাই আরো রাগাবার মতলবে বলেন, দশ সেল থেকে প্রমোশন পেয়ে বিশ সেলে এসেছ, আর একবার প্রমোশন পেলে কোথায় যেতে হবে জান চাঁদ? হিসাব করে দেখি, চল্লিশ সেলে যেতে হয়। চল্লিশ মানে লুনেটিক সেল, সোজা কথায় পাগলা গারদ। মুজিব ভাইয়ের কথা শুনে রাগ করতে গিয়েও হেসে ফেলি।

শেখ সাহেবকে যারা বাইরে থেকে চেনেন বা জানেন, তাদের কাছে তিনি একজন সংগ্রামী রাজনৈতিক নেতা কিন্তু জেলখানায় নিকটতম সাহচর্যে তাঁকে জানা যায় একজন শিশুসুলভ মনের অধিকারী, সদা কৌতুকময় আনন্দদায়ক সঙ্গী হিসাবে। জেলখানার মুজিব ভাইকে বাইরের সদাব্যস্ত

www.pathagar.com

কর্মচঞ্চল মুজিব ভাইয়ের চাইতে বেশি ভাল লাগে।

মুজিব ভাইয়ের সাথে সরাসরি পরিচয় ১৯৫৬ সাল থেকে। সেই থেকে গত এক যুগের নিবিড় সাহচর্য, আস্থা এবং অকৃত্রিম প্রীতির বলে তিনি আমাকে স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন।

একজন নিবেদিত কর্মী হিসেবে মুজিব ভাইয়ের নির্দেশে চরমতম ঝুঁকি নিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা জাগেনি। আইয়ুব খার সামরিক আইন যখন দোর্দণ্ড প্রতাপে চলছে, যখন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একটি কথা আকারে ইঙ্গিতে বললে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আশংকা সেই সময়ও মুজিব ভাইয়ের নির্দেশে "পূর্ব বাংলা মুক্তি ফ্রন্টের" ছাপানো বিজ্ঞাপন রাতের অন্ধকারে স্বহস্তে সারা ঢাকা শহরে বিলি করেছি। ধরা পড়লে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও সে দিন কোন দ্বিধা আসেনি।

ছাত্র জীবনের অবসানে রাজনৈতিক অঙ্গণে প্রবেশ করে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাজে এবং দেশের প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনের সময়ে তাঁর সাথে প্রদেশের বিভিন্ন স্থান সফর করেছি। এবার গ্রেপ্তারের পূর্বেও ছয় দফার বাণী নিয়ে উত্তরবঙ্গ সফরকালে তাঁর সঙ্গী ছিলাম। প্রদেশের বিভিন্ন জেলা মহকুমায় তাঁর সঙ্গে ভ্রমণ করে আনন্দ পেয়েছি প্রচুর, অভিজ্ঞতার খাতায় জমা হয়েছে প্রচুরতর। বরেন্দ্রভূমি রাজশাহীর নিভৃত দুর্গম অঞ্চল পর্যন্ত, সিলেট জেলার প্রান্তসীমা বিয়ানী বাজার থেকে আরম্ভ করে বরিশালের ভাটি অঞ্চল পর্যন্ত মুজিব ভাই যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন তার তুলনা নেই।

কয়েদী ও জেল কর্মচারীদের উপর মুজিব ভাইয়ের অত্যন্ত প্রভাব। তারা তাঁকে শুধু ভক্তি শ্রদ্ধাই করে না, তাঁর জন্যে যে কোন ঝুঁকিও গ্রহণ করতে পারে। ইন্টারভিউতে যাওয়া-আসার সময় দুপার্শ্বে দণ্ডায়মান কয়েদীরা তাঁকে হাত তুলে সালাম জানায়। ঈদের জামাতে কয়েদীদের ব্যূহ থেকে তাঁকে বের করে আনা রীতিমত শ্রম সাপেক্ষ। মুজিব ভাইও ওদের জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত। তাঁর উপস্থিতিতে কোন কয়েদীর উপর নির্যাতন হতে পারে না। তাঁর জ্ঞাতসারে একটি কয়েদীকেও অন্যায় রিপোর্ট করা চলে না। শুধু কয়েদী নয়, জেলখানার স্বল্প বেতনভূক কর্মচারীদের জন্যও রয়েছে তাঁর অকৃত্রিম সহানুভূতি। কারাভ্যন্তরেও অতিথি সৎকারের ত্রুটি তাঁর নেই। দেওয়ানীতে প্রতিনিয়ত চা, সরবত, রুটি, বিস্কুট, ডিম ইত্যাদির সদব্যবহার চলেছে।

www.pathagar.com

সিপাই, জমাদার, মেট, পাহারা, নাইটগার্ড, ডাক্তার, কম্পাউন্ডার থেকে শুরু করে জেলর, ডেপুটি জেলার এমনকি খোদ বড় সাহেবও দেওয়ানীতে এসে কিছু মুখে না দিয়ে যেতে পারে না। সকলকে আপ্যায়িত করেই তাঁর তৃপ্তি।

রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র ও শ্রমিক আন্দোলনের লোকেরা যখন মাঝে মাঝে কারাগারে এসে উপস্থিত হয় এবং অনভ্যস্ত কারাবাসের শত অসুবিধার মধ্যে অসহায় হয়ে পড়ে, সে খবর কানে পৌঁছামাত্র মুজিব ভাই এগিয়ে আসেন তাদের কারাবাসের মুহূর্তগুলোকে সহনীয় করে তুলতে। তেল, সাবান, বিড়ি, সিগারেট থেকে শুরু করে লুঙ্গি গামছা এমনকি প্রয়োজনে দুবেলার খাবার পর্যন্ত সরবরাহ করেন। হাসি মুখে দলমত নির্বিশেষে প্রতিটি কর্মীর প্রয়োজনীতার যোগান দিয়েই তাঁর আনন্দ। মুজিব ভাইয়ের অবর্তমানে দু-চারদিনের অতিথি সেই সব জেল রিফিউজিদের অবস্থা ভাবা যায় না।

অনেকের মত শুয়ে বসে কখনোই জেলখানায় তিনি সময় নষ্ট করেন না। বাগান করার খুব সখ মুজিব ভাইয়ের। নানা প্রকার ফুলের চারা এনে লাগিয়েছেন দেওয়ানীর চারিদিকে। সামনের লনটুকু শ্যামল দূর্বা ঘাসে ছেয়ে ফেলেছেন।

শাক-সবজী ও তরি-তরকারীর বাগান করেছেন তিনি। তাঁর স্বহস্তে রোপিত গাছের তরকারী দশ সেলে বসেই আমরা খেয়েছি। শুধু দশ সেল কেন, হাসপাতাল, চাব্বিশ সেল, এক দুই খাতা প্রভৃতি স্থানে তিনি তাঁর বাগানের শাক-সবজী ও তরকারী পাঠিয়েছেন। নিজ হস্তে উৎপাদিত সামান্য জিনিসও আনন্দ করে সকলের মাঝে বিতরণ করেছেন। এছাড়া রয়েছে তার এক পাল মোরগ, মুরগী ও কবুতর। সবকিছু মিলিয়ে দেওয়ানীর পরিবেশকে তিনি রীতিমত গৃহস্থ বাড়ির পরিবেশে রূপান্তরিত করে ফেলেছেন।

মুজিব ভাই বলেন, দিনটা কোন প্রকারে কাটিয়ে দিই বইপত্র পড়ে, বাগান ও তরকারীর ক্ষেত পরিচর্যা করে কিন্তু রাত্রি আর কাটতে চায় না। এমনিতেই ঘুম কম। তার উপর চল্লিশ সেলের বাসিন্দাদের রাত-ভর চীৎকার গালাগালি আর উদ্ভট সংগীত। প্রায়ই ঔষধ খেয়ে পড়ে থাকতে হয়।

ডিগ্রী এলাকর ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত দেওয়ানী অন্যান্য সবদিক থেকেই ভাল। কিন্তু এর সব চাইতে বড় অসুবিধা মাত্র সাত গজ দূরত্বে চল্লিশ সেলের অবস্থান। চল্লিশটা ঘোর উম্মাদকে রাখা হয়েছে এখানে। মেন্টাল হাসপাতাল থাকার পরও কেন যে আজও জেলখানার অভ্যন্তরে পাগলদের রাখা হয় বুঝে

www.pathagar.com

উঠতে পারি না। প্রায়ই বিনা চিকিৎসায় বা সামান্য চিকিৎসায় চল্লিশ সেলের নারকীয় পরিবেশে রেখে অর্ধ পাগলকে বদ্ধ পাগলে পরিণত করা হয় আর বদ্ধ পাগলেরা ঘোরতর উন্মাদ হয়ে যায়। ডান্ডা মেরে জলের টবে চুবিয়ে পাগল ভাল করার বর্বর প্রচেষ্টা আজও জেলখানায় প্রতিনিয়ত চলেছে।

কর্তৃপক্ষ কৈফিয়ৎ দেন, এরা শুধু পাগল নয় এরা ক্রিমিনাল লুনেটিক, এক একটা মারাত্মক অপরাধ করার পরে এদের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। তাই এদের কারাগারেই রাখতে হয়। এটা কুযুক্তি। সুস্থ না হলে যেখানে বিচার হতে পারে না, সেখানে উপযুক্ত হাসপাতালে পাঠিয়ে এদের চিকিৎসা করাই কি অধিকতর যুক্তিসঙ্গত নয়! কয়েদীদের মধ্যেও কেউ পাগল হয়ে গেলে তাকে চিকিৎসা ও শুশ্রুষায় সুস্থ করে তোলা উচিত। তখন কারাগারে না রেখে হাসপাতালেই তাদের স্থানান্তরিত করা সমীচীন।

চল্লিশ সেলের যা অবস্থা এবং এর যা পরিবেশ তাতে সুস্থ মানুষকেও ওখানে কিছুদিন আটকে রাখলে সে পাগল হয়ে যেতে বাধ্য।

জেলখানার দু-একজন অত্যধিক ক্ষমতা সচেতন কর্মচারী মাঝে-মধ্যে উদ্ধত অহমিকার বশবর্তী হয়ে হঠকারিতাপূর্ণ কাজ করে বসেন। কিছুদিন পূর্বে জেলরের মুখে মুখে তর্ক করার অপরাধে যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডিত ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী একটি ডিভিশনের ছেলেকে শাস্তি দেওয়ার মানসে চল্লিশ সেলের প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করা হয়। বিমাতার কুচক্রে হত্যার অপরাধে দায়ী অত্যন্ত মেধাবী এই ছেলেটিকে পাগল করে দেওয়ার সর্ব আয়োজন সম্পন্ন হয়ে এসেছিল, কিন্তু অন্যান্য সহৃদয় কর্মচারীদের হস্ত-ক্ষেপের ফলে সে প্রচেষ্টা সম্ভব হতে পারেনি।

চল্লিশ সেলের বাসিন্দাদের প্রত্যেকের জীবনেই আছে এক একটা বিরাট ইতিহাস। পাগল হয়ে যাবার পশ্চাতে রয়েছে কত অকথিত ঘটনা-সংঘাত। ওদের ভাবলেশহীন মুখে দিকে তাকিয়ে সে সব বোঝার উপায় নেই।

অধিকাংশ পাগলই নিশ্চুপ থাকে নয়ত বিড় বিড় করে আপন মনে বকে চলে। কিন্তু তিন চারটি প্রাণী আছে যাদের অত্যাচারে মুজিব বাইরে জীবন এবং ইদানীং আমরও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সারাদিন ধরে চলে এদের ক্লান্তিহীন চীৎকার, গালাগালি আর বেসুরো গান। একজনের রয়েছে খুব উদাত্ত কণ্ঠ এবং বলিষ্ঠ আওয়াজ, সে রাতভর সিরাজউদ্দৌলা, মীর কাসিম আর টিপু সুলতান নাটকের আদি অন্ত আবৃত্তি করে চলে। থিয়েটার-পাগলার

www.pathagar.com

অভিনয়-আবৃত্তি দিনের বেলা মন্দ না শুনালেও রাত্রির নিদ্রা হরণের নিশ্চিত সহায়ক।

আর একটি পাগল দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা এক দুই তিন করে বিশ পর্যন্ত গুণতে থাকে। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে চীৎকার করে এই এক দুই গণনার পেছনে একটি কাহিনী আছে।

পূর্বেও ওকে পাগলা গারদে এনে পোরা হয়েছিল। তখন নাকি নিয়ম ছিল, লুনেটিকরা একটু সুস্থ হলে তাদেরকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হত। ম্যাজিস্ট্রেট তাদের সুস্থতা পরীক্ষা করার জন্য তিনবার এক থেকে বিশ পর্যন্ত গণনা করার আদেশ দিতেন। ঠিক ঠিক তিন বার গণনা করতে পারলে তাদের মুক্তি দিয়ে দেওয়া হত।

বর্তমান পাগলাটিকেও সেবার ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়। তিনি ওকে তিন বার গণনা করতে আদেশ দেন এবং সেও তিন বার ঠিক ঠিক গুণে ফেলে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তখন ওকে ছেড়ে দিতেই সে এক লাফে কোর্ট প্রাঙ্গনে পৌছে ম্যাজিস্ট্রেটকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে বলে ওঠে, শালা, তুই ভেবেছিস আমি ভাল হয়ে গেছি! আরে না, আমি এখনো ভাল হইনি। এখনও পূর্বের মত পাগলই আছি। হা-হা-হা। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তো থ। কিছুদিন পর পুনরায় পুলিশ ওকে পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেয়। এবার ঘোরতর উন্মাদ। কিন্তু পাগলামীর অন্য কোন লক্ষণ নেই। কেবল দিনরাত প্রাণপণে এক দুই গণনা করে চলেছে। বিকৃত মস্তিষ্ক হতভাগ্য তার বিকৃতির মধ্যেও সঠিক এক দুই গুণে মুক্তি প্রাপ্তির সুত্রটি ভুলতে পারেনি। তাই রাত্রি দিন চীৎকার করে গুণে চলছে। পাছে সময়কালে ভুল হয়ে যায়। অন্তরের অন্তঃস্থলে যে বিশ্বাস বলীয়ান হয়ে আছে তাকে বারংবার উচ্চকণ্ঠে আউড়িয়ে ওর ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই।

কিন্তু আমাদের চোখে নেই ঘুম।

আর একটি পাগল রয়েছে, এমনিতে খুবই ভাল, কিন্তু কেউ একবার বললেই হয়, এই তেনা চোর। আর রক্ষা নেই, শুরু হয়ে গেল খিস্তি, দুনিয়ার অকথ্য অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করে পিতৃকূলের চর্তুদশ পুরুষের শ্রাদ্ধ করে ছেড়ে দেয়। একবার শুরু হলে দম না নিয়ে পাঁচ সাত ঘন্টা অনায়াসে খিস্তি করে যাওয়ার অসীম ক্ষমতা রাখেন এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষটি।

www.pathagar.com

তেনা চোর বলার সঙ্গে ওর কী সম্বন্ধ কেউ জানে না কিন্তু সকলেই ওর দুর্বলতার কথা জানে। তাই তেনা চোর বলার লোকের অভাব হয় না। রাত্রির ডিউটিতে দুচোখ ভরে ঘুম নেমে এলে ওয়ার্ডাররাও ওকে তেনা চোর বলে ক্ষেপিয়ে দেয়। আর সঙ্গে সঙ্গেই বারুদখানায় অগ্নি নিক্ষিপ্ত হয়। ওর খিস্তির চোটে সিপাইয়ের ঘুম জেল ছেড়ে পালিয়ে বাঁচে।

মাঝে মাঝে সব পাগল একসঙ্গে ক্ষেপে ওঠে। ওদের সে সময়ের প্রলয়তানে সমগ্র ডিগ্রী এলাকা জেগে ওঠে। নিদ্রাহীন শয্যায় এ-পাশ ও-পাশ করতে করতে সবাই ভাবে, এমনি করে কিছুদিন একটানা চলতে থাকলে তাদেরও চল্লিশ সেলে স্থান খুঁজে নিতে হবে।

নাইট গার্ড জমাদার, মিয়া সাবরা মিলে বালতি বালতি জল নিক্ষেপ করে প্রজ্জ্বলিত আগ্নেয়গিরিগুলিকে নির্বাপিত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। মুজিব ভাই বলেন, এমনি অবস্থার মধ্যে আমি আছি।

ডিগ্রী এলাকায় দিনের পর দিন বাস করে মাঝে মাঝে মনে হয় ওরা আমাদেরকে পাগলই করে দিতে চায়। কিন্তু এদেশের মানুষের সত্যিকারের মুক্তি না দেখা পর্যন্ত ওরা আমাদের কাবু করতে পারবে না। আমরা যদি কৃতকার্য না হই, আগামী দিনের মানুষেরা পিছিয়ে যাবে না। এদেশের হতভাগ্য মানুষগুলির প্রতি কর্তব্য করতে তারা ভুলবে না। বুঝতে পারি, ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে গিয়েছি। চুপ করে শূন্যে তাকিয়ে থাকি। নিজেই নিজেকে সান্ত্বনার বাণী শোনানোর মানে হয় না।

'পাকিস্তান, ও পাকিস্তান' বলে ডাকাডাকি করছিল ছয় সেলের বন্দী খুলনার সংখ্যাতীত হত্যাযজ্ঞের নায়ক জুম্মা খান। ছ ফুট লম্বা, আড়াইমনী এই নর-দানবটি সারা জেলখানায় এক মুজিব ভাই ছাড়া আর কাউকে পরোয়া করে না। শুধু মুজিব ভাইয়ের কাছে বিষহারা ঢোড়া, তাঁকে শুধু ভক্তিই করে না, ওর সব নালিশ আবদারও মুজিব ভাইয়ের দরবারে।

ডাক শুনে মুজিব ভাই জবাব দিলেন, ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ্ কেন? কি চাই?

জুম্মা বলে, একঠো কাগজ তো ভেজিয়ে।

www.pathagar.com

মুজিব ভাই ফালতুকে ডেকে আদেশ করলেন একটা দৈনিক কাগজ দিয়ে আসতে। নিজে পড়তে না জানলেও অন্যদের দিয়ে পড়িয়ে কাগজের প্রতিটি খবর শোনার অত্যন্ত আগ্রহ জুম্মার।

মুজিব ভাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, জুম্মা আপনাকে পাকিস্তান নাম দিয়েছে কেন? আর আপনিই বা সে সম্বোধনে সাড়া দিচ্ছেন কেন?

মুচকি হেসে জবাব দিলেন তিনি, আমাকে জিজ্ঞাসা না করে জুম্মাকেই কর, তাহলেই তোর প্রশ্নের সঠিক জবাব মিলবে।

উঠে গিয়ে জুম্মা খানকে পাকড়াও করলাম।

আচ্ছা খান, আপনি মুজিব ভাইকে পাকিস্তান বলে ডাকেন কেন?

জুম্মা খান তার ভাঙা ভাঙা উর্দুতে জাবাব দিল, পাকিস্তান বোলেগা নেহিতো কেয়া বলগো। ইয়ে সবলোগ কলকাত্তামে কিতনা চিল্লায়া – হামলোগ পাকিস্তান বানায়েংগে। পাকিস্তান জরুর বানায়া, লেকিন ওহি পাকিস্তানমে আভি জেল খাট রহা, ইন লোগ কো পাকিস্তান বোলায়েংগে নেহি ত কিসকো বোলায়েংগে?

একজন অশিক্ষিত আবাঙালী কয়েদীর কথা শুনে আমি লা-জওয়াব হয়ে পড়লাম। যুদ্ধ করে যারা স্বাধীনতা এনেছেন, তাদেরই স্থান হল সেই স্বাধীন দেশের কারাগারে। অদৃষ্টের এটাই নির্মম পরিহাস। জুম্মা খানের সামান্য পরিহাসের মধ্যেও দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির খানিকটা ছবি ভেসে ওঠে। দেহমন সুস্থ থাকলে মুজিব ভাই হাসি, কৌতুক আর গল্পে সকলকে মাতিয়ে রাখেন। জনসভায় বক্তৃতা করার সময় প্রায়ই দুটি একটি গল্প পরিবেশন করে থাকেন।

সেদিন কথা প্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা করছিলাম, আচ্ছা, মুজিব ভাই, একনায়কত্বের একটা বৈশিষ্ট্য হল যে, কখনো উচ্চ শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার পদে কোন বিশেষ ব্যক্তিকে দীর্ঘদিন বহাল রাখে না, সন্দেহ-ভীতিপ্রবণ মন অল্পদিনেই বিষাক্ত হয়ে ওঠে। ফলে ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের ঘন ঘন ক্ষমতাচ্যুতি ঘটে। এখানেও একই ধারা এতদিন চলছিল। কিন্তু বেশ কিছুদিন যাবত আমাদের লাট সাহেবের প্রশ্নে এ ধারার ব্যতিক্রম লক্ষ করছি। এর কারণ কি?

আমার কথা শুনে মুজিব ভাইয়ের চোখ দুটি কৌতুকে নেচে উঠল।

www.pathagar.com

হাসিমুখে উত্তর করলেন, কারণ জানিস না? ভদ্রলোক যে অপূর্ব বন্টন বিশারদ। তাই কর্তার তাকে খুব পছন্দ।

তাঁর কৌতুকপূর্ণ চাহুনি আর হাস্যোদ্দীপ্ত কণ্ঠই ইঙ্গিত করল মুজিব ভাইয়ের কথার আড়ালে নিশ্চয়ই কোন রসাত্মক গল্প লুকিয়ে আছে। বললাম, কি রকম?

মুজিব ভাই বললেন, সিংহ, বাঘ আর পাতি শিয়ালের সে গল্প শুনিসনি? আচ্ছা শোন্।

এক বনে একটি সিংহ, একটি বাঘ ও একটি পাতি শিয়াল একত্রে বসবাস করে। তিনজনে যথেষ্ট খাতির। একদিন তিন বন্ধুতে মিলে শিকার করে নিয়ে এল একটা মোষ, একটা গরু আর একটা হরিণ।

আহারে বসার আয়োজন করে পশুরাজ সহযোগী ব্যাঘ্রকে আদেশ করলেন, শিকার তিনটা তুমিই বণ্টন করে ফেল।

ব্যাঘ্র প্রবর অনেক চিন্তা-ভাবনা করে নিবেদন করল, হুজুর আপনি পশু সমাজের রাজা, বনের মহারাজ, আপনি মহিষটা আহার করুন। আপনার পরই আমার স্থান, আমি গরুটা খাই আর আমাদের সর্বকনিষ্ঠ সঙ্গী পাতি শিয়াল হরিণটা নিক। বাঘ তার বাটোয়ারার ফর্মুলা শেষ করতেই সিংহ মহারাজ গর্জে উঠল, পাজী, হতচ্ছাড়া, বেঈমান, এই তোর ভাগ করা, বলেই বাঘের গর্দানে মারলো বিরাশি সিক্কার একথাবা। সিংহের থাবার চোটে বাঘ হুমড়ি খেয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল, উঠে দাঁড়াবার শক্তি রইল না।

পশুরাজ তখন পাতি শিয়ালকে ডেকে আহার্য তিনটিকে সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করার আদেশ দিলেন। পাতি শিয়াল মহারাজের খুরে হাজার সালাম ঠুকে বলল, এ আর শক্ত কি হুজুর, এ ভাগ করা তো একেবারে সহজ। এখন মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়, হুজুর এখন মহিষটি দিয়ে আহার সমাধা করুন। হুজুরের রাত্রির ভোজনের জন্য গরুটি থাক, আর আগামীকাল সকালে ঘুম থেকে উঠে হুজুর হরিণটি দিয়ে প্রাতঃরাশ সেরে নেবেন। সিংহ মহারাজ বেজায় খুশি। বণ্টন রীতি-দেখে তিনি পাতি শিয়ালের কর্মদক্ষতা আর বুদ্ধির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। পাতি শিয়ালকে কাছে ডেকে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মাশাল্লাহ্ কি তোফা বুদ্ধি। কি সুন্দর বণ্টন পদ্ধতি। তুমি এত ভাল ভাগ করতে কার কাছ থেকে শিখলে মেরে-জান? শিয়াল কাচুঁমাচুঁ

www.pathagar.com

করে জবাব দিল, হুজুর এ শিখতে আমাকে বেশি দূর যেতে হয়নি। আপনার সামনে ঐ যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে বাঘ্র, তার অবস্থা দেখেই আমার এ শিক্ষা হয়েছে।

আমাদের সম্মিলিত হাসির মধ্যে মুজিব ভাই তার গল্পে শেষ করলেন। বললেন, তোর উল্লিখিত বিশেষ ব্যক্তিটিও পূর্বসূরীদের অবস্থা দেখে সব শিখে নিয়েছে। তার বণ্টনের মধ্যেও কর্তা কোন ত্রুটি ধরতে পারেন না। কর্তার কাছে তাই তিনি এত প্রিয়। তার দীর্ঘস্থিতির গূঢ় কারণ এইখানে।

আর একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলাম, আমরা ভাল কথা বললেও সরকার তার ভুল ব্যাখ্যা করেন কেন? বিরোধী দল থেকে কোন দাবী উত্থিত হলে বিরোধিতা করবেই, তা সে যতই নায্য হোক আর যতই যুক্তিসঙ্গত হোক না কেন। সরকারের এই অসহিষ্ণু অযৌক্তিক মনোভাবের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই পরিস্থিতির অবনতি ঘটে, হয়ত শেষ পর্যন্ত সেই ন্যায় সঙ্গত দাবী মানতেই হয়। কিন্তু তখন আর সমঝোতার সময় থাকে না। অহেতুক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে, মানুষের জানমাল বিনষ্ট করে অনেক মূল্যে দিয়ে পরিশেষে পথে আসতে বাধ্য হয়। স্বাধীন দেশের সরকারের পক্ষে কি এমনি মনোভাব অশুভ নয়? এতে কি রাষ্ট্রের অকল্যাণই বেশি টেনে আনা হয় না?

মুজিব ভাই জবাব দিলেন, ঠিকই বলেছিস, অকল্যাণই বেশি হয়, তাইত সব সময় আমি ওদের আহ্বান জানাই দাবী মেনে নাও – আমরা সংগ্রামের পথে যাব না। কিন্তু মেনে নেওয়া তো দূরের কথা, ওরা হিংস্র পশুর মত আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু মানতে ওদের হবেই, আজ হোক কাল হোক, আমাদের নায্য দাবী না মেনে গত্যন্তর নেই। আমার কেবল ভয় হয়, ওরা এমন সময় মানতে রাজী হবে যখন দেশবাসী আর সে দাবীতেই সন্তুষ্ট থাকবে না – তাদের দাবীর পরিধি তখন হয়ত আরও বেড়ে যাবে।

একটু হেসে মুজিব ভাই বলতে লাগলেন, শোন, একটি মেয়েলোকের গল্প শুনেছিলাম। ওদের অবস্থা অনেকটা সেই মেয়েলোকটির মত হবে। সংসারের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে মেয়েলোকটি আত্মহত্যা করতে যায়, পরনের শাড়ি খুলে ফাঁস তৈরি করে বৃক্ষাশাখায় বাঁধে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে এসে আফশোস করতে করতে বলে, মরতে গেলাম, মরতেও পারলাম না, মাঝখান থেকে কাপড় খানা রেখে এলাম। মুজিব ভাইয়ের কথা শুনে হেসে ফেললাম।

www.pathagar.com

তিনি বললেন, হাসির কথা নয়, এমনি মারাত্মক পরিণতির কথাই মাঝে মাঝে আমার মনে জেগে ওঠে। ওদের যে কিছুতেই আমাদের সদিচ্ছার কথা বুঝিয়ে উঠতে পারছি না; ওরা আজও ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছে না। দেওয়ালের লেখা পাঠ করছে না। উজানীর মেয়েকে একদিন ভাটি দিতেই হবে কিন্তু তখন আর হয়তো সময় থাকবে না।

গল্পের গন্ধ পেয়ে মুজিব ভাইকে ছেঁকে ধরলাম, গল্পটা শুনাতেই হবে।

তিনি বললেন, মিজান চৌধুরীর গল্প এটি, ওর কণ্ঠে সুন্দর শোনায়। বর্তমান শাসনকর্তাদের অনমনীয় মনোভাবের মতই চরিত্র নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছিল একটি গ্রাম্য বধু। স্বামী বা আর পাঁচজন যদি তাকে উত্তরে যেতে বলত, তাহলে সে দক্ষিণে যেত। অন্যের প্রতিটি কাজ ও কথার নির্বচার বিরোধিতাই ছিল তার সমস্ত জীবনের সার কথা। স্বামীর নির্দেশিত পথে চলা দূরের কথা, ঠিক তার বিপরীত পথটি সে বেছে নিত, জীবনে একটি দিনের জন্যও কারো সঙ্গে তার মতৈক্য হয়নি।

জীবনভর সকলকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে স্বামীর পদে পদে বিঘ্ন ঘটিয়ে শেষ পর্যন্ত সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েই এই অসহিষ্ণু বধূটি নদীতে ডুবে আত্মহত্যা করল।

খবর পেয়ে বেচারা স্বামী চলল স্ত্রীর মৃতদেহ খুঁজে এনে সৎকার করার মানসে। নদীর ভাটিতে না খুঁজে বিদ্রোহী স্ত্রীর দেহ সে উজানে খুঁজতে লাগল।

লোকজন জিজ্ঞাসা করল, কি খুঁজছেন উজান ধরে?

স্বামীটি জবাব দিল, আমার স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে, তার দেহ খুঁজছি।

লোকজন তার কথা শুনে তাকে বিকৃতমস্তিষ্ক ভাবে। নদীতে ডুবে মরলে উজান বেয়ে কোন মানুষের দেহ ভেসে আসতে পারে?

তারা তাকে বলল, উজানে খুঁজছেন কেন? নদীতে কোন জিনিস স্রোতের প্রতিকূলে ভেসে আসতে পারে? নদীতে ডুবে বউ মরে থাকলে স্রোতের অনুকূলে ভাটির দিকে খোঁজ করুন, পাবেন।

সে উত্তর করল, আপনারা ত আমার বউকে চেনেন না। একথা বলবেন বৈ কি! সংসারের সকলে যা করবে সে তার বিপরীত করবে। তাইত ভাটিতে না

www.pathagar.com

খুঁজে তাকে উজানেই খুঁজছি।

সকলেই তাকে বুঝাল জীবিত থাকতে যাই করে থাকুক না কেন, মৃত্যুর পর প্রকৃতির নিয়ম সে লঙ্ঘন করতে পারবে না। জীবদ্দশায় যতই উজান বেয়ে চলুক না, এখন তাকে ভাটিই বইতে হবে। সকলের কথায় শেষ পর্যন্ত উজান ছেড়ে ভাটিতেই খোঁজা শুরু করল। বেশি দূর খুঁজতে হল না। স্রোতের অনুকূলে ভেসে-আসা স্ত্রীর দেহ উদ্ধার করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে সে বলে উঠল, হায়রে উজানী, সেই ভাটিতে গেলি, কিন্তু বেঁচে থাকতে গেলি না।

গল্প শেষ করে মুজিব ভাই স্মিত মুখে তাকিয়ে রইলেন। গল্পের তাৎপর্য উপলব্ধি করার চেষ্টা কললাম। সময় থাকতেই পথে আসা উচিৎ। নতুবা ফলাফল উজানীর পরিণাম।

ওদের চৈতন্যোদয় হতে আর কত দেরী।

প্রকৃতির ঋণ যখন শোধ করতেই হবে, তখন আর অহেতুক কাল ক্ষয় কেন?

৩রা জুন, ১৯৬৭ সাল। মাস কয়েক হাজত বাসের পর আজ হাইকোর্ট থেকে জামিনে মুক্তির আদেশ এসে পৌঁছল। দীর্ঘদিন পর বাইরের পৃথিবীর মুক্ত আলো বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়ার সুযোগ পেলাম। বন্ধনহীনতার অনস্বীকার্য আনন্দের মাঝেও একটা সূক্ষ্ম অপরাধ বোধ সকল অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। কারান্তরালে ফেলে আসা সহযোগী বন্ধুদের ম্লান মুখচ্ছবি বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল।

জানি কোন ত্যাগই বৃথা যায় না। দেশ মাতৃকার যে সব অগ্নিসন্তানেরা তাদের জীবন-যৌবনের শত সম্ভাবনা বিসর্জন দিয়ে কারাগারের বন্ধন শৃঙ্খলের মাঝে তিলে তিলে নিজেদের ক্ষয় করে চলেছেন, তাদের এ ত্যাগ ব্যর্থ হতে পারে না। সফলতার গৌরবদীপ্ত আভায় সে সব ত্যাগী বন্ধুদের যাত্রাপথ একদিন উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

সে দিনকে ত্বরান্বিত করার কাজে আত্মনিয়োগের শপথ পুনরাবৃত্তি করে কারাগারের বাইরে পা রাখলাম।

---

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১৯৭২ সালে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম চিফ হুইপ নির্বাচিত হন। পরের বছর পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে দ্বিতীয়বার দেশের চিফ হুইপ হন। ১৯৭৫ সালে তিনি মন্ত্রিসভার সদস্য নিযুক্ত হন। দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ১৯৭৬ সালে তিনি ডেমোক্রেটিক লীগ নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করে পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৮৩ সালে তিনি অন্যতম সংগঠক হিসেবে জনদল গঠন করেন এবং ১৯৮৪ সালে মন্ত্রিসভার সদস্য নিযুক্ত হন। ১৯৮৬ সালে জাতীয় পার্টি গঠন করে দলের ভাইস-চেয়ারম্যান ও প্রেসিডিয়ামের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮৬ সালে তিনি পুনরায় সংসদ সদস্য এবং সেই বছরই তিনি জাতীয় পার্টির মহাসচিব নির্বাচিত হন। ১৯৮৭ সালে তিনি সরকারের উপ-প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৮৮ সালে পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে উপ-প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ উপনেতা নির্বাচিত হন। ১৯৯১ সালে রংপুর পীরগঞ্জের উপ-নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন দেশের বহু জনহিতকর কাজের সাথে জড়িত। স্কুল কলেজসহ বহু প্রতিষ্ঠান নিজ উদ্যোগে গড়ে তুলেছেন। ভ্রমণ করেছেন পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ। তিনি বাংলাদেশে সুপ্রীমকোর্টের একজন আইনজীবী, সুদক্ষ রাজনৈতিক সংগঠক এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী বক্তা হিসেবে সুপরিচিত। ব্যক্তিগত জীবনে এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জনক। সুসাহিত্যিক ও কবি সালেহা হোসেন তাঁর স্ত্রী।

www.pathagar.com